সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

সাতাশীতম বর্ষ ॥ প্রথম সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসরোজমোহন মিত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৭০০০০৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

সাতাশীতম বর্ষ ॥ প্রথম সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসরোজমোহন মিত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৭০০০০৬

॥ সূচীপত্র ॥

বাঙলায় অর্থনীতি চিন্তার ও চর্চার ইতিহাস ॥ শ্রীভবতোষ দত্ত ১

'চৈতন্যচরিতামৃত'এর রচনাকাল এবং
ব্রজের গৌড়ীয় সম্প্রদায় ॥ শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় ১৬

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি রামপ্রসাদ রায়ের
নবাবি কৃত কাব্য 'কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু' ॥ শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০

দ্বিজ কবিচন্দ্রের রাধিকামঙ্গল প্রসঙ্গে ॥ শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল ৪৫

পরিষৎ-সংবাদ ॥ ৪৭

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
॥ ৮৭ বর্ষ ॥
প্রথম সংখ্যা

বাঙ্‌লায় অর্থনীতি চিন্তার ও চর্চার ইতিহাস

শ্রীভবতোষ দত্ত

রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি বক্তৃতা দেবার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে নিজেকে বিশেষভাবে সম্মানিত বোধ করছি। বঙ্গ সংস্কৃতির ধারক রূপে সাহিত্য পরিষৎ গত নয় দশকে যে মূল্যবান কাজ করেছেন, তার মধ্যে একজন অ-সাহিত্যিকের প্রবেশ তাঁর নিজের দিক থেকে সঙ্কোচের বিষয়। তবে, আমি কিছুটা সাহস সঞ্চয় করছি এই ভেবে যে পরিষদের যিনি প্রথম সভাপতি ছিলেন তাঁর সাহিত্যকৃতির সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনায় বিরাট দান প্রায় এক শতাব্দী পরেও অবিস্মরণীয়। আর যাঁর স্মৃতিতে এই বক্তৃতার আয়োজন সেই রামপ্রাণ গুপ্ত (১৮৬৯-১৯২৭)ও ঐতিহাসিক ছিলেন—'প্রাচীন ভারত' থেকে আরম্ভ করে 'পাঠান রাজবৃত্ত', 'মোগল বংশ' এবং আকর-গ্রন্থ 'রিয়াজ-উস্-সালাতিন'-এর অনুবাদ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রসারিত ক্ষেত্রে তিনি তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন।

আজকের আলোচনা ইতিহাস নিয়ে, তবে সে ইতিহাস ঘটনার ইতিহাস নয়, চিন্তাধারার বিবর্তনের ইতিহাস। ঘটনা ও চিন্তাধারা অবশ্য পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত। কখনো রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বিবর্তনের ফলে চিন্তাধারায় নূতন রূপ দেখা দেয়, আবার কখনো চিন্তাধারায় পরিবর্তন আগে আসে এবং পরবর্তীকালের ইতিহাসের উপরে তার প্রভাব পড়ে। ব্রিটেনে শিল্প-বিবর্তন অর্থনৈতিক চিন্তাধারার নূতন দিগন্ত প্রসারিত করে দিয়েছিল। আমাদের দেশে স্বদেশী আন্দোলন ছিল একই সঙ্গে নূতন চিন্তার বহিঃপ্রকাশ এবং নূতনতর চিন্তার পথিকৃৎ। বর্তমান শতকের ত্রিশের দশকে পৃথিবী-ব্যাপী মন্দা অর্থনীতির চিন্তার নানা দিকে পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। ১৯৪৭-এ ভারত স্বাধীন হওয়ার ফলে আর্থিক উন্নয়ন ও পরিকল্পনা নীতি সম্বন্ধে গবেষণায় নূতন ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়েছিল। আবার পূর্বগামী ভাবধারার পরিবর্তনের ফলে ঐতিহাসিক বিবর্তনের নূতন রূপ দেখা গিয়েছিল ফরাসী বিপ্লবে বা বর্তমান শতাব্দীর রুশ বিপ্লবে। রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বিবর্তন আর চিন্তাধারার বিবর্তন অনেক সময়েই এক পথে চলে—কোনোটা আগে এবং কোনোটা পরে।

আমাদের আলোচ্য বিষয় 'আধুনিক যুগে বাঙ্‌লায় অর্থনীতি চিন্তার ও বংগভাষায় অর্থনীতি চর্চার ইতিহাস' এই পরিপ্রেক্ষিতেই দেখা প্রয়োজন। আধুনিক যুগ বলতে যদি রাজা রামমোহনের কাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত বুঝি, তাহলে এই দেড়শত বছরের অর্থনৈতিক ইতিহাস এবং অর্থনীতি চর্চার ইতিহাস একযোগে দেখতে হয়। প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে বংগদেশের অর্থনীতি চিন্তা ও বাঙ্‌লা ভাষায় অর্থনীতি চর্চা সমার্থক নয়, কারণ আমাদের অর্থনীতিবিদ্‌দের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ রচনাই লেখা হয়েছে ইংরেজিতে। একথা রাজা রামমোহন বা রমেশচন্দ্র দত্তের ক্ষেত্রে যতটা প্রযোজ্য, আজ স্বাধীনতা লাভের ত্রিশ বছরেরও বেশি অতিক্রান্ত হবার পরেও প্রায় ততটাই প্রযোজ্য। এর কারণ বাঙ্‌লা ভাষায় লেখাতে অসামর্থ্য বা অনীহা নয়—রামমোহন, রমেশচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে আজকের তরুণ অর্থনীতিবিদ্ পর্যন্ত সবাই বাঙ্‌লা রচনায় তাঁদের অসামান্য কৃতিত্ব নানাভাবে প্রকাশ করেছেন।

ইংরেজিতে লেখার প্রধান কারণ প্রশস্ততর ক্ষেত্রের পাঠকমণ্ডলীর প্রতি লেখকের দৃষ্টি। রামমোহনের অর্থনীতি সম্বন্ধীয় বক্তব্য বিলাতী পার্লামেন্টের সদস্যদের জন্য ইংরেজিতে লিখতে হয়েছিল। রমেশচন্দ্রের অর্থনৈতিক ইতিহাস বা বাঙ্গালী কৃষক ও প্রজা সম্বন্ধে বই-ও শাসক-মণ্ডলী ও বিদগ্ধ-ইংরেজ পাঠকের উদ্দেশেই লেখা। তাছাড়া, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে চিন্তাধারার প্রচার করতে হলে ইংরেজিতে লেখার বিকল্প তখন ছিল না, এখনও নেই। আজকাল যে সব বাঙ্গালী তরুণ অর্থনীতিবিদ্ তাঁদের গবেষণা ও নূতন চিন্তা দিয়ে বিশ্বময় খ্যাতি অর্জন করেছেন ও করছেন, তাঁদেরও ইংরেজিতে লেখা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

কিন্তু, এসব কারণ সত্ত্বেও বাঙলা ভাষায় অর্থনীতি রচনার ভাণ্ডার বিশাল। এই ভাণ্ডারের পুরোপুরি সন্ধান বোধহয় এখনো পাওয়া যায় নি, কিন্তু যেটুক জানা গিয়েছে তা' থেকেই চিন্তাধারার বিবর্তনের একটা ইতিহাস রচনা করা সম্ভব। গত শতাব্দীর নানা পত্র-পত্রিকায় ছড়ানো রচনা এবং অধুনা দুর্লভ গ্রন্থরাজি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে আমাদের বিশেষভাবে উপকৃত করেছেন শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও কলকাতার 'সোশিও-ইকনমিক রিসার্চ ইনস্টিট্যুট'-এর অন্যান্য কর্মিবৃন্দ। বস্তুত, শ্রীমান দুর্গাপ্রসাদের নিরলস চেষ্টার ফলে আহৃত গ্রন্থপঞ্জী, তাঁর সংগৃহীত শতাধিক বছর আগে লেখা বই এবং এ-বিষয়ে তাঁর নিজের রচনার সাহায্য না পেলে বর্তমান আলোচনা সম্ভব হোত না। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে আজকের আলোচনার সূচনা করি।

বাঙলা ভাষায় অর্থনীতি সম্বন্ধীয় যে সব রচনা পাওয়া যায় সেগুলিকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়—প্রথম, নানা সাময়িক পত্রিকায় সংবাদ ও সম্পাদকীয় ; দ্বিতীয়, সাময়িক পত্রিকা বা অন্যত্র প্রকাশিত বিশ্লেষণী আলোচনা ; তৃতীয়, অর্থনীতির পাঠ্য বই ; এবং চতুর্থ, গবেষণা মূলক রচনা বা নূতন চিন্তার উপস্থাপন। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা গত দেড়শ' বছরের কালকে তিন ভাগে ভাগ করে দিতে পারি—উনিশ শতক, বর্তমান শতকের প্রথমার্ধ এবং বর্তমান শতকের বিগত তিন দশক। যে চার শ্রেণীর রচনার কথা বলা হোল, তার প্রথম তিনটি এই তিন কাল-স্তরের সব ক'টিতেই পাওয়া যাবে। বাঙলায় গবেষণা মূলক অর্থনৈতিক রচনা উনিশ শতকে ছিল নগণ্য, কিন্তু বর্তমান শতকে তার কিছু কিছু নিদর্শন আছে।

বঙ্গদেশে অর্থনৈতিক চিন্তার পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কৃষকদের দুরবস্থা, সরকারি রাজস্বনীতিতে ত্রুটি, সরকারি ব্যয়ের আধিক্য, ভারত থেকে ব্রিটেনে সম্পদের বহির্গমন ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোচনার যে পথ রামমোহন খুলে দিয়েছিলেন, শতাব্দীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ভারতীয় অর্থনীতিবিদেরা সেই পথেই অগ্রসর হয়ে চলেছিলেন। কিন্তু, রামমোহন অর্থনীতি সম্বন্ধে বাঙলায় কিছু লিখেছিলেন বলে জানা নেই, যদিও অন্যান্য নানা বিষয়ে তাঁর বাঙলা রচনায় শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজন-স্বীকৃত। রামমোহনের যুগে বাঙলায় অর্থনীতি সম্বন্ধে রচনার নিদর্শন খুঁজতে হবে তখনকার সাময়িক পত্রে। শ্রীরামপুরের মিশনারিদের পত্রিকা 'দিগদর্শন'-(১৮১৮)-এর আর্থিক সমস্যা নিয়ে প্রবন্ধ থাকত এবং আরো বেশি থাকত সমকালীন 'সমাচার-দর্পণে'। 'সমাচার-দর্পণে' প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধাবলীর কয়েকটির নাম উল্লেখ করলে আলোচনার প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যাবে—'কৃষিকর্মের বৃদ্ধি', 'এতদ্দেশের বাণিজ্য', 'কলোনাইজেশন অর্থাৎ ইঙ্গরেজ লোকের এদেশে চাষবাস'; 'গৌড়দেশের শ্রীবৃদ্ধি', 'চরকা কাটনির দরখাস্ত' ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে মধ্যে অর্থনীতির তাত্ত্বিক আলোচনা ছিল না, বা কোনো গভীর বিশ্লেষণ ছিল না, কিন্তু সাধারণ-ভাবে সমসাময়িক সমস্যার বিভিন্ন দিকের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল।

বাঙলা ভাষায় অর্থনীতির তাত্ত্বিক আলোচনা উনিশ শতকের তৃতীয় বা চতুর্থ দশকে

একেবারে অসম্ভব ছিল না। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের কিছুটা অর্থনীতি পড়ানো হোত। ছাত্রদের লেখা পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর এখন কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে—তাতে দেখা যায় যে তখনকার ছাত্ররা সম্ভবত জেমস্ মিল ও রিকার্ডো পড়তেন। কিন্তু, এঁদের সংগে বাঙলা পত্রিকার যোগাযোগ ছিল না। রাজা রামমোহনের 'সম্বাদ কৌমুদী'র (১৮২১) কোনো সংখ্যা এখন পাওয়া যায় না। হয়তো এই পত্রিকায় তাঁর অর্থনৈতিক মতবাদের কিছুটা প্রকাশ ছিল। পরবর্তীকালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে' (১৮৪৩) অর্থনীতির আলোচনা থাকত, কিন্তু এ-বিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ' (১৮৫৮)। 'সোম-প্রকাশের' প্রবন্ধাবলীতে এমন সব অর্থনৈতিক আলোচনা থাকত, যা আজ এক শতাব্দী পরেও অনাধুনিক মনে হবে না। দেশের উন্নতিতে সংস্কারের গুরুত্ব বা শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধিতে মোট উৎপাদনের উন্নতি সম্বন্ধে বিদ্যাভূষণ যা লিখেছিলেন তা বর্তমান যুগের অর্থনীতিবিদদের বক্তব্যেরই পূর্বাভাস।

উনিশ শতকের সাময়িক পত্রে বাঙলায় অর্থনীতির যে সব বিষয়ে আলোচনা হোত তার মধ্যে প্রধান স্থান ছিল ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব সমস্যার। 'সোমপ্রকাশ' চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অপকারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং তারপর 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২)-এ কৃষকের খাজনা, কৃষি ঋণ ইত্যাদি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আরম্ভ হয়। শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪০-১৯২৪)-এর 'ভারত শ্রমজীবী' (১৮৭৪) ছিল বিশেষভাবে শ্রমিক সমাজের সমস্যাতে আগ্রহী, কিন্তু কৃষি সমস্যার আলোচনাও তাতে স্থান পেত। অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭) তাঁর 'সাধারণী' পত্রিকায় (১৮৭৩) এবং পরে 'নব-বিভাকর সাধারণী' (১৮৮৬)-তে কৃষি সমস্যার বাইরে অন্য অনেক বিষয়ে আলোচনা থাকত—যেমন লবণ কর, লাইসেন্স ট্যাক্স এবং এমন কি আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন।

'ভারতী', 'নব্যভারত' প্রভৃতি পরবর্তীকালের সাময়িক পত্রিকাতে সাহিত্য, সুকুমার কলা ইত্যাদি নিয়ে লেখা এবং গল্প-উপন্যাস কবিতা ছাড়াও অর্থনীতির উপরে প্রবন্ধ থাকত। আরো পরের যুগে, বর্তমান শতাব্দীর প্রথম চার দশকে, এ বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান ছিল 'প্রবাসী'র। ১৯১০-১১ থেকে ১৯৩৫-৩৬ ছিল 'প্রবাসী'র স্বর্ণযুগ। যদুনাথ সরকার বিনয়কুমার সরকার, যতীন্দ্রমোহন দত্ত এবং আরো অনেকে এই পত্রিকাতে অর্থনীতির উপরে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। মাঝে মাঝে পুরোপুরি তাত্ত্বিক আলোচনাও থাকত। 'ওয়েলফেয়ার ইকনমিক্স্'-এর মূলনীতি নিয়ে 'স্বাচ্ছন্দ্য-বিজ্ঞানের মূলসূত্র' নামে কয়েকটি প্রবন্ধ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হওয়া 'প্রবাসী'তেই সম্ভব ছিল।

সাময়িক পত্রিকার প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গে উনিশ শতকে নূতন একটা প্রচেষ্টা ছিল অর্থনীতি বিষয়ে পাঠ্য বই লেখার। জেমস লং ১৭৯৫ থেকে ১৮৫৫ সাল এই ষাট বছরের ১৪০০ বাঙলা বইয়ের যে তালিকা প্রণয়ন করেন তাতে ১৮৪০ এ প্রকাশিত 'পরিশ্রম বিষয়' নামে একখানি বইয়ের উল্লেখ আছে। কিন্তু বইটি পাওয়া যায় নি। সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তিনটি পাঠ্য বইয়ের, যার প্রথমটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬১ সালে। ঐ সময়ে 'বাঙলা ও মাইনর ছাত্রবৃত্তি' পরীক্ষার্থীদের জন্য অর্থনীতি একটি বিষয় হিসাবে নির্দিষ্ট হয়েছিল। ঐ সব পরীক্ষার্থী এবং তাদের শিক্ষক যাঁরা 'নর্ম্যাল স্কুলে' শিক্ষণ-শিক্ষা পেতেন—এই উভয় শ্রেণীর জন্য বই লেখা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

এই তিনটি বই-ই প্রায় একধরনে লেখা, কিন্তু বিষয়-বস্তুর ব্যাপ্তি ও রচনা-শৈলীতে পার্থক্য আছে। রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরীর 'অর্থ-ব্যবহার অর মানি ম্যাটার্স ইন বেঙ্গলী' বইটির ১৮৭৫ সালের দ্বাদশ সংস্করণের ভূমিকাতে লেখা আছে "চতুর্দশ বৎসর হইল এই-পুস্তক প্রথম প্রচারিত হয়"। সুতরাং প্রথম প্রকাশের বছর ছিল ১৮৬১। চোদ্দ বছরে বারোটি

সংস্করণ থেকে প্রমাণ হয় বইটি কতটা জনপ্রিয় হয়েছিল। দ্বিতীয় বইটি, 'ধন-বিধান অর্থাৎ ধন-বিষয়ক সরল পাঠ' হোয়েট্‌লী প্রণীত 'ইজি লেসনস্‌ ইন মানি ম্যাটার্‌স্‌' এর অনুবাদ। প্রথম প্রকাশ ১৮৬২। তৃতীয় বইটি লিখেছিলেন নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৭৪-এ। বইটির নাম 'অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার'।

নর্ম্যাল স্কুল এবং ছাত্রবৃত্তির পাঠক্রম অনুসারে লেখা তিনটি বইয়েরই মূল বিষয়-বিন্যাস একরকম; কিন্তু নৃসিংহচন্দ্রের বইটিতে পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়াও আরো অনেক আনুষঙ্গিক বিষয়ের উল্লেখ আছে। গোপালচন্দ্র দত্তের বই তখনকার বহুল প্রচারিত ছাত্র-পাঠ্য ইংরেজি বইয়ের অনুবাদ। মধ্যে মধ্যে শুধু অর্থনীতির আলোচনাতে লেখকের ধর্মভাব নিবিষ্ট হয়েছিল। অ্যাডাম স্মিথের 'ইনভিজিবল্‌ হ্যান্ড' বা অদৃশ্য হাত গোপালচন্দ্রের রচনায় দেখা দিয়েছিল "পূর্ণজ্ঞান, পরমকরুণাপূর্ণ পরমেশ্বরের পরমাশ্চর্য কৌশল" রূপে। রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরীর বইটির ভাষা ছিল সহজতর—গোপালচন্দ্রের অনুপ্রাণ-সমাকীর্ণ রচনা রীতি তিনি গ্রহণ করেন নি। কিন্তু এ বইটিও মূলত হোয়েটলীর বই অবলম্বন করে লেখা।

তৃতীয় বইখানির বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন, কারণ এটি বোধ হয় বাঙলা ভাষায় অর্থনীতির প্রথম সম্পূর্ণ পাঠ্য বই, যার মধ্যে কিছুটা মৌলিকতা ছিল। লেখক ছিলেন সংস্কৃতের অধ্যাপক—প্রেসিডেন্সি ও সংস্কৃত কলেজে—এবং প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর সঙ্গে তাঁর নিকট সংযোগ ছিল। ফলে বাঙ্‌লা পরিভাষা রচনাতে নৃসিংহচন্দ্র বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন 'ফ্যাক্টর অব্‌ প্রডাকশন' অর্থে 'সাধন', 'ইউটিলিটি'র অর্থে 'ইষ্ট-সাধনতা' বা 'অভিলষনীয়তা', 'ইনডিরেক্ট' এর সমার্থক হিসাবে 'পারম্পরিক' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের পক্ষেই সম্ভব ছিল। অথচ সাধারণ প্রচলিত শব্দে ব্যবহার করতেও তিনি দ্বিধা করেন নি—'ক্রেডিট' কথার জন্য সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারে না গিয়ে তিনি সোজাসুজি ব্যবহার করেছিলেন 'পসার'। বইটির দ্বিতীয় বিশেষত্ব ছিল সাবলীল ভাষা। কোনো বিশেষ একটি বইয়ের সরাসরি অনুবাদ না হওয়াতে কোথাও ভাষার সঙ্গে গতি ব্যাহত হয় নি।

অবশ্য বইটির মূলে দৃষ্টিভঙ্গী ছিল তখনকার দিনের বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহীত মূলনীতিরই অনুগামী। এই দৃষ্টিভঙ্গীর উৎপত্তি অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো ও মলথস্‌-এ। কিন্তু উনিশ শতকের শেষার্ধে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে সব চেয়ে পাকা স্থান ছিল জন স্টুয়ার্ট মিলের 'প্রিন্সিপ্‌লস্‌ অভ্‌ পলিটিক্যাল ইকনমি' (১৮৪৮) বইটির। মিলের বই যাদের কাছে কঠিন লাগত তারা পড়ত হেনরি ফসেটের 'ম্যানুয়্যাল' (১৮৬৩), যা' ছিল মিলের সরলীকৃত ব্যাখ্যা। যাদের কাছে ফসেটও কঠিন লাগত, তাদের জন্য ছিল ফসেট-পত্নী মিলিসেন্ট ফসেটের লেখা 'পলিটিক্যাল ইকনমি ফর বিগিনার্‌স্‌' (১৮৭০)। এ সবের উল্লেখ এই কারণে যে মিলের ফসেট-ভাষ্য বহুদিন ধরে আমাদের দেশের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সবারই নির্ভরস্থল ছিল। ফলে পূর্ণপ্রতিদ্বন্দ্বিতার বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার উপকার, অবাধ বাণিজ্যের সুফল, শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির কুফল ইত্যাদি বিষয়ে বাঙ্‌লা বইয়ে ইংরেজ অর্থনীতিবিদের মতের-ই প্রতিফলন হোত। একমাত্র দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মজুরি বাড়ালে যে উৎপাদন বাড়তে পারে সে বিষয়ে অবহিত ছিলেন। একটু এগিয়ে এসে আমরা যদি বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে লেখা বাঙ্‌লা পাঠ্যবইয়ের দিকে তাকাই (যেমন গিরীন্দ্রনাথ সেনের বই) তাহলেও এই একই জিনিস দেখি। তখন অবশ্য অ্যালফ্রেড মার্শাল সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন। কিন্তু আমাদের দেশের বইয়ে মিল ও ফসেটের রাজত্ব সংকুচিত হয় নি।

এমন কি প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের 'অর্থনীতি' (১৯১২) বইটিতেও স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গী দেখা যায় না। যোগীন্দ্রনাথ তাঁর বইয়ে মার্শালের দু'টি বইয়েরই নাম করেছেন এবং সর্বশেষে দিয়েছেন ফসেট ও ফসেট জায়ার নাম। বইটির রচনা সৌকর্য আগেকার অনেক বইয়ের চেয়ে বেশি। তা'ছাড়া চারটি পরিশিষ্টে ভারতবর্ষে সুদের হার ও যৌথ মহাজনী, ধর্মগোলা, অবাধ বাণিজ্য ও সোনার টাকা সম্বন্ধে আলোচনা আছে। বইটি যখন লেখা হয়েছিল তখন ছিল আমাদের দেশে সমবায় সমিতি স্থাপনের প্রারম্ভিক যুগ এবং যোগীন্দ্রনাথ সমবায়ের উপকারিতা নিয়ে জোর দিয়ে লিখেছিলেন। অবাধ-বাণিজ্যে যে ভারতের উপকার না-ও হতে পারে তা'ও তিনি দেখিয়েছিলেন। কিন্তু স্বর্ণমান সম্বন্ধে তৎকালীন দুর্বলতা তাঁরও ছিল। পরিশিষ্টের নিবন্ধগুলিতে তাঁর নিজের মতের কিছু পরিচয় ছিল, কিন্তু মূল বইয়ের অধ্যায়গুলিতে ইংরেজি পাঠ্য বইয়ের গতানুগতিক ধারাই অনুসৃত হয়েছিল।

উনিশ শতকে ফিরে গিয়ে যদি অর্থনীতির বিশ্লেষণী আলোচনার দিকে তাকাই, তাহলে দেখি উচ্চ-স্তরের ইতিহাস বিশ্লেষণে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান ছিল রমেশচন্দ্র দত্তের। তিনি শুধু ইংরেজ আমলের আর্থিক ইতিহাস লেখেন নি, বঙ্গদেশের কৃষককুল সম্বন্ধে গভীর আলোচনাও করেছিলেন। বর্তমান যুগের ইতিহাসের গবেষক রমেশচন্দ্রের রচনায় তথ্যগত ভুল বার করতে পারবেন না, কিন্তু অসম্পূর্ণতার অভিযোগ আনতে পারবেন। ভূমি-রাজস্বের দিকে বেশি জোর দেওয়াতে শিল্প, বাণিজ্য, মুদ্রানীতি, মোট জাতীয় উৎপাদন ইত্যাদির বিশদ আলোচনা তিনি করেন নি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সপক্ষে বা রেল-লাইন বনাম সেচ-ব্যবস্থার বিতর্কে তিনি যা বলেছিলেন তাও আজকাল অনেকে গ্রহণ করবেন না। 'ভারতবর্ষের অর্থনীতিক সমস্যা' নামে একটি প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন ১৯০১ সালে। এটি ছাড়া তাঁর আর সমস্ত রচনাই ইংরেজিতে। বাঙ্‌লা ভাষায় অর্থনীতি চর্চার ইতিহাসে যে স্থান তিনি পেতে পারতেন তার দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল না। পাণ্ডিত্য, অভিজ্ঞতা ও নিরলস অধ্যবসায়ের যে অপূর্ব সংমিশ্রণ তাঁর মধ্যে হয়েছিল এবং বাঙ্‌লা রচনায় যে অনায়াস অধিকার তিনি দেখিয়েছিলেন, তাতে সহজেই বোঝা যায় যে তিনি বাঙ্‌লা ভাষায় অর্থনীতির আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারতেন, সমসাময়িক পরিস্থিতি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করে।

যে দু'জন মনস্বী উনিশ শতকে বাঙ্‌লা ভাষায় অর্থনীতির সমস্যা নিয়ে মূল্যবান নিবন্ধ লিখেছিলেন, তাঁরা কেউই মূলত অর্থনীতিবিদ্ নন। এ'রা হলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৮) এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৬-১৮৯৪)। এ'দের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) এর নাম, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক রচনার বেশির ভাগ বর্তমান শতকে লেখা। পাণ্ডিত্য, বিচক্ষণ বিশ্লেষণ শক্তি ও নিপুণ প্রকাশভঙ্গী ছাড়াও এ'দের তিনজনেরই ছিল পল্লীঅঞ্চলের সমস্যা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা বঙ্কিমচন্দ্র লাভ করেছিলেন জেলায়-মহকুমার প্রশাসকের কাজ করে, ভূদেব স্কুল-পরিদর্শক রূপে এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারি ও শ্রীনিকেতনের কাজ পরিচালনা করে। এ'দের বক্তব্য সব সময়ে এক নয়, কিন্তু তথ্য, বিশ্লেষণ এবং দারিদ্র-নিপীড়িতের প্রতি সহানুভূতির সমন্বয় এ'দের তিনজনের লেখাতেই পাওয়া যাবে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেগুলি সংকলিত হয়েছিল 'পারিবারিক প্রবন্ধ' ও 'সামাজিক প্রবন্ধ' নামক দুটি বইয়ে। এর মধ্যে দ্বিতীয় বইটি অর্থনীতির ও প্রশস্ততর সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষে মূল্যবান, যদিও 'পারিবারিক প্রবন্ধে'

স্বর্ণালঙ্কার-ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে সুচিন্তিত আলোচনা ছিল। 'সামাজিক প্রবন্ধে'র (১৮৯২) শেষের দিকে 'ভবিষ্য-বিচার—ভারতবর্ষ-বিষয়ক' অংশে 'আর্থিক অবস্থা বিষয়ক' ও 'জৈবনিক অবস্থা বিষয়ক' নামে দু'টি নিবন্ধ আছে। এতে ভূদেব ১৪টি দেশের মাথা পিছু আয় ও ও করভারের তালিকা দিয়ে ভারতের দারিদ্র্যের প্রমাণ দিয়েছিলেন। জাতীয় আয়ের যে পরিসংখ্যান তিনি দিয়েছিলেন সেটা তৎকালীন সরকারি হিসাব অনুসারে তৈরি করা—গড়পড়তা বার্ষিক আয় ২৭ টাকা এবং করভার ৪ টাকা। এ'ছাড়া পার্লামেণ্টে ১৮৭২ সালে উপস্থাপিত আয়বণ্টনের একটা হিসাবও ভূদেব দিয়েছিলেন, কিন্তু সে হিসাব কী পদ্ধতিতে করা হয়েছিল তার কোনো উল্লেখ করেন নি। হিসাবটি অসম্পূর্ণ, কিন্তু ভূদেবের মূল প্রতিপাদ্য—অত্যন্ত নীচু গড়পড়তা আয়, আনুপাতিক ভাবে করের গুরুভার এবং জীবনযাত্রার নিম্নতম মানের নীচে বিরাট জনসংখ্যা—নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠবে না। 'জৈবনিক অবস্থা-বিষয়ক' নিবন্ধে ভূদেব একজন ইংরেজ রাজপুরুষের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছিলেন যে ভারতবর্ষে তখন অন্তত পাঁচ কোটি লোক ছিল যারা অর্ধাহারে ('সেমি-স্টারভেশন') বা তার চেয়েও খারাপ অবস্থায় দিন কাটাত। ১৮৯১ সালে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ২৮.৭০ কোটি, অর্থাৎ এই হিসাব অনুসারে জনসংখ্যার ১৭.৪ শতাংশ অর্ধাহারের স্তরের উপরে উঠতে পারে নি।

এসব বিষয়ে ভূদেব কোনো নূতন গবেষণা করেন নি। যে তথ্য তিনি দিয়েছিলেন, তা' দাদাভাই নওরোজির রচনায় তখন পাওয়া যেত। ডিগ্‌বি (১৯০১) বা দেউস্কর (১৯০৪)-এর রচনা তখনো প্রকাশিত হয় নি। এদিক থেকে ভূদেবের অন্যতম কৃতিত্ব নওরোজির পরিসংখ্যান সহজ বাঙলায় প্রকাশ করা এবং তার সঙ্গে নিজের বিশ্লেষণ যোগ করা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে তিনি ১১টি দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়েছিলেন যে এদের মধ্যে উদ্বৃত্ত রপ্তানি ছিল শুধু দু'টি অধমর্ণ দেশের—মিশর ও ভারত। বিদেশের প্রাপ্য শোধ করতে অধমর্ণ দেশকে যে উদ্বৃত্ত রপ্তানি পাঠাতে হয় সেটা ভূদেব স্পষ্ট করে দেখাতে পেরেছিলেন। বিদেশী আমদানি ও মূলধনে স্থাপিত কারখানার উৎপাদনের ফলে ভারতের নিজস্ব কুটির শিল্পের অবলুপ্তি সম্বন্ধেও তিনি অবহিত ছিলেন। কৃষিকর্মে নিযুক্ত জনসংখ্যার আনুপাতিক বৃদ্ধি যে আর্থিক অবনতির লক্ষণ সেটাও তিনি প্রণিধান করেছিলেন। এবং, সর্বোপরি, শিক্ষা ও আর্থিক উন্নতির যোগসূত্র কোথায় তাও তিনি বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতে বিশ্লেষণ গভীরতর। কৃষকের অবস্থা, জমিদার-প্রজা সম্পর্ক ইত্যাদি নিয়ে তিনি বিস্তৃতভাবে লিখেছিলেন এবং স্বভাবতই তাঁর রচনা ছিল তথ্য ও যুক্তিনিষ্ঠ এবং তদুপরি ছিল তাঁর অপূর্ব ভাষা। তৎকালীন ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ইংরেজি বই যা পাওয়া যেত তিনি তার সবই অধ্যয়ন করেছিলেন এবং বিশেষভাবে জন স্টুয়ার্ট মিলের রচনা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল রচনাগুলি প্রধানতঃ 'বঙ্গদর্শনের' প্রবন্ধরূপে তৈরি। রেলপথ বিস্তার, নূতন শিল্পস্থাপন ইত্যাদির উপকার যে চাষীদের স্তর পর্যন্ত গিয়ে পেঁছয় নি; সরকার, জমিদার, ব্যবসায়ী সবারই আয় বেড়েছে কিন্তু চাষীর অবস্থার উন্নতি হয় নি এই তথ্য বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের পাঠকদের কাছে তুলে ধরেছিলেন। প্রশাসক ও বিচারক হিসাবে তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝেছিলেন যে দেশের আইন ও বিচার-ব্যবস্থা চাষী-প্রজার স্বার্থরক্ষা করত না। জমিদার ও মহাজনের নানারকম বে-আইনী আদায়ের পথে কোনো বাধা সৃষ্টি করত না।

দেশের মোট আয়কে একদিকে ব্যবসায়ী ও উৎপাদকের লাভ, সুদ ও জমির খাজনা এবং অন্যদিকে শ্রমের পারিশ্রমিক এই দুই ভাগে ভাগ করে বঙ্কিমচন্দ্র মিল-প্রদর্শিত পথে গিয়েছিলেন এবং মিলের-ই মত একটা 'মজুরি-ভাণ্ডার' ('ওয়েজ্'-ফাণ্ড)-এর কথা

বলেছিলেন। মোট মজুরি ভাণ্ডার যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহলে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়লে গড়পড়তা মজুরি কমবে এটা একটা গাণিতিক সত্য, কিন্তু এই ভাণ্ডার কেন স্থির থাকবে বা কীভাবে এটা বাড়ে বা কমে, সে আলোচনার মধ্যে না যাওয়াতে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ ছিল। অবশ্য, 'মজুরি-ভাণ্ডার' সম্বন্ধে ধারণা তখন সকলের কাছেই অস্পষ্ট ছিল—সম্ভবত; মিলের নিজের কাছেও।

রবীন্দ্রনাথের অর্থনীতি-সম্বন্ধীয় রচনা উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে বর্তমান শতক পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে তাঁর বেশির ভাগ রচনাই স্বদেশী আমল বা তারপরে লেখা। তাঁর নিজের অর্থনীতি দর্শনের প্রকাশ পাওয়া যাবে ১৯০৪-এ লেখা 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে। স্বাধীনতা লাভের পরে যে 'কম্যুনিটি-প্রজেকট' নিয়ে আমরা অগ্রসর হতে চেয়েছিলাম তার মূলনীতি এবং তার পক্ষে মূল যুক্তিগুলি রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধে প্রথম পরিষ্কার করে আলোচিত হয়। কৃষির উন্নতি, কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠা, সমবায় নীতি ও আত্মনির্ভরশীলতা একত্রিত করে সুসম্বদ্ধ গ্রামীণ উন্নয়ন পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথ পরেও দিয়েছিলেন তাঁর অনেক প্রবন্ধে এবং হাতে কলমে কাজ করে দেখিয়েছিলেন পতিসরে ও শ্রীনিকেতনে।

সমবায় প্রথার গুণগান তখন অনেকেই করছিলেন। ১৯১৮-১৯ সালে 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় যখন রবীন্দ্রনাথ সমবায় নীতি নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন তখন বঙ্গদেশে সমবায় ঋণদান সমিতির সংখ্যা ছিল প্রায় চার হাজার এবং অন্যান্য (ক্রয় বিক্রয়, দুগ্ধ উৎপাদন, অন্য উৎপাদন) সমিতির সংখ্যা ছিল মাত্র ১০৭। সমবায় নীতি শুধু ঋণদান ও ঋণ গ্রহণের মধ্যে আবদ্ধ থাকায় রবীন্দ্রনাথ ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে সমবায়ের ফলপ্রসূ সম্ভাবনার দিকে বেশি করে নজর না পড়াতে তিনি নৈরাশ্য প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৩০-এ রুশ দেশ ভ্রমণের পরে তিনি উন্নত কৃষি ও গ্রামীণ শিল্পের জন্য সমবায় নীতি কতটা কার্যকর হতে পারে তার দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। আর্থিক অসাম্যও তাঁর মনে পীড়া দিয়েছিল। 'রাশিয়ার চিঠি' লেখার আগেই তিনি বলেছিলেন, "যেখানে মূলধন ও মজুরির মধ্যে অত্যন্ত ভেদ আছে সেখানে ডিমক্র্যাসি পদে পদে প্রতিহত হতে বাধ্য" সমবায়নীতি পৃ. ১৭-১৮ রাশিয়াতে ব্যক্তিগত সম্পদ ও ভোগের অসাম্যের বিরোধ দূর করতে যে চেষ্টা চলছিল, সেটা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, কিন্তু তিনি এও লক্ষ্য করেছিলেন যে 'কালেকটিভ ফার্ম' বা ঐকত্রিক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় "জবরদস্তির সীমা নেই"। মহাত্মা গান্ধীর অর্থনৈতিক মতামত রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন নি ; বিশেষত যন্ত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি স্পষ্টভাবেই ভিন্নমত প্রকাশ করেন। চরকা কেটে দেশের বস্ত্রাভাব মেটানো যাবে একথা তিনি মানেন নি, কিন্তু গ্রামের সর্বপ্রকার কর্মীর অবসর সময়ের পরিপূরক কাজ হিসাবে চরকা ও অন্যান্য কুটির শিল্পকে তিনি সহজেই গ্রহণ করেছিলেন। বস্তুত, গান্ধী-অর্থনীতির মূলনীতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক দর্শনের অমিলের চেয়ে মিল-ই বেশি। 'সর্বোদয়', 'অন্ত্যোদয়' 'পরিপুষ্ট গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকরণ' ইত্যাদি সবই স্বদেশী সমাজের সমাজদর্শনের সঙ্গে মিলে যায়।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আলোচনা করতে করতে আমরা বর্তমান শতাব্দীতে পৌঁছে গিয়েছি। অর্থনীতিতে যাঁরা বিশেষভাবে এই শতকের প্রারম্ভে বাঙ্‌লা ভাষায় তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমেই যে তিনজনের নাম করতে হয় তাঁরা হলেন সখারাম গণেশ দেউস্কর (১৮৬৯-১৯১২), বিনয়কুমার সরকার (১৮৮৭-১৯৪৯) ও রাধাকমল মুখোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৬৮)। এখানে উল্লেখ করা উচিত যে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে আলাদা বিষয় হিসাবে অর্থনীতি পড়ানো আরম্ভ হয় ভারতে প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে—১৯০৭-এ বি-এ-তে এবং ১৯০৯-এ এম-এতে। অর্থনীতিতে প্রথম বি-এ অনার্স পরীক্ষা নেওয়া হয় ১৯০৯-এ

এবং প্রথম এম-এ পরীক্ষা ১৯১১ তে। এর আগে ইতিহাসের পাঠক্রমে অর্থনীতির একটি বিশেষ পত্র থাকত। বিনয়কুমার সরকার ইতিহাস ও ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ইতিহাসের। দেউস্কর প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশের পরেই শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতা বৃত্তি অবলম্বন করেন। এঁদের তিনজনই সমাজ বিজ্ঞানের নানা দিকে উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন এবং নিজেদের অধ্যয়ন, অনুসন্ধান ও বিচার-বিবেচনার ফল বাঙলা বই ও প্রবন্ধে প্রকাশ করেন। আগে ইংরেজিতে লিখে পরে বাঙলায় তা অনুবাদ না করে, এঁরা অনেক মূল লেখাই বাঙলায় লিখেছিলেন। অবশ্য দেউস্কর বাদে অন্য দু'জনের ইংরেজি রচনার সংখ্যাও অজস্র।

সখারাম দেউস্কর সাংবাদিক রূপে 'হিতবাদী'-তে কী কী লিখেছিলেন সেটা অনুসন্ধিৎসু গবেষক খুঁজে বার করবার চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু তাঁর একটি মাত্র বই 'দেশের কথা' (১৯০৫) তাঁকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল তার তুলনা নেই। বইটি স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হবার আগে লেখা (স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয় ১৯০৫-এর ১৬ই অক্টোবর—৩০শে আশ্বিন, —কার্জনের বঙ্গবিভাগ কার্যকর হবার পরে)। বস্তুত, স্বদেশী আন্দোলনের পিছনে যে চিন্তাধারার পটভূমিকা ছিল—যার অঙ্গ হিসাবে ছিল 'ডন সোসাইটি'র রচনাবলী এবং রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ'—দেউস্করের দেশের কথা তারই একটি বিশেষ অংশ। ১৯০৪ থেকে ১৯০৮ পর্যন্ত চার বছরে ১৩,০০০ বই বিক্রি সেযুগে একটা অকল্পণীয় ঘটনা। প্রত্যেকটি কপি যদি গড়পড়তা দশজন পাঠক পড়ে থাকেন, তাহলে প্রায় ১,৩০,০০০ পাঠক বইটি পড়েছিলেন। ১৯১০-এ বইটি বাজেয়াপ্ত হবার পরেও এর প্রচলন বন্ধ হয় নি এবং হিন্দি সংস্করণ 'দেশ কী বাত' বিক্রি হয়ে চলেছিল।

প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল যে 'দেশের কথা'-তে কোনো নূতন তথ্যগত গবেষণা নেই। যে তথ্য সম্ভারে বইটি সমৃদ্ধ তা মূলত তখন সদ্য-প্রকাশিত দাদাভাই নওরোজির 'পভার্টি' অ্যান্ড আনব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া' (১৯০১), উইলিয়ম ডিগবি-র 'প্রস্পারাস ব্রিটিশ ইন্ডিয়া' (১৯০১) এবং রমেশচন্দ্র দত্তের দুই খণ্ড অর্থনৈতিক ইতিহাস (১৯০১, ১৯০২) থেকে নেওয়া। কিন্তু জানা তথ্যকে নূতন ভাবে উপস্থাপিতকরা, তার বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়নও গবেষকেরই কাজ। আর জ্ঞানের প্রসার যদি পণ্ডিতের কাজ হয় তাহলে সে কাজ দেউস্কর অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে করেছিলেন। হয়তো রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাবল্যে তাঁর লেখার অনেক স্থানে কিছুটা অতি-ভাষণ ছিল, কিন্তু তাঁর যুক্তি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না।

ডিগবি-র মত অনুসরণ করে দেউস্কর প্রথমেই দেখাবার চেষ্টা করেন যে ভারতে দুর্ভিক্ষ পরম্পরা-র কারণ শস্যাভাব নয়, এর কারণ পাওয়া যাবে ক্রয়-ক্ষমতার স্বল্পতায়। শস্যনাশ হলেও পাশ্চাত্য দেশে দুর্ভিক্ষ হয় না, এটা ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান যুক্তি। এ যুক্তির মধ্যে ফাঁক আছে এবং দারিদ্র্য ও কৃষির মধ্যে সম্পর্কের বিশ্লেষণের অভাব আছে। তবু, কৃষি-প্রধান দেশের দারিদ্র্য সম্বন্ধে যে তুলনামূলক পরিসংখ্যান ডিগবি-র বই থেকে দেউস্কর উদ্ধৃত করেছিলেন তাতে মূল সত্যটি ধরা পড়ে। ডিগবি-র হিসাব গ্রহণ করেই তিনি ভারতবাসীর বার্ষিক গড়পড়তা আয় আঠারো টাকা নয় আনা এবং তা থেকে গড়পড়তা রাজকর দুইটাকা সাত আনা বাদ দিয়ে নীট ১৬ টাকা বলে দেখান। ইংরেজ রাজকর্মচারীর হিসাব নিয়ে ভূদেব মুখোপাধ্যায় ভারতবাসীর গড়পড়তা আয় ধরেছিলেন বার্ষিক ২৭ টাকা. এবং বলেছিলেন যে প্রায় ৫ কোটি লোকে অর্ধাহারে বা তার চেয়ে নীচু মানে ছিল। দেউস্কর সেখানে অন্য এক মত উদ্ধার করে বলেছিলেন যে তখন প্রায় দশ কোটি লোক ছিল দারিদ্র্যের মধ্যে। এই দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্গে ছিল শিল্পপাত ও বাণিজ্যে লাভ, যার ফলে সুদ ও লভ্যাংশ বিপুল

পরিমাণে বাইরে চলে যাচ্ছিল এবং দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যের প্রকোপ বাড়িয়ে তুলছিল। 'কৃষকের সর্বনাশ' নামক অধ্যায়ে ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার এক শোচনীয় চিত্র দেউস্কর তুলে ধরেছিলেন।

রেলপথ নির্মাণে বিদেশী কোম্পানিকে তাদের বিনিয়োগের উপরে শতকরা পাঁচ টাকা লাভের অংগীকার দেওয়া হয়েছিল, যেখানে বাজারে শতকরা আড়াই বা তিন টাকা সুদে টাকা তোলা সম্ভব ছিল। দেউস্করের মতে রেল-বিস্তারের ফলে দেশবাসীর পরিবর্তে বিদেশী বণিক-কুলেরই সুবিধা হয়েছিল—রেলের বদলে যদি সেচ-ব্যবস্থা প্রসারিত করা হোত তাহলে দারিদ্র্যের এতটা বৃদ্ধি হোত না। এ বিষয়ে এটাই ছিল তখনকার দিনের জাতীয়তাপন্থী মত। রেল ও খাল যে পরস্পরের বিকল্প নয় সেটা তখনো সকলে স্বীকার করতে চান নি। 'বংগীয় শিল্পিকুলের সর্বনাশ' ও 'দেশীয় শিল্পের ধ্বংস' নামে দুটি অধ্যায়ে দেউস্কর যে দুঃখজনক চিত্র দিয়েছিলেন, সেটা স্বদেশী ভাবধারাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। 'দেশের আয়ব্যয়' সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে তিনি দরিদ্র কৃষকদের উপরে করভার বৃদ্ধি, উৎপাদন শুল্কের কুফল এবং সরকারি ঋণের বোঝা সবই সামগ্রিক ভাবে আলোচনা করেছিলেন এবং সরকারি ব্যয়ের প্রায় সবটাই যে অনুৎপাদক তার উপরে জোর দিয়েছিলেন। দাদাভাই নওরোজি বর্ণিত 'হোম চার্জ' ও 'ইকনমিক ড্রেন', অর্থাৎ জাতীয় সম্পদের বহির্গমন (দেউস্করের ভাষায় 'সেলামী বা আক্কেল সেলামী') কী ভাবে ১৮৩৮-এর তিন কোটি টাকা থেকে বেড়ে শতাব্দী প্রান্তে এসে বছরে ২৪/২৫ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছিল তাও তিনি দেখিয়েছিলেন। অন্যদিকে শিক্ষা বা স্বাস্থ্য খাতে সরকারি ব্যয়ের সামান্যতার দিকেও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সবশেষে 'সম্মোহন-চিত্তবিজয়' নামক অধ্যায়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বিদেশী শাসনের ফলে ভারতবাসীর মনোজগতে কীভাবে অবনতি হয়েছিল, তার আলোচনাও দেউস্কর করেছিলেন।

দেশীয় রাজন্যবৃন্দের প্রতি তাঁর সহানুভূতি বা জনসংখ্যা-হ্রাস সম্বন্ধে তাঁর ভীতি আজকাল প্রশ্ন তুলবে, কিন্তু ভারতবাসীর দারিদ্র্য সম্বন্ধে প্রায় ৭৫ বছর আগে দেউস্কর যা লিখে গিয়েছিলেন তা তৎকালীন ইতিহাসের নূতন রচয়িতা উপেক্ষা করতে পারবেন না। হয়তো তাঁরা দেউস্করের নাম উল্লেখ করবেন না। কারণ 'দেশের কথা'-তে যে তথ্য আছে তা নওরোজি-রমেশচন্দ্র-ডিগবির রচনায় পাওয়া যাবে। এই ত্রয়ী যে সব পূর্বগামী রচনার উল্লেখ করেছিলেন তার মধ্যে আরো গভীরতর অনুসন্ধানও প্রয়োজন হবে। দেউস্করের সার্থকতা সহজবোধ্য ভাষায় সাধারণ পাঠকের জন্য অর্থনীতির মূল সমস্যা দারিদ্র্যের প্রকৃতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রণয়নে। অতিভাষণ, ব্যঙ্গ, উগ্রতা ইত্যাদি বাদ দিলে দেউস্করের রচনাকে তৎকালীন বাঙলা অর্থনৈতিক রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হয়।

বিনয়কুমার সরকার ছিলেন দেউস্করের মতই জাতীয় ভাবাপন্ন, কিন্তু তাঁর রচনায় আবেগের স্থান ছিল না। তিনি ছিলেন, তাঁর নিজেরই ভাষায়, 'বস্তুনিষ্ঠ'। তাঁর রচনা বিশেষভাবে তথ্য-নির্ভর, কিন্তু সে-তথ্য তিনি সহজ-প্রাপ্য বই বা রিপোর্ট বা ইংরেজ রাজপুরুষের মন্তব্য থেকে গ্রহণ করেন নি—তাঁর তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল তাঁর দেশ-বিদেশ সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে। নওরোজি থেকে রমেশচন্দ্র অনেকেরই একটা দুর্বলতা ছিল যে তাঁরা মনে করতেন ইংরেজ পাঠককে তাঁদের পক্ষে আনবার একমাত্র উপায় ইংরেজ লেখকের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া। বিনয়কুমার সেদিকে যান নি এবং তাঁর কোনো রচনা-ই ইংরেজ পাঠকের কাছে প্রতিবেদন রূপে লেখা হয় নি। ইংরেজিতে বিশেষ অধিকার থাকা সত্ত্বেও তাঁর বহু রচনা সরাসরি বাঙলায় লেখা।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে বিনয়কুমার তাত্ত্বিক সমস্যার দিকে নজর না দিয়ে তথ্য বিশ্লেষণের উপরেই জোর দিয়েছিলেন। তাঁর সময়ে প্রচলিত অর্থনীতির তত্ত্ব—যা

২

নূতনভাবে মার্শালের হাতে গড়ে উঠেছিল এবং যার প্রধান উপজীব্য ছিল বাজারের মূল্য-প্রতিষ্ঠার মূলে উদ্ঘাটন—তার প্রতি ছিল তাঁর সম্পূর্ণ অবহেলা। বরং ইংরেজি 'ক্লাসিক্যাল' সামগ্রিক অর্থনীতি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল বেশি। আজকের দিনে উন্নয়নী অর্থনীতির যাঁরা আলোচনা করেন তাঁরাও অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো বা মলথসে ফিরে গিয়েছেন। আজকাল যাকে 'তুলনামূলক অর্থনৈতিক আলোচনা' বা 'কমপ্যারাটিভ ইকনমিক্‌স' বলে অভিহিত করা হয়, বিনয়কুমার ছিলেন আমাদের দেশে তার প্রথম প্রবক্তা। ভারতের শিল্পোন্নয়নের দিকে ছিল তাঁর বিশেষ মনোযোগ এবং এ-জন্য তিনি ব্রিটেন, জার্মানি, জাপান প্রভৃতি দেশে কোন্ পথে শিল্পোন্নয়ন হয়েছে এবং সেই পথ ভারতে কীভাবে স্থাপন করা যেতে পারে তার দিকেই তাঁর লক্ষ ছিল বেশি। তাই ব্যাঙ্ক, যানবাহন ইত্যাদির অগ্রগতি সম্বন্ধে উল্লেখ তাঁর রচনায় বারংবার পাওয়া যায়। বিভিন্ন দেশের শিল্পোন্নতির একটা তুলনামূলক সূচী বা সমীকরণ ('ইকুয়েশন্‌স্ অভ্ কম্প্যারাটিভ্ ইন্ডাসট্রিয়্যালিজম্') বার করার জন্য যে চেষ্টা তিনি করেছিলেন তা আজকালকার পরিসংখ্যান-শাস্ত্রের উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে অসম্পূর্ণ মনে হবে, কিন্তু বিনয়কুমার যখন এই ধরনের হিসাব করেছিলেন, তখন তিনিই ছিলেন এই পথে অগ্রণী।

বিনয়কুমারের গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলীর পরিধি নিয়ে একটা বড় রকমের গবেষণা হতে পারে। এখানে শুধু কয়েকটি মূল বিষয়ের উল্লেখ সম্ভব। প্রথমত, বিনয়কুমার কখনোই প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধে যেতে সঙ্কুচিত হন নি। ভারতবাসী ক্রমে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে এটা তিনি মানতে পারেন নি, ইংরেজ শাসনের কুফল সম্বন্ধে সোচ্চার হওয়া সত্ত্বেও। তাঁর মতে ভোগ্য দ্রব্যের ব্যবহার হ্রাস বৃদ্ধি দিয়েই দারিদ্র্যের পরিমাপ হওয়া উচিত। এটা মেনে নিতে এখন কারো বাধবে না, কিন্তু বিনয়কুমারের দিনে এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসবার মত পরিসংখ্যান ছিল না। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় মূলধন যদি এগিয়ে না আসে ত হলে দেশের শিল্পোন্নয়ন দ্রুত করবার জন্য বিদেশী মূলধনের সাহায্য নিতে তাঁর আপত্তি ছিল না। তৃতীয়ত, টাকা ও পাউন্ডের বিনিময় মূল্য নিয়ে তখনকার বিখ্যাত ষোল-পেন্স আঠারো-পেন্স বিতর্কে প্রবল ভারতীয় মনের বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে টাকার দাম কমালে ক্রেতা সাধারণের সমূহ ক্ষতি হবে। আজকাল যাঁরা কুড়ির দশকের অর্থনৈতিক বিতর্কগুলি নূতন করে বিচার করছেন তাঁরা বিনয়কুমারের অনেক উক্তির যাথার্থ্য স্বীকার করে নিচ্ছেন।

আরো দু'টি-বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। প্রথমত বিদেশী ভাষার বিখ্যাত বইয়ের বাঙলা অনুবাদ করে সাধারণ পাঠকের কাছে সেগুলিকে পৌঁছে দেবার কাজ বিনয়কুমার সাগ্রহে আরম্ভ করেছিলেন। ফ্রিড্‌রিশ লিস্‌টের সংরক্ষণনীতি সম্বন্ধে মৌলিক বই (১৮৪১) বিনয়কুমার মূল জার্মান থেকে অনুবাদ করেন ১৯৩২-এ। তারও আগে ফরাসী ধনবিজ্ঞানী লাফার্গ-এর বই অনুবাদ করেন 'ধনদৌলতের রূপান্তর' নামে ১৯২৭-এ। এবং তারও আগে, যখন আমাদের দেশে মার্কসীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে জ্ঞান ও আগ্রহ খুবই সীমিত ছিল, তখন এঙ্গেল্‌স্-এর 'পরিবার গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র' অনুবাদ করেন বিনয়কুমার ১৯২৬-এ। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব বহু বছর ধরে 'আর্থিক উন্নতি' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ। সে সময়ে ভারতে ইংরেজি ভাষাতেও ঐ জাতীয় কোনো সাময়িক পত্রিকা ছিল না। বিনয়কুমারের সঙ্গে যে কয়েকজন উৎসাহী শিষ্য ছিলেন তাঁরা পত্রিকাটিতে লিখতেন, কিন্তু বেশিরভাগ রচনাই ছিল সম্পাদকের নিজের লেখা। দুঃখের কথা, তাঁর নিকটবর্তী একটি ছোট গোষ্ঠীর বাইরে বিনয়কুমার তাঁর যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠা পান নি।

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ছিলেন বিনয়কুমারের মতই ব্যাপক অর্থে সমাজবিজ্ঞানী।

তিনিও নিজেকে শুধু অর্থনীতির সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে আবদ্ধ রাখেন নি। তাঁর বেশির ভাগ লেখাই ইংরেজিতে। প্রথম জীবনের লেখা ভারতীয় গ্রামীণ শিল্প সম্বন্ধে বই 'ফাউণ্ডেশন্‌স্ অভ্ ইণ্ডিয়ান ইকন্‌মিক্‌স' থেকে আরম্ভ করে মধ্য জীবনে জনসংখ্যা ও খাদ্যের উপরে সুচিন্তিত কাজ এবং শেষ জীবনে লেখা ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর উপরে বই, সব কিছুতেই তিনি তাঁর তথ্যানুসন্ধান ও বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। রচনা ও সিদ্ধান্ত মাঝে মাঝে একটু আবেগপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় অর্থনীতিবিদ-দের মধ্যে তাঁর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। বাঙলায় তিনি লিখেছিলেন ছোট পুস্তিকা—'দরিদ্রের আহ্বান' ও 'পল্লীসেবক' —এবং একটি মূল্যবান বই 'দরিদ্রের ক্রন্দন'। ১৯১৫ সালে লেখা এই বইটি একটি কারণে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে, কারণ এতে একটি নিজস্ব সমীক্ষা দিয়ে দারিদ্র্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ নিরূপণের চেষ্টা ছিল। আজকাল এধরনের সমীক্ষা ব্যাপক ও গভীর হয়েছে। কিন্তু ৬৫ বছর আগে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক তাঁর ছাত্রদের দিয়ে কয়েকটি পরিবার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করছেন এটা তখন অভাবনীয় ছিল। সমীক্ষার জন্য যে প্রশ্ন-তালিকা তৈরি করা হয়েছিল তাতে পরিবারের লোকসংখ্যা (স্ত্রী, পুরুষ, শিশু, কর্মী ও পোষ্য), জমি, যন্ত্রপাতি, গৃহপালিত পশু ও অন্যান্য সম্পদ, পেশা, উৎপাদন, আয় (মজুরি, বিক্রয়-লব্ধ অর্থ, লাভ), ঋণ ও সুদ, খাদ্য-বস্ত্র-চিকিৎসার জন্য ব্যয়, সঞ্চয়ের ব্যবহার (গহনা, ঋণদান, উৎপন্ন জিনিসের মজুত, ব্যাঙ্ক আমানত) ইত্যাদি অনেক প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য ছিল।

সমীক্ষাটি করা হয়েছিল মাত্র অল্প কয়েকটি পরিবারকে নিয়ে—চট্টগ্রাম জেলায় তিনটি, মেদিনীপুরের দু'টি এবং ফরিদপুরের তিনটি। এত অল্প-সংখ্যক পরিবার থেকে তথ্য নেওয়াতে এবং কীভাবে পরিবারগুলিকে বাছাই করা হয়েছিল সেটা না বলে দেওয়াতে নানা প্রশ্ন উঠবে। বহরমপুরে যে সমীক্ষার সূত্রপাত তাতে মুর্শিদাবাদ জেলা কেন বাদ পড়ল সেই প্রশ্নও উঠতে পারে। সম্ভবত, তিন চারটি উৎসাহী ছাত্র ছুটিতে তাদের দেশের বাড়িতে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। সমীক্ষাতে ত্রুটি ছিল অনেক, কিন্তু এটিই বোধহয় বাঙলা ভাষায় সমীক্ষা-ভিত্তিক প্রথম অর্থনৈতিক রচনা। বিখ্যাত 'এঞ্জেলের নিয়ম' দিয়ে আয় ও ভোগ্যদ্রব্যের ব্যবহারের সম্পর্ক যাচাই করবার চেষ্টাও রাধাকমল করেছিলেন।

মূল দারিদ্র্য সমস্যা সম্বন্ধে রাধাকমলের দৃষ্টিভঙ্গী তখনকার দিনের অন্য অর্থনীতিবিদ্‌দের মতই ছিল। পল্লীর উন্নতি, সমবায়-ব্যবস্থার প্রসার, শিল্প ও বাণিজ্যে অধিকতর বিনিয়োগ ইত্যাদি বিষয় ছাড়াও প্রথম মহাযুদ্ধের গোড়ার সময়ের আর্থিক সমস্যা সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেছিলেন। 'পল্লী-সভ্যতার পুনরুত্থান' নিয়ে লিখতে গিয়ে তিনি হিন্দু আদর্শের গুণগান করেছিলেন এবং তাতে স্বভাবতই একটু আবেগের লক্ষণ ছিল। কিন্তু, শিল্পোন্নতিতে সংরক্ষণের প্রয়োজন, খাদ্যশস্যের বদলে অন্য শস্যের উৎপাদনের অপকার, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি নিয়ে তিনি যা বলেছিলেন, তা ছিল তখনকার অন্য রচনার তুলনায় অনেক বেশি যুক্তিগ্রাহ্য।

দেউস্কর-বিনয়কুমার-রাধাকমল এই ত্রয়ীর পরে বাঙালী অর্থনীতিবিদ্‌দের রচনার একটা গৌরবময় যুগ আরম্ভ হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালে কলকাতা ও ঢাকা দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির পঠন ও পাঠনে অনেক উন্নতি হয়। শিক্ষার্থীরা অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পর্যন্ত পড়া শেষ করে দেশে বা বিদেশে নানা বিষয়ে গবেষণা করেন। এই গবেষণার তালিকা খুব দীর্ঘ হবে, তবে কয়েকটি নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন —রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, যিনি পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত তাঁর গবেষণা অব্যাহত রাখেন, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় নিয়ে মূল্যবান ইতিহাস লিখেছিলেন;

বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, যিনি উত্তর ও পূর্বভারতের কৃষি ও জনসংখ্যা সম্বন্ধে প্রামাণ্য বই লেখেন; যোগীশচন্দ্র সিংহ, যিনি বঙ্গদেশের অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর আর্থিক ইতিহাস অনেকখানি পুনর্গঠন করে এনেছিলেন; হরিশচন্দ্র সিংহ, যিনি গবেষণা করেছিলেন প্রথম ব্রিটিশ যুগের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা নিয়ে; হীরেন্দ্রলাল দে, যাঁর আমদানি শুল্ক ও সংরক্ষণ নিয়ে লেখা বই এখনো প্রামাণ্য; দ্বারকানাথ ঘোষ, যিনি প্রথমে শুল্কনীতি এবং পরে জনসংখ্যা ও আর্থিক উন্নতির উপরে যুক্তিপূর্ণ বই লিখেছিলেন; এবং অমিয়কুমার দাশগুপ্ত, যিনি গবেষণা করেছিলেন অর্থনীতিতে উদ্বৃত্ত-তত্ত্ব সম্বন্ধে। আরো অনেকের নাম করা যায়, কিন্তু দুঃখের কথা যে এঁরা কেউই প্রায় বাঙলায় উল্লেখযোগ্য কিছু লেখেন নি। কেন লেখেন নি তার কারণ আগেই বিবৃত হয়েছে, কিন্তু ভাল পত্রিকার সম্পাদক বা উৎসাহী প্রকাশকের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেলে হয়তো এঁরা কেউ কেউ বাঙলায় লিখতেন। একমাত্র ব্যতিক্রম 'প্রবাসী'র কথা আগে বলা হয়েছে। খুব উচুঁদরের মননশীল যে সব পত্রিকা ত্রিশের দশকে বেরিয়েছিল—যেমন 'পরিচয়'—তাদের প্রধান উপজীব্য ছিল সাহিত্য, দর্শন ও চারুকলা।

উপরের আলোচনাতে যাঁরা অর্থনীতি নিয়ে বিশেষ করে লিখেছিলেন তাঁদের কথাই বলা হয়েছে। রাজনীতিবিদ্ ও দার্শনিকদের মধ্যে অনেকে মাঝে মাঝে অর্থনীতি সম্বন্ধে বিবিধ উক্তি করেছেন—যেমন স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, চিত্তরঞ্জন দাশ এবং সুভাষচন্দ্র বসু। রসায়ন-পণ্ডিত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের শিল্পোন্নয়ন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট মতামত ছিল। এই সময়ে বাঙলায় অর্থনীতি সম্বন্ধে দু'একটি জনপ্রিয় বই লেখা হয়েছিল, কিন্তু গ্রন্থকারেরা কেউ-ই অধ্যাপক বা গবেষক ছিলেন না। ১৯২৫-এ নরেন্দ্রনাথ রায় 'টাকার কথা' নামে একটি আশি পৃষ্ঠার ছোট বই লেখেন যাতে মুদ্রার উৎপত্তি ও সাধারণ সমস্যার সঙ্গে ভারতীয় মুদ্রানীতি ও আন্তর্জাতিক লেনদেনের সংক্ষিপ্ত আলোচনাও ছিল। ঐ একই নামে অন্য একটি উল্লেখযোগ্য বই লেখেন অনাথগোপাল সেন ১৯৩৬ সালে। মুদ্রানীতি ও অর্থনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা ছাড়াও অনাথগোপাল ব্যাঙ্কিং, অর্থসঙ্কট, শিল্পের অন্তরায় প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন অধ্যায় লিখেছিলেন। তাঁর ভাষা ছিল সহজগতি এবং দৃষ্টিভঙ্গী (স্বর্ণমান সম্বন্ধে একটু দুর্বলতা সত্ত্বেও) ছিল বিজ্ঞান-সম্মত। পরিশিষ্টে একটি পরিভাষার তালিকাও ছিল। নরেন্দ্রনাথ রায়ও পরবর্তীকালে পরিভাষার একটি পুস্তিকা লিখেছিলেন এবং তারও পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিভাষা সমিতি এদিকে আরও অগ্রসর হয়ে ভবিষ্যৎ লেখকদের সুবিধা করে দিয়েছিলেন।

চল্লিশের দশকে বাঙলা ভাষায় অর্থনীতি নিয়ে রচনার ইতিহাসে একটি বিশেষ অধ্যায় শুরু হলো 'বিশ্ব-বিদ্যা-সংগ্রহ' পুস্তকাবলীর মাধ্যমে। বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য ছিল বিলাতী হোম ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরির মত নানা বিষয়ে বাঙলা বই প্রকাশ করে বিদ্যোৎসাহী জনগণকে জ্ঞান বাড়াবার সুযোগ দেওয়া। এই প্রকল্পে অর্থনীতির উপরে প্রথম বই রাজশেখর বসুর 'কুটিরশিল্প'; তিনি পরে 'ভারতের খনিজ' নামে আর একটি বইও লেখেন। অন্যান্য বইয়ের মধ্যে ছিল—সত্যপ্রসাদ রায়চৌধুরীর 'জমি ও চাষ'; কুদরৎ-এ-খুদার 'যুদ্ধোত্তর বাঙলার কৃষি ও শিল্প'; প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা' (পুনর্মুদ্রণ); অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'জমির মালিক'; শান্তিপ্রিয় বসু-র 'বাঙলার চাষী'; শচীন সেনের 'বাঙলার রায়ত ও জমিদার'; ভবতোষ দত্তের 'ধনবিজ্ঞান'; বিমলচন্দ্র সিংহের 'আন্তর্জাতিক বাণিজ্য' ও 'পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস'; অতুলচন্দ্র সুরের 'টাকার বাজার'; চন্দ্রশেখর ঘোষের 'দামোদর পরিকল্পনা'; রবীন্দ্রনাথের 'সমবায় নীতি'; পূর্ণেন্দুকুমার বসু-র 'রাশি বিজ্ঞানের কথা'; নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্যের 'বাঙলার ভূমি ব্যবস্থা' ও নীলরতন ধরের 'জমির উর্বরতা বৃদ্ধির

উপায়'। রমেশচন্দ্র দত্তের ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের একটি অতি-সংক্ষিপ্ত বাঙলা অনুবাদও এই সংগ্রহে প্রকাশিত হয়েছিল।

এই বইগুলির মধ্যে কয়েকটি আজকাল দুষ্প্রাপ্য, আর অন্য কয়েকটি নূতন রূপে দেখা দিয়েছে—যেমন অতুলচন্দ্র সুরের 'টাকার বাজার' নামে নূতন বই। এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে বিশ্বভারতী সযত্নে লেখক নির্বাচন করেছিলেন এবং তাঁদের উৎসাহ দিয়ে বাঙলায় লিখতে প্রবৃত্ত করেছিলেন। ঠিক এর অনুরূপ কাজ বাঙলা ভাষায় এর পরে আর হয় নি। *যদিও 'জিজ্ঞাসা' নামক প্রতিষ্ঠান তাঁদের 'বিচিত্রবিদ্যা গ্রন্থমালা'তে দু'টি অর্থনীতির বই* প্রকাশ করেছেন।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তী তিন দশকে আমাদের অর্থনীতিচর্চার মান উৎকর্ষের উচ্চ শিখরে পেঁছেছে। বাঙ্গালী তরুণ গবেষকদের মধ্যে অনেকে বিশ্বজোড়া খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালী, তথা ভারতীয় অধ্যাপক আজকাল অনেক—ভারতের ও বিদেশের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদান-প্রদানে ভারতীয় গবেষক এখন গ্রহীতা ও দাতা দুই রূপেই কাজ করে যাচ্ছেন। পরিকল্পিত উন্নয়নের নীতি গৃহীত হবার পরে অনুন্নত দেশে আয়বৃদ্ধি ও অসাম্য দূরীকরণ নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়েছে এবং যে সব বিষয়ে সমস্যাগুলিকে আমরা সামগ্রিক ভাবে জানতাম, সেগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অনুশীলন করবার প্রয়োজনও দেখা দিয়েছে।

অর্থনীতি-ক্ষেত্রের জ্ঞানী গবেষকদের এই নূতন প্রজন্মের যিনি অন্যতম পথিকৃৎ সেই প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ছিলেন বয়সে প্রবীণ এবং তাঁর ক্ষেত্র ছিল পরিসংখ্যান তত্ত্ব। প্রশান্তচন্দ্র পরিকল্পিত অর্থনীতির রূপকল্প কীরকম হওয়া উচিত তার একটা খসড়া তৈরি করে অনেকদিকে আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। উন্নয়ন সমস্যার নানা দিক নিয়ে যে সব বাঙালী অর্থনীতিবিদ্ সাম্প্রতিক কালে কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন অম্লান দত্ত, ধীরেশ ভট্টাচার্য, সন্তোষ ভট্টাচার্য, অজিতকুমার বিশ্বাস, অজিত দাশগুপ্ত, অরুণ বসু, সুখময় চক্রবর্তী, অমর্ত্য সেন, অশোক রুদ্র ও আরো অনেকে। জাতীয় আয়ের পরিমাপ, তার বণ্টন, কৃষি আয় ও শিল্প-জনিত আয়ের মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন মণি মুখোপাধ্যায়, অম্বিকা ঘোষ, রঞ্জিত সাহু, প্রণবকুমার বর্ধন, অশোক মিত্র, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র ও অমিত ভাদুড়ী। আর্থিক উন্নতিতে বিদ্যুৎশক্তির সমস্যা নিয়ে অনুসন্ধান করেছেন দেবকুমার বসু ও নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্বন্ধে তাত্ত্বিক গবেষণা করেছেন সুবিমল মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী ও প্রবুদ্ধনাথ রায়। মুদ্রানীতি ও ব্যাঙ্কিং নিয়ে কাজ করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ সেন, অলক ঘোষ, মিহিরকান্তি রক্ষিত, শান্তিকুমার চক্রবর্তী, হীরেন্দ্রনাথ রায় ও প্রদীপ মাইতি। অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে তত্ত্বগত গবেষণা করেছেন তাপস মজুমদার, অনিল মুখোপাধ্যায়, অজিত দাশগুপ্ত, অমর্ত্য সেন ও দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষি ও ভূমি ব্যবস্থা নিয়ে লিখেছেন প্রণবকুমার বর্ধন, কল্পনা বর্ধন, কল্যাণ দত্ত, রঞ্জিত সাহু, গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল, নৃপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রণজিৎ লাহিড়ী, অজিত বসু। গাণিতিক অর্থনীতিতে বিশিষ্ট কাজ করেছেন যতিকুমার সেনগুপ্ত, মুকুল মজুমদার, সঞ্জিত বসু। জনসংখ্যার সমস্যা নিয়ে ইতিহাস-ভিত্তিক গবেষণা করেছেন অশোক মিত্র (দিল্লী), অজিত দাশগুপ্ত (রাষ্ট্র-সংঘ), দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, আশিস বসু ও সুধাংশু মুখোপাধ্যায়। ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের নানা দিক নিয়ে গবেষণা করেছেন নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, অমলেশ ত্রিপাঠী, তপন রায় চৌধুরী, কীর্তিনারায়ণ চৌধুরী, অশীন দাশগুপ্ত, বরুণ দে, অমিয়কুমার বাগচী, রজতকুমার রায়, প্রদীপ সিংহ, সুনীল সেন, সুমিত সরকার, সব্যসাচী ভট্টাচার্য, নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য, সৌগত মুখোপাধ্যায়, বিনয় চৌধুরী, অশোক সেন, চিত্তব্রত

পালিত, নরেন্দ্র সেন ও আরো অনেকে। এখানে উল্লেখ প্রয়োজন যে ইতিহাসের ছাত্ররা অর্থনৈতিক ইতিহাস আলোচনার দিকে বিশেষভাবে আগ্রহী হয়েছেন।

এই তালিকা দীর্ঘ, কিন্তু অসম্পূর্ণ। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত অনেক তরুণ বাঙ্গালী অর্থনীতিবিদ্ আছেন যাঁদের সম্পূর্ণ তালিকা এখানে পাওয়া যায় না। আমাদের খুবই গৌরবের কথা যে অর্থনীতির ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর গবেষণার ব্যাপ্তি ও গভীরতা পৃথিবীর যে কোন দেশের গবেষকের কাজের সঙ্গে তুলনীয়। অন্যদিকে দুঃখের কথা যে, এঁরা প্রায় কেউই বাঙ্‌লায় লেখেন নি। অবশ্য, সাধারণ পাঠকের জন্য মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকায় এঁদের অনেকে লিখেছেন এবং এঁদের মধ্যে এমন কয়েকজন আছেন যাঁদের বাঙ্‌লায় প্রকাশ ভঙ্গী স্বচ্ছ ও সাবলীল। 'ভারত কোষ'-এর অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধগুলি এঁরাই লিখেছিলেন এবং তার প্রত্যেকটিই খুব উঁচু মানের হয়েছিল। এঁরা কেন ইংরেজিতে লেখেন তার কারণ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এঁরা কেন বাঙ্‌লায় বিশেষজ্ঞ পাঠকদের জন্য উঁচু স্তরের বই লেখেন না তার কারণ পাওয়া যাবে সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রকাশন-সংস্থাগুলির এদিকে বিশেষ ভাবে নজর না দেওয়ায়। হয়তো উঁচুদরের বাঙ্‌লা বই ব্যবসায়ের দিক থেকে লাভজনক হবে না। কিন্তু এই জন্যই সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পদক্ষেপ প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে বই প্রকাশের জন্য যে টাকা থাকে তার একটা বড় অংশ যদি বাঙ্‌লায় গবেষণামূলক বইয়ের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয় এবং লেখকদের সর্বপ্রকারে উৎসাহ দেওয়া হয় তাহলে অনেকটা উন্নতি হতে পারে। সরকার বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করে বাঙ্‌লা পাঠ্য বই বার করছেন এবং তার মধ্যে ভাল বই অপ্রতুল নয়। কিন্তু পরীক্ষার্থী ছাত্রের পাঠ্যের চেয়ে উঁচু মানের বই বার করতে সরকার কেন সাহায্য করবেন না তার কোনো কারণ নেই।

পাঠ্য বই সম্বন্ধে দু' একটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন। বিদেশী পাঠ্য বই বাঙ্‌লায় অনুবাদ করবার একটা প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছে। অর্থনীতির মত বিষয়ে এ-ধরনের প্রচেষ্টা অর্থ ও শ্রমের অপব্যয়। যে অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল নিয়ে ইংরেজি পাঠ্য বই লেখা সেটা আমাদের দেশে খুঁজে পাওয়া যাবে না—তাই এ-ধরনের অনুবাদে ছাত্ররা তাদের পরিচিত পৃথিবীকে খুঁজে পায় না। দ্বিতীয়ত, বিদেশী পাঠ্য বই যদি সত্যই ভাল হয় তাহলে পাঁচ-বছরে তার পাঁচটি বিভিন্ন সংশোধিত সংস্করণ বেরিয়ে যাবে। অন্যদিকে বাঙ্‌লা অনুবাদের প্রথম মুদ্রণ শেষ হতেই পাঁচ বছরের বেশি লেগে যায় এবং ফলে একই সময়ে প্রাপ্তব্য বিলাতি আমেরিকান বই ও তার বাঙ্‌লা অনুবাদের মধ্যে তথ্যগত, তত্ত্বগত এবং গুণগত পার্থক্য বড় হয়ে দেখা দেয়। বাঙ্‌লায় পাঠ্য বই বাঙ্গালী অর্থনীতিবিদ্ নিজেরা স্বাধীন ভাবে লিখবেন এটাই কাম্য। অনুবাদ হবে সেই সব মূল গ্রন্থের যেগুলিকে 'ক্লাসিক' বলা যায়।

যে সব অনুবাদ সাম্প্রতিক কালে বাঙ্‌লায় হয়েছে তার মধ্যে সুধাকান্ত দে-কৃত রিকার্ডোর 'অর্থনীতি ও করতত্ত্বের' মত প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা আছে। কিন্তু অধিকাংশ অর্থনীতির ইংরেজি বা অন্য ভাষার ক্লাসিকের অনুবাদ এখনো হয় নি। আজকাল মার্কস্-বাদী তরুণ অর্থনীতি বিদের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু মার্কসীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ একটি বাঙ্‌লা বই এখনো বেরোয় নি, মার্কসবাদ নিয়ে গবেষণা তো দূরের কথা। রুশ ভাষা থেকে অনেক মার্কসীয় বইয়ের বাঙ্‌লা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাষার আড়ষ্টতা ও পাঠকের প্রয়োজনের প্রতি অবহেলায় দুষ্ট। উন্নয়ন-পরিকল্পনা নিয়ে কয়েক বছর আগে প্রিয়তোষ মৈত্রেয় লিখেছিলেন 'ভারতের ধনতান্ত্রিক বিকাশের ভূমিকা' আর সুশোভন সরকার লিখেছিলেন 'কমিউনিজমের উৎপত্তি'। এই পথে আরো ভাল বই অনেক লেখা হতে পারত। যেমন পারত উন্নয়নী অর্থনীতির অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গী থেকে লেখা

রচনা। মহাত্মা গান্ধী প্রদর্শিত অর্থনৈতিক কর্মধারা সম্বন্ধে কয়েকটি বই বাঙলায় লেখা হয়েছে কিন্তু এ ক্ষেত্রেও বিশ্লেষণী আলোচনার অভাব।

পরিশেষে, এই আশা প্রকাশ করি যে, পাণ্ডিত্যের যেখান প্রাচুর্য, প্রকাশের সুযোগ সেখানে আসবে নিশ্চয়ই। সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি একযোগে অগ্রসর হলে বছরে যদি দু'তিন খানা অর্থনীতির গবেষণা-ভিত্তিক বই প্রকাশ করাও সম্ভব হয়, তাহলেও অনেক উপকার হয়। আর যদি অন্তত একটি ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিক পত্রিকা থাকে যাতে অর্থনীতির নূতন গবেষণা নিয়ে রচনা থাকবে, তাহলেও আমাদের জ্ঞানের সমৃদ্ধি অনেক বাড়ে। বাঙলায় লেখা ইংরেজিতে লেখার বিকল্প নয়। আমাদের কামনা, যাঁরা ইংরেজিতে উঁচুদরের বই বা প্রবন্ধ লিখেছেন তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে বাঙলায়ও সেই রকমের উঁচু মানের বই লিখবেন। ইংরেজি লেখা হবে উচ্চশিক্ষিত পাঠকের জন্য ও বাঙলা লেখা হবে অল্প শিক্ষিতের জন্য—এই বিপজ্জনক ধারণা থেকে আমাদের মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। হয়তো এরকম দিনও আসবে যখন অর্থনীতির গবেষণালব্ধ ফল নিয়ে মূল রচনা হবে বাঙলায় এবং পরে তার অনুবাদ হবে ভারতের অন্যান্য ভাষায় ও ইংরেজিতে।*

* ৮ই মার্চ ১৯৮০ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে প্রদত্ত 'রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি বক্তৃতা'

'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর রচনাকাল এবং ব্রজের গৌড়ীয় সম্প্রদায়

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়

'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর কোনো কোনো পুথিতে কালজ্ঞাপক শ্লোকটির যে পাঠ[১] পাওয়া যায় তাতে লিপিকর বিকৃতি অগ্রাহ্য করলে 'সিন্ধু,' 'অগ্নি,' 'বাণ' এবং 'ইন্দু' এই চারটি সংখ্যাদ্যোতক শব্দে জানানো হয়েছে যে, ১৫৩৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে 'গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ'। যেহেতু আর কোনো পুথিতে শ্লোকটি পাওয়া যায়নি তাই উল্লেখ না থাকলেও বুঝতে হবে 'গ্রন্থোঽয়ং' শব্দের লক্ষ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'। শ্লোকটি যদি প্রকৃতই রচনাকালজ্ঞাপক হয় তাহলে রচনাকালের এমন স্পষ্ট নির্দেশ আর একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থে পাওয়া যায়—গুণরাজ খানের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ('চৈতন্যচরিতামৃত'-এর মত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর সব পুঁথিতেও রচনাকালজ্ঞাপক ছত্রদুটি পাওয়া যায় না)। তবে সংস্কৃত শ্লোকে বাঙ্গালা বইয়ের রচনাকালের নির্দেশ 'চৈতন্যচরিতামৃত' ছাড়া দ্বিতীয় কোনো বইতে নেই। শ্লোকটি 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর সব পুথিতে নেই, কিন্তু অনেক পুথিতে আছে। বৃন্দাবন রিসার্চ ইনস্টিটিউটের আনুমানিক পঁচিশখানি অখণ্ড পুথির মধ্যে বারোখানিতে শ্লোকটি আছে। এই বারোখানির মধ্যে পাঁচখানিতে কালজ্ঞাপক সংস্কৃত শ্লোকটিও আছে, আবার লিপিকালও আছে। সুতরাং সব পুথিতে না থাকলেও যে সব পুথিতে শ্লোকটি আছে তাদের সংখ্যাও কম নয়। তথাপি শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত কিনা; সে বিষয়ে মতবিরোধ আছে। প্রক্ষিপ্ত হক বা না হক, শ্লোকটিতে রচনাকালের যে নির্দেশ পাওয়া যায় তা যে 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর রচনাকালের সমসাময়িক তার সমর্থনে কিছু প্রমাণ সম্প্রতি পাওয়া গেছে, 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর মধ্যেও কিছু প্রমাণ আছে। এই প্রমাণগুলির সাহায্যে 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর রচনাকালের অনিশ্চয়তা দূর করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। পরিশিষ্টে ব্রজের গৌড়ীয় সম্প্রদায় সম্বন্ধে কিছু প্রয়োজনীয় নূতন তথ্যের সন্ধান দেওয়া হয়েছে।

---

১. কালজ্ঞাপক শ্লোকটির প্রচলিত পাঠ—'শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্যেঽহ্ন্যসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাংগতঃ॥

'সিন্ধু' শব্দের অর্থ ৭ ধরলে ১৫৩৭ শকাব্দ (=১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দ) পাওয়া যায়; কিন্তু 'সিন্ধু' এবং সমার্থক 'সমুদ্র' শব্দের গাণিতিক অর্থ ৪ (দ্র. Monier-Williams, Sanskrit dictionary, S. V.) এবং এই অর্থে 'সমুদ্র' শব্দটি রঘুনাথ দাসের দলিলে ব্যবহার করা হয়েছে, (পাদটীকা ৮ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে ব্রজমণ্ডলে 'সিন্ধু' এবং 'সমুদ্র'-এর অর্থ ছিলো ৪। 'প্রেমবিলাস'-এর পাঠান্তর 'অগ্নিবিন্দুবাণেন্দৌ' অনুসারে রচনাকাল ১৫০৩ শকাব্দ (=১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দ)। জ্যোতিষ গণনায় জানা গেছে (জ্যোতিষ গণনায় যদি কারও আস্থা থাকে এবং জ্যোতিষ গণনা নির্ভুল হওয়া সম্ভব বলে যদি কেউ বিশ্বাস করেন) এই তারিখে বার তিথির মিল হয় না। তাছাড়া, 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর কোনো পুথিতে এই পাঠান্তর পাওয়া গেছে বলে শুনিনি। বারোখানি পুথিতে 'শাকেসিন্ধ্বগ্নি' শ্লোকটির বিভিন্ন প্রকার লিপিকর বিকৃতির মধ্যে কোথায়ও 'অগ্নিবিন্দু' পাওয়া যায় নি। সুতরাং 'সিন্ধ্বগ্নি' লিপিকর বিকৃতিতে 'অগ্নিবিন্দু' হয় নি। 'অগ্নিবিন্দু' পাঠান্তরের ইতিহাস অন্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং 'চৈতন্যচরিতামৃত' সম্বন্ধে 'প্রেমবিলাস' ('কর্ণানন্দ' এবং 'বিবর্তবিলাস')-এ একাধিক গল্প আছে। একটি গল্পের বিষয়, রঘুনাথ দাসের চোখের সামনে কৃষ্ণদাস কবিরাজের মৃত্যু। এই অসম্ভব ঘটনা ১৫৩৪ শকাব্দের পরিবর্তে ১৫০৩ শকাব্দে ঘটলে বিশ্বাসযোগ্য হবে এই আশায় 'প্রেমবিলাস'-এর লেখক 'সিন্ধ্বগ্নি'-কে 'অগ্নিবিন্দু'-তে পরিণত করে বাঙ্গালায় লিখেছেন, পনর শত তিন শকাব্দে 'পূর্ণ কৈল গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে'। অনুমান হলেও এটাই 'অগ্নিবিন্দু' পাঠের যথার্থ ইতিহাস বলে আমার বিশ্বাস।

'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর রচনাকালের আলোচনায় সুকুমার সেন পাটনার একখানি পুঁথিকে[৩] সাক্ষ্য মেনে সেই পুঁথিখানির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছিলেন ('বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,' ১।১, ১৯৭৮, ৩৫১-৩৫২)। এই বিবরণে দুখানি পুঁথির সংবাদ একসঙ্গে মিশে গিয়ে যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো পরবর্তীকালের গবেষকদের কাছে তা অজ্ঞাত রয়ে গেছে। তাঁরা পাটনার পুঁথি চাক্ষুষ না করেই নানা রকম গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। কোনো কোনো গবেষণার ফল হাস্যকর বললেও কম বলা হয়। গবেষণা আরও অগ্রসর হওয়ার আগে পাটনার পুঁথির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

পাটনার শ্রীচৈতন্য পুস্তকালয়ে দুখানি 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর পুঁথি আছে, একখানি নাগরীতে আর একখানি বঙ্গাক্ষরে। শ্রীচৈতন্যপুস্তকালয়ের অধিকর্তা বৃন্দাবনের রাধারমণ মন্দিরের সেবাধিকারী বংশের লোক। তিনি যে পুঁথিগুলি বৃন্দাবন থেকে পাটনায় নিয়ে এসেছিলেন 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর পুঁথিদুখানি তাদের মধ্যে ছিলো। নাগরী পুঁথিখানি বৃন্দাবনেই লেখা, বঙ্গাক্ষরের পুঁথিখানি কোথায় লেখা হয়েছিলো জানা যায় না। তবে পাঠ মিলিয়ে সহজেই ধরা যায় যে পুঁথিদুখানি এক মূল আদর্শ থেকে উৎপন্ন নয়।

নাগরী অক্ষরে লেখা পুঁথিখানিতে লিপিকাল নেই, কালজ্ঞাপক শ্লোকটিও নেই। তবে পুঁথির শেষে আটটি সংস্কৃত শ্লোক আছে। পুঁথির লিপিকর দুজন, প্রধান লিপিকর বৃন্দাবনের ধীরসমীরের অধিবাসী জগন্নাথ দাস (সম্ভবত বাঙালী)। তিনি গোপাল ভট্টের ভৃত্য বংশীদাসের জন্য পুঁথিখানি নকল করেছিলেন। অজ্ঞাতনামা দ্বিতীয় পুঁথিখানি লিপিকর অন্ত্যলীলার শেষ আটটি পরিচ্ছেদ লিখেছেলেন। তিনিও বংশীদাসের জন্য নকল করেছিলেন, লিপিকরের মন্তব্যে তা বলা হয়েছে—'শ্রীরাধারমণজি শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীজিকে ভৃত্য বংশীদাসকি অয়ং গ্রন্থঃ॥ শুভমস্তু'। পুঁথিখানিতে কিছু মূল্যবান পাঠান্তর আছে। একটির উল্লেখ করতে পারি। অধিকাংশ পুঁথি এবং ছাপা বইতে অন্ত্যলীলার শেষে দুটি পদে 'শ্রীগুরু'-র উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পুঁথিতে প্রথম পদের 'শ্রীগুরু'-র পাঠান্তর নেই; দ্বিতীয় পদের 'শ্রীগুরু শ্রীরঘুনাথ শ্রীজীবচরণ'-এর পাঠান্তর 'মিশ্র রঘুদাসে রঘু শ্রীজীবচরণ[৪]।'

৩. পাটনার পুঁথির অস্তিত্বের সংবাদ সুকুমার সেন প্রথম জানিয়েছিলেন। পুঁথিখানির পূর্ণতর বিবরণ না দেওয়ার জন্য সুকুমারবাবুকে দোষারোপ করা হয়েছে কিন্তু সন্ধান পেয়েও পুঁথিখানির পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করার প্রয়োজন কেউ বোধ করেন নি। কিছুকাল আগে সুকুমারবাবুর ব্যবস্থায় এবং পরলোকগত রঙ্গীনচন্দ্র হালদার মহাশয়ের সাহায্যে পাটনার পুঁথি দুখানির ছবি তুলতে পেরেছিলাম।

৪. 'শ্রীগুরু'-র পাঠান্তর বলেই মনে হওয়া স্বাভাবিক 'মিশ্র রঘু' কৃষ্ণদাস কবিরাজের গুরুর নাম, অন্তত কোনো একজন প্রাচীন লিপিকর তাই মনে করেছিলেন ; তা না হলে স্বরূপ, রূপ, সনাতন, রঘুনাথ এবং জীব গোস্বামীর সঙ্গে রঘু মিশ্রের নাম করার কোনো সার্থকতা থাকে না। পাঠান্তরটি অবশ্যই লিপিকরের। যে লিপিকর গোপাল ভট্টের ভৃত্য বংশীদাসের জন্য পুঁথি লিখেছেন তিনি সম্ভবত কৃষ্ণদাস কবিরাজের সমসাময়িক এবং কৃষ্ণদাসের গুরুর নাম জানা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু তিনি যদি প্রকৃতই কৃষ্ণদাসের গুরুর নাম জানতেন তাহলে দুই জায়গাতেই 'শ্রীগুরু' পাঠ তিনি পরিবর্তন করতেন, তিনি শুধু এক জায়গায় 'শ্রীগুরু'র পরিবর্তে 'মিশ্র রঘু' লিখেছেন। বঙ্গাক্ষরে লেখা পাটনার পুঁথিখানিতে 'শ্রীগুরু'-র পাঠান্তর 'শ্রীগোপাল'। তাই 'মিশ্র রঘু' এবং 'শ্রীগোপাল' পাঠান্তর লিপিকর বিকৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। কৃষ্ণদাস নিজেই রঘু মিশ্রকে নিজের গুরু বলে পরিচয় দিয়েছেন, মনে করার কারণ নেই। আদিলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে গদাধর শাখায় এক রঘু মিশ্রের নাম আছে তাঁকে কৃষ্ণদাস নিজের গুরু বলে সনাক্ত করেন নি। গুরুর নাম যদি কৃষ্ণদাস গোপন রাখতে না চাইতেন তাহলে গুরু সম্বন্ধে কেবল ইঙ্গিত না দিয়ে স্পষ্টভাবে তাঁর নাম প্রকাশ করতেন। গুরু সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস বলেছেন, 'যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাহার প্রকাশ॥' কিন্তু একজন প্রাচীন লিপিকর 'শ্রীগুরু' পাঠ পরিবর্তন করে 'মিশ্র রঘু' কেন লিখেছিলেন তার কারণ অজ্ঞাত।

লিপিকালহীন হলেও পাঠবিচার করে এই পুথিখানিকে আমার বিশেষ মূল্যবান মনে হয়েছে, সম্ভবত জ্ঞাত পুথিগুলির মধ্যে এইখানি সবচেয়ে মূল্যবান। গোপাল ভট্টের ভৃত্যের জন্য লেখা সেটাও পুথির প্রাচীনত্বের প্রমাণ।

বঙ্গাক্ষরে লেখা পুথিখানির লিপিকর অজ্ঞাত। তবে তোলাপাঠের বহু জায়গায় দ্বিতীয় একজনের হস্তাক্ষরে (বাঙ্গালা এবং নাগরী লিপিতে) ব্যাখ্যামূলক কিছু অতিরিক্ত পাঠ এবং প্রথম লিপিকরের ফেলে যাওয়া পাঠ সংযোজিত হয়েছে। পুথিতে কালজ্ঞাপক শ্লোকটি নেই, অন্ত্যলীলার পরে কোনো সংস্কৃত শ্লোকও নেই। কিন্তু মধ্যলীলার পরে ভণিতা এবং পুষ্পিকার মধ্যে কয়েকটি শ্লোক আছে। পুথির প্রতি পৃষ্ঠায় তিনগুচ্ছে তিনটি অথবা চারটি করে মোট দশটি অথবা বারোটি ছত্র। প্রথম ও দ্বিতীয় গুচ্ছের মধ্যে একছত্র পরিমাণ শূন্যস্থান। বৃন্দাবনের আরও বহু পুথির মত এই পুথিতেও তলায় বিন্দু দিয়ে 'ল'-কে 'ন' থেকে এবং তলায় হসন্ত চিহ্ন দিয়ে 'য়'-কে 'ল' থেকে পৃথক করা হয়েছে। পুথির শেষ ছত্রের 'তাং ৭ আশ্বিন ॥ ১০২০ ॥' অবশ্য লিপিকাল। অব্দের উল্লেখ না থাকায় লিপিকালের নির্দেশ স্পষ্ট নয়। সুকুমারবাবুর ধারণা '১০২০' বঙ্গাব্দ এবং সেই অনুসারে লিপিকাল ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দ। কাগজ, কালি এবং লিপি দেখে পুথিখানিকে অষ্টাদশ শতকের পূর্ববর্তী মনে করা শক্ত। '১০২০'-কে মল্লাব্দ ধরলে ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায় সেটাই সম্ভবত পুথির লিপিকাল। সন্ধান করলে এই হস্তাক্ষরের লিপিকালযুক্ত পুথি বৃন্দাবনে পাওয়া সম্ভব। এই পুথিখানি-ই গোপাল ভট্টের ভৃত্য বংশীদাসের জন্য লেখা হয়েছিলো মনে করে সুকুমারবাবু অনুমান করেছিলেন '১০২০' বঙ্গাব্দ এবং পুথিখানি 'চৈতন্যচরিতামৃতে'-এর প্রাচীনতম পুথি।

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে জানা গেলো যে পাটনার পুথি 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর প্রাচীনতম পুথি নয়। গোপাল ভট্ট গোস্বামীর ভৃত্য বংশীদাসের পঠনার্থে লেখা লিপিকালহীন পুথিখানি অবশ্যই মূল্যবান, কিন্তু এমন মূল্যবান নয় যে পাঠসমস্যার সমাধানে তার সাক্ষ্য চূড়ান্ত বলে গ্রাহ্য হতে পারে। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর প্রাচীনতম পুথির বয়স কত জানি না। যদিও পাঠবিচারে পুথির বয়সের চেয়ে পুথির বংশপরিচয় বেশি মূল্যবান তথাপি পুরণো পুথির পাঠের গুরুত্ব আছে। পুরণো পুথির পাঠ মিলিয়ে 'চৈতন্য-চরিতামৃত'-এর পুথির বংশলতা ঠিক করা হয়নি বলে আমরা জানি না কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থ কতগুলি শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছেছে এবং কোন্ লিপিকর তাঁর শ্রুত বা জ্ঞাত কোন্ ঘটনা বা ব্যক্তিকে এই মহাগ্রন্থের সঙ্গে যুক্ত করে অমরত্ব দিয়েছেন। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

যেসব ব্রজবাসী বৈষ্ণব 'গৌরাঙ্গের শেষলীলা বর্ণিবার তরে', কৃষ্ণদাস কবিরাজকে 'আজ্ঞা' করেছিলেন তাঁদের নামের তালিকা আছে আদিলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে। এই তালিকায় শিবানন্দ চক্রবর্তীর নাম কোনো কোনো পুথি ও ছাপা বইতে পাওয়া যায়। ছত্রগুলি এই—

'ক' পাঠ

আচার্য্য গোসাঞিের শিষ্য চক্রবর্তী শিবানন্দ।
নিরবধি তাঁর চিত্তে শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ ॥

'খ' পাঠ

আর এক মহাশয় চক্রবর্তী শিবানন্দ।
অহর্নিশ ভাবে যে চৈতন্যনিত্যানন্দ ॥
রাধাকৃষ্ণ লীলামৃত সদা করে গান।
মদনমোহন বিনা নাহি জানে আন ॥

'গ' পাঠ

আচার্য্য গোসাঞিের শিষ্য চক্রবর্তী শিবানন্দ।
নিরবধি তাঁর চিত্তে শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ ॥
রাধাকৃষ্ণ লীলামৃত সদা করে পান।
মদনমোহন বিনা নাহি জানে আন ॥

এই ছত্রগুলির সঙ্গে তুলনীয় আদিলীলার দ্বাদশ পরিচ্ছেদের দুটি ছত্র। এই ছত্রদুটিতে গদাধর পন্ডিতের উপশাখার এক শিবানন্দ চক্রবর্তীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

পাঠ

চক্রবর্তী শিবানন্দ শাখাতে উদ্দাম।
মদনগোপাল পায়ে যাহার বিশ্রাম ॥

পাঠান্তর

চক্রবর্তী শিবানন্দ সদা ব্রজবাসী।
মহাশাখা মধ্যে তিহো সুদৃঢ় বিশ্বাসী ॥

এক শাখার পুথিতে (বৃন্দাবন ৯৩, ৯৪, ১১৫, ৪১৬)[৫] শিবানন্দ চক্রবর্তীর নাম নেই, আদিলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে আজ্ঞাদাতাদের তালিকায়ও নেই, দ্বাদশ পরিচ্ছেদেও নেই। আর এক শাখায় (পাটনা ১) অষ্টম পরিচ্ছেদে শিবানন্দ প্রসঙ্গ আছে, দ্বাদশ পরিচ্ছেদে নেই। আরও একটি শাখায় (বৃন্দাবন ১) শিবানন্দ প্রসংগ অষ্টম পরিচ্ছেদেও আছে, দ্বাদশ পরিচ্ছেদেও আছে। বিভিন্ন পুথির পাঠ পরীক্ষা করে এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি বিচার করে দেখলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে শিবানন্দ প্রসঙ্গ অন্তত অষ্টম পরিচ্ছেদে লিপিকরের সংযোজন।

এক শাখার পুথিতে শিবানন্দ চক্রবর্তীর নাম না থাকাতেই প্রমাণ হয় শিবানন্দ প্রসঙ্গ প্রক্ষিপ্ত। লিপিকরের ভুলে মূলের পাঠ নকলে বাদ পড়েছে মনে করার কারণ নেই। লিপিকরের ভুলে এক জায়গায় নয়, দুই জায়গায় শিবানন্দের নাম বাদ পড়েছে সেকথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। প্রক্ষিপ্ত বলেই যে যে পুথিতে শিবানন্দের নাম আছে সেগুলিতেও অষ্টম ও দ্বাদশ পরিচ্ছেদে শিবানন্দ প্রসঙ্গের মধ্যে সঙ্গতি নেই। যে পুথির অষ্টম পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে শিবানন্দ আচার্য গোসাইর শিষ্য সেই পুথির দ্বাদশ পরিচ্ছেদে শিবানন্দকে গণ্য করা হয়েছে গদাধর পন্ডিতের শাখায়। প্রক্ষিপ্ত বলেই আজ্ঞাদাতাদের তালিকায় অন্য কোনো নামের পাঠান্তর নেই, একমাত্র শিবানন্দ প্রসঙ্গেরই পাঠান্তর আছে।[৬] একাধিক লিপিকরের হস্তক্ষেপে এবং একাধিক প্রক্ষেপের মিশ্রণে শিবানন্দ প্রসঙ্গের যে পাঠ এবং পাঠান্তর সৃষ্টি

৫. বৃন্দাবন রিসার্চ ইন্স্টিটিউটের বাঙ্গালা পুথির ক্রমিক সংখ্যা বোঝাতে বৃন্দাবন ১ বা বৃন্দাবন ১১৫ প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়েছে (দ্র. Tarapada Mukherjee, *A catalogue of the Bengali manus-cripts of the vrindaban Research Institute*, London; 1978)। পাটনা ১ এবং পাটনা ২ অর্থে পাটনার শ্রীচৈতন্যপুস্তকালয়ের যথাক্রমে বাঙ্গালা এবং নাগরী লিপির পুথি।

৬. লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে শিবানন্দ প্রসঙ্গ আছে আজ্ঞাদাতাদের নামের তালিকার শেষ দুটি ছত্রে।

হয়েছে তার ইতিহাস জটিল। এই জটিলতার গ্রন্থিমোচন অসম্ভব নয়, তবে এই আলোচনায় তা অপ্রাসঙ্গিক। কোনো এক লিপিকর হয়ত শুনেছিলেন বৃন্দাবনে শিবানন্দ চক্রবর্তী নামে এক প্রভাবশালী বৈষ্ণব ছিলেন। এই প্রভাবশালী বৈষ্ণব যে কৃষ্ণদাসের আজ্ঞাদাতাদের অন্যতম সে কথাটি জানাবার জন্য এই লিপিকর 'ক' পাঠ সৃষ্টি করেছিলেন। এই লিপিকর জানতেন শিবানন্দ আচার্য গোসাইর শিষ্য। দ্বিতীয় লিপিকরের হয়ত যদুনাথ দাসের 'শাখানির্ণয়ামৃত' পড়া ছিলো; তাঁর সংশোধনে 'ক' পাঠের 'আচার্য্য গোসাঞির শিষ্য' হয়েছে 'খ' পাঠের 'আর এক মহাশয়'। দ্বিতীয় লিপিকর শুধু সংশোধকই নন; সংযোজনাও তিনি করেছেন। তাঁর সংযোজনে শিবানন্দের পরিচয় দুটি পদে পরিব্যাপ্ত হয়েছে (পণ্ডিত হরিদাস বাদে শিবানন্দই একমাত্র আজ্ঞাদাতা যাঁর পরিচয় দিতে দুটি পদের প্রয়োজন হয়েছে)। তৃতীয় লিপিকরের হস্তক্ষেপে 'ক' এবং 'খ' পাঠের মিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে 'গ' পাঠ। শিবানন্দ প্রসঙ্গ যে লিপিকরের প্রক্ষেপ তার অভ্রান্ত প্রমাণ আছে যদুনাথ দাসের 'শাখানির্ণয়ামৃত' বইতে। যদুনাথ দাসের মতে শিবানন্দ কুমুদানন্দের নামান্তর।[৭] 'শাখানির্ণয়ামৃত'-এ আছে—শিবানন্দমহং বন্দে কুমুদানন্দনামকম্।

রসোজ্জ্বলযুতং স্বচ্ছং বৃন্দাকানন বাসিনম্॥

এই কুমুদানন্দের নাম আজ্ঞাদাতাদের তালিকায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ আগেই করেছেন (...'তাঁর শিষ্য গোবিন্দপূজক চৈতন্যদাস। কুমুদানন্দ চক্রবর্তী প্রেমী কৃষ্ণদাস॥')। অধিকাংশ ছাপা বইতে এবং কোনো কোনো পুথিতেও কুমুদানন্দের নাম মুকুন্দানন্দ, যদিও বৃন্দাবনের অধিকাংশ পুথিতে কুমুদানন্দ নামই পাওয়া যায়। সম্ভবত কুমুদানন্দ। মুকুন্দানন্দ নাম লিপিকরদের বিভ্রান্ত করেছিলো। কিম্বা তাঁরা জানতেন না কুমুদানন্দ শিবানন্দের নামান্তর। তাই আজ্ঞাদাতাদের নামের তালিকার শেষে শিবানন্দের নাম (প্রথমে একটি পদে, পরে দুটি পদে) যুক্ত করে দিয়ে লিপিকরেরা কৃষ্ণদাসের ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য, কৃষ্ণদাসের ত্রুটি ছিলো না।

প্রক্ষেপের আর একটি উদাহরণ দিই। আদিলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন, 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনায় 'বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত অন্তরে। মদনগোপালে গেলাও আজ্ঞা মাগিবারে।' মদনগোপাল মন্দিরে কি ঘটেছিলো তাঁর বিবরণ দুই শাখার পুথিতে দুই ভাবে পাই।

'ক' পাঠ	'খ' পাঠ
প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞা মাগিল।	প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞা মাগিল।
গোসাঞি দাস মোর গলে মালা আনি দিল॥	প্রভুর কণ্ঠ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল॥
	সর্ব বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি দিল।
	গোসাঞিদাস আনি মালা মোর গলে দিল॥

প্রায় সব ছাপা বইতে 'খ' পাঠই পাওয়া যায়, যদিও বৃন্দাবনে লেখা অধিকাংশ পুথিতে 'ক' পাঠই আছে। পুথির বংশলতা জানা নেই বলে 'ক' এবং 'খ' পাঠের মধ্যে কোনটি মূল কোনটি প্রক্ষেপ তা নির্ধারণের উপায় সাধারণ বুদ্ধি। সাধারণ বুদ্ধিতে বলে 'ক' পাঠই মূল পাঠ (যদিও সাধারণ বুদ্ধি পাঠের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচারের উপযুক্ত উপায় নয়);

৭. দ্র. হরিদাস দাস, 'মধ্যযুগীয় গৌড়ীয় সাহিত্যের ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক অভিধান', নবদ্বীপ, ১৯৫১, ১৯৮।

কোনো উৎসাহী লিপিকর মূলের ছত্রদুটির সঙ্গে অতিরিক্ত দুটি ছত্র যোজনা করে কৃষ্ণদাস কবিরাজের গৌরব বাড়িয়েছেন। 'খ' পাঠে যে অলৌকিকত্ব আছে কৃষ্ণদাসের নিজের প্রসঙ্গে সে রকম অলৌকিকত্বের অবতারণা সম্ভব নয় বলে মনে করি। 'ক' পাঠে ভক্ত-ভগবানের মধ্যে অনুভবে বার্তা বিনিময় হয়েছে। প্রসাদী মালা পেয়ে কৃষ্ণদাস অনুভবে জেনেছেন সেটা মদনগোপালের আজ্ঞামালা। লিপিকর অনুভব বোঝেন না, প্রত্যক্ষ প্রমাণ বোঝেন। তিনি প্রভুকণ্ঠের মালা খসিয়ে, বৈষ্ণবদের হরিধ্বনির মধ্য দিয়ে সাধারণের সামনে প্রমাণ করতে চান কৃষ্ণদাস প্রভুর আজ্ঞা পেয়েছেন। যা একান্তই ব্যক্তিগত লিপিকরের প্রক্ষেপে তা হয়েছে গোষ্ঠীগত। লিপিকর সম্ভবত 'ভক্তিরত্নাকর' পড়েছিলেন। তাতে আছে—

এত কহিতেই গোবিন্দের কণ্ঠ হৈতে।
ছিঁড়িয়া পড়িল মালা শ্রীনিবাসে দিতে ॥
আস্তেব্যস্তে পূজারী শ্রীমালা-যত্নে লৈয়া।
শ্রীনিবাসে দিলেন প্রেমাশ্রুযুক্ত হৈয়া ॥

সুকুমারবাবুর ধারণা, 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর পাঠ 'যথাসম্ভব অবিকৃতভাবে এবং প্রক্ষেপহীন হইয়া চলিয়া আসিয়াছে'। অন্য বইয়ের তুলনায় হয়ত কম, কিন্তু পাঠবিকৃতি এবং প্রক্ষেপ 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ কম নয়। আরও একটি উদাহরণ দিচ্ছি। গোপাল ভট্ট সম্বন্ধে সুকুমারবাবু বলেছেন, 'ইনি চৈতন্যের গোচরে আসিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তাহা হইলে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যবৃক্ষের শাখায় তাঁহার নাম করিতেন'।[৮] কৃষ্ণদাস হয়ত চৈতন্যবৃক্ষ শাখায় গোপাল ভট্টের নাম করেন নি, কিন্তু সুকুমারবাবু যে সংস্করণটির প্রশংসা করেছেন সেই অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর সংস্করণে চৈতন্যবৃক্ষশাখায় আছে—

শ্রীগোপালভট্ট এক শাখা সর্বোত্তম।
রূপসনাতন সঙ্গে যাঁর প্রেম আলাপন ॥

অনেক পুথিতে এই ছত্রদুটি নেই, সম্ভবত মূলেও ছিলো না। কিন্তু লিপিকরদের সকলেই কি এমন সাধু পুরুষ যে সুযোগ পেয়েও গুরু বা পরমগুরু বা পরাৎপর গুরু বা পরমেষ্ঠী গুরুর নাম 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর নামাবলীর সঙ্গে যুক্ত করে দেবেন না! আবেগে উদ্বেল হয়েও কোনো কোনো লিপিকর মূলের সঙ্গে নিজের রচনা মিশিয়ে দিয়েছেন। যেমন হয়েছে মধ্যলীলার দ্বাদশ পরিচ্ছেদে। প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে চৈতন্য দেখা করতে চান না। নিত্যানন্দ অনুরোধ করতে এসে বললেন, 'তোমা না মিলিলে রাজা চাহে যোগী হৈতে'। কৃষ্ণদাস কবিরাজ হয়ত এইটুকু বলে থেমেছিলেন। কিন্তু লিপিকর কৃষ্ণদাসকে থামতে দেন নি, তিনি যোগ করলেন—

কানে মুদ্রা লৈঞা মুঞি হইব ভিখারী।
রাজ্যভোগ নহে চিত্তে বিনা গৌরহরি ॥
দেখিব সে মুখচন্দ্র নয়ন ভরিয়া।
ধরিব সে পাদপদ্ম হৃদয়ে তুলিয়া ॥

---

৮. সুকুমারবাবু মত পরিবর্তন করে লিখেছেন, 'গোপাল ভট্ট চৈতন্যের গোচরে অবশ্যই আসিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যবৃক্ষের শাখাবর্ণনায় তাঁহার নাম করিয়াছেন।' (বা.সা.ই.,১/১, ১৯৭৮, ৩১৫-১৬)।

সৌভাগ্যবশত এই পাঠ এখন পর্যন্ত ছাপা বইতে ঠাঁই পায় নি। তথাপি এই পাঠ তাঁদের একজনেরই সৃষ্টি যাঁদের হাত দিয়ে 'চৈতন্যচরিতামৃত' আমাদের কাছে পে'ছেছে।

৪

কালজ্ঞাপক শ্লোকটিকে নিরাসক্তভাবে দেখতে হলে মনে রাখা দরকার যে, 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর কোনো privileged পুথি নেই আর এই গ্রন্থ প্রক্ষেপহীন নয়। আরও মনে রাখা দরকার যে, সংস্কৃত শ্লোকে লিপিকালনির্দেশ দূরে থাক, রচনাকালের নির্দেশও দ্বিতীয় বাঙ্গালা গ্রন্থে পাওয়া যায় নি এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজই একমাত্র কবি (ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের কথা মনে রেখেও) যিনি সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা এই দুই ভাষাতে উল্লেখযোগ্য বই লিখেছেন। কালজ্ঞাপক শ্লোকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা—এটি 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর রচনাকালজ্ঞাপক বা কোনো একখানি পুথির লিপিকালজ্ঞাপক। এ প্রশ্নের দুটি প্রচলিত উত্তর আছে—সব পুথিতে নেই বলে শ্লোকটি লিপিকালজ্ঞাপক এবং কোনো কোনো পুথিতে আছে বলে শ্লোকটি রচনাকালজ্ঞাপক। দুটি উত্তরের একটি অবশ্যই ঠিক ; কিন্তু উত্তর দুটি থেকে আসল সমস্যা সম্বন্ধে ধারণা হয় না। মুদ্রিত সংস্করণের সম্পাদকেরাও সমস্যাটি সম্পর্কে সচেতন নন। সেই কারণে সমস্যাটি এখানে উত্থাপন করা প্রয়োজন।

'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর পুথিতে অন্ত্যলীলার শেষে একটি শ্লোকমালা আছে। শ্লোকের সংখ্যা সব পুথিতে এক নয়। শ্লোকগুলিও সব পুথিতে এক নয়। তবে সব পুথিতেই শ্লোক আছে, যে পুথিতে অন্ত্যলীলার শেষে নেই তাতে আদি বা মধ্যলীলার শেষে আছে। আদি, মধ্য বা অন্ত্যলীলার শেষে শ্লোকমালার একটি শ্লোকও নেই এমন পুথি দেখি নি (এমন পুথি থাকলে তার খবর জানতে কৌতূহলী আছি)। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর শ্লোকগুলির আলাদা পুথি (এবং নীলাম্বর দাস কৃত ব'গানুবাদ 'সংগৃহীত সুধাসার') অনেক পাওয়া গেছে। সেগুলিতেও শ্লোকমালার কোনো কোনো শ্লোক পাওয়া যায়। সুতরাং পুথির সাক্ষ্য মানলে স্বীকার করতে হয় 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর মূল পুথিতে অন্ত্যলীলার শেষে শ্লোকমালা ছিলো। কিন্তু কটি শ্লোক ছিলো, কি কি শ্লোক ছিলো, কোন্ শ্লোকের পর কোন্ শ্লোক ছিলো পুথি দেখে তা জানবার উপায় নেই। যে শ্লোকমালা পুথিতে পাওয়া যাচ্ছে তা লিপিকরদের সম্পাদিত। তাঁরা নোতুন শ্লোক যোজনা করেছেন, মূলের শ্লোক বাদ দিয়ে নিজেদের প্রিয় শ্লোক জুড়ে দিয়েছেন, শ্লোকের ক্রমভঙ্গ করেছেন; এক লীলা থেকে শ্লোক আর এক লীলায় স্থানান্তরিত করেছেন। লিপিকরদের হস্তক্ষেপের ফলেই শ্লোকমালায় শ্লোকের সংখ্যা অনির্দিষ্ট এবং শ্লোকগুলিও এক এক পুথিতে এক এক রকম। পুথির শেষ পাতায় কতখানি সাদা পাতা অবশিষ্ট ছিলো সেই অনুসারে পুথিতে পুথিতে শ্লোক এবং শ্লোকের সংখ্যা নির্ধারিত হয়েছে। এতেই প্রমাণ হয়; শ্লোকমালাকে লিপিকরেরা মূল পাঠের অংশ বলে মনে করেন নি।

কালজ্ঞাপক শ্লোকটি এই শ্লোকমালার অন্যতম এবং সর্বশেষ শ্লোক। এই শ্লোকটির সঙ্গে শ্লোকমালার সম্পর্ক জানলে সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু সে সম্পর্ক নিশ্চিতভাবে জানার উপায় নেই। অনেক পুথিতে শ্লোকমালা আছে, কালজ্ঞাপক শ্লোকটি নেই ; কিন্তু কালজ্ঞাপক শ্লোকটি আছে শ্লোকমালার একটি শ্লোকও নেই এমন পুথি দেখি নি। এ থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, কালজ্ঞাপক শ্লোকটি মূল শ্লোকমালার অংশ তবে কোনো কোনো পুথির শেষ পাতায় সাদা কাগজের অভাবে কোনো কোনো শ্লোকের সঙ্গে শ্লোকমালার

শেষ শ্লোকটি বাদ পড়েছে। এ অনুমানের একটি বড়ো বাধা শ্লোকমালায় শ্লোকসংখ্যার অনির্দিষ্টতা। শ্লোকাবাদ পড়েছে কি পড়ে নি সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে গেলে মূল শ্লোকমালার শ্লোকসংখ্যা জানা চাই। তা জানা নেই বলে কালজ্ঞাপক শ্লোকটিকে শ্লোকমালার অচ্ছেদ্য অংশ বলতে পারি না। যে সব লিপিকর শ্লোকগুলিকে ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে সাজিয়েছেন তাঁরাও কালজ্ঞাপক শ্লোকটিকে (ক্রমিকসংখ্যা না দিয়ে) শ্লোকমালার মধ্যে গণ্য করেন নি। তার একটি কারণ হয়ত কালজ্ঞাপক শ্লোকটিকে তাঁরা বন্দনা বা প্রশস্তি শ্লোকের সঙ্গে এক করতে চান নি। কিন্তু সেটাই একমাত্র কারণ নাও হতে পারে। কোনো একজন লিপিকর হয়ত তাঁর পুথির লিপিকাল জানিয়েছেন কালজ্ঞাপক শ্লোকটিতে। এই শ্লোকটি যে 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর অংশ নয়, একখানি পুথির লিপিকাল সে কথাটি জানাবার জন্যই লিপিকর কালজ্ঞাপক শ্লোকটিকে মূল শ্লোকমালা থেকে পৃথক রেখেছিলেন। পরবর্তী লিপিকরেরা সে পার্থক্য লুপ্ত হতে দেন নি, এবং সেই কারণেই শ্লোকমালায় শ্লোকের ক্রমভঙ্গ হলেও কালজ্ঞাপক শ্লোকটি সব পুথির সর্বশেষ শ্লোক। এই দুটি কারণের কোনটি যথার্থ সে সম্বন্ধে প্রাপ্ত পুথিতে কোনো ইঙ্গিত নেই।

৫

কালজ্ঞাপক শ্লোকটি ছাড়াও 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর রচনাকাল নির্ণয়ের অন্য উপায় আছে। চৈতন্যের তিরোধানে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রথম যুগের সমাপ্তি এবং এই ধর্মের শেষ শাস্ত্রকার জীব গোস্বামীর তিরোধানে দ্বিতীয় যুগের সমাপ্তি। 'চৈতন্যচরিতামৃত' লেখা হয়েছিলো তৃতীয় যুগে অর্থাৎ জীব গোস্বামীর পরবর্তী যুগে এবং তার প্রমাণ 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর মধ্যে আছে।

'ছয় গোসাঞি'-র সর্বকনিষ্ঠ জীব গোস্বামীর তিরোধানের আগেই আর পাঁচ গোসাইর এবং ব্রজবাসী গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের তিরোধান ঘটেছিলো। সর্বপ্রথম সনাতনের (১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে) পরে রূপের (১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে) তিরোধানের [৯] পর রঘুনাথ দাসের তিরোধান। ১৫৮৪ খ্রীষ্টব্দে [১০] লেখা একখানি দানপত্র পাওয়া গেছে তাতে 'অন্তিম সময়ে' 'অন্ধ' রঘুনাথ দাস তাঁর সর্বস্ব 'জীবারাধ্যপদাম্বুজেষু' অর্পণ করেছিলেন। অন্ধ এবং জরাতুর রঘুনাথ দাসের হয়ে দানপত্রখানি লিখেছিলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ; সাক্ষী ছিলেন ভূগর্ভ, অনন্ত আচার্য, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল দাস, কৃষ্ণ পণ্ডিত এবং ত্রিভঙ্গী পাণ্ডে। দানপত্রের 'অন্তিম সময়' যদি মৃত্যুকাল হয় তাহলে ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে রঘুনাথ দাস দেহরক্ষা করেছিলেন। (দানপত্রখানি বিস্তৃত বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট ২ দ্রষ্টব্য)।

জীব গোস্বামীর 'সঙ্কল্পপত্রী' ('উইল') সম্প্রতি আবিষ্কৃত এবং প্রকাশিত হয়েছে।[১১]

---

৯. শ্রীযুক্ত অসীমকুমার রায়ের সৌজন্যে সম্প্রতি জানতে পেরেছি যে জয়পুরে রক্ষিত একখানি পুথিতে সনাতন এবং রূপের তিরোধান কাল যথাক্রমে আষাঢ় পূর্ণিমা সম্বৎ ১৬১৫ (=১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দ) এবং শ্রাবণ শুক্লা দ্বাদশী সম্বৎ ১৬২৫ (=১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দ) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সনাতন ও রূপের তিরোধানকালের এই তিথি সুকুমারবাবুও পেয়েছিলেন তবে সেখানে সালের উল্লেখ ছিলো না (দ্র. বা.সা.ই., ১/১, ১৯৭৮, ৩১৭)।

১০. 'সংবৎ সোমসমুদ্রষোড়শমিতে'অর্থাৎ (সোম=১, সমুদ্র=৪, ষোড়শ=১৬) সম্বৎ ১৬৪১= ১৫৮৪ খ্রীঃ।

১১. Tarapada Mukherjee and J. C. Wright, 'An early testamentary document in Sanskrit', *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, XLII, 2, 1979, 297-320.

'সঙ্কল্পপত্রী'-র ভাষা সংস্কৃত গদ্য, লিপি নাগরী (একটি বাক্য গৌড়াক্ষরে)। ১৬০৬ খ্রীস্টাব্দে জীব গোস্বামী নিজের হাতে 'সঙ্কল্পপত্রী'খানি লিখেছিলেন এবং দু বছর পরে ১৬০৮ খ্রীস্টাব্দে জীব গোস্বামীর নির্দেশে গদাধর ভট্টের হস্তে 'সঙ্কল্পপত্রী'-তে একটি অতিরিক্ত অনুচ্ছেদ ('কডিসিল') যুক্ত হয়েছিলো। জীব গোস্বামীর মৃত্যুর পর রাধাদামোদরের সেবাধিকার, বিষয় সম্পত্তি এবং পুঁথিপত্রের উত্তরাধিকার ঠিক করা 'সঙ্কল্পপত্রী'-র বিষয়। এই 'সঙ্কল্পপত্রী'-তে আরও কয়েকজন সাক্ষীর সঙ্গে নাগরীতে কৃষ্ণদাস কবিরাজের এবং বঙ্গাক্ষরে হরিদাস গোস্বামীর সাক্ষর আছে। 'সঙ্কল্পপত্রী'-র আবিষ্কারে নিংসংশয় হওয়া যাচ্ছে যে, ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত জীব গোস্বামী জীবিত ছিলেন এবং সম্ভবত এই বছরই তাঁর তিরোধান্ ঘটে। গদাধর ভট্ট 'সঙ্কল্পপত্রী'-র শেষ অনুচ্ছেদটির লিপিকর বলে অনুমান করতে পারি মরণাপন্ন জীব গোস্বামী তখন নিজের হাতে লিখতে সক্ষম ছিলেন না।

১৫৮৪-১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রঘুনাথ দাস, গোপাল ভট্ট, ভুগর্ভ গোস্বামী ('ভক্তিরত্নাকর' অনুসারে ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দের অনেক আগেই রঘুনাথ ভট্টের তিরোধান হয়েছিলো, পরিশিষ্ট ২ দ্রষ্টব্য) এবং সকলের শেষে জীব গোস্বামীর তিরোধানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দ্বিতীয় যুগ শেষ হয়। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর রচনা এর অব্যবহিত পরে।

যে সব 'বৈষ্ণবের আজ্ঞা'য় 'চৈতন্যচরিতামৃত' লেখা হয়েছিলো তাঁদের নাম এবং পরিচয় আছে আদিলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে। আজ্ঞাদাতাদের নাম, তাঁদের গুরু বা পরমগুরুর নাম (যে নামগুলির উল্লেখ করা হয়েছে আজ্ঞাদাতাদের পরিচয় দেওয়ার জন্য) এবং আজ্ঞাদাতাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় (কৃষ্ণদাস কবিরাজের দেওয়া) এখানে পৃথক্ করে দেখানো হচ্ছে। তাতে বোঝা সহজ হবে কারা আজ্ঞাদাতা এবং তাঁদের গুরু বা পরম গুরু কারা।[১২]

(গোবিন্দের 'সেবার অধ্যক্ষ') 'পণ্ডিত হরিদাস' (অনন্ত আচার্যের শিষ্য, গদাধর পণ্ডিতের প্রশিষ্য) ('গোবিন্দের প্রিয় সেবক') 'গোবিন্দ গোসাঞি'[১৩] ('কাশীশ্বর গোসাঞির শিষ্য')

'যাদবাচার্য গোসাঞি'[১৪] ('শ্রীরূপের সঙ্গী' কাশীশ্বর গোস্বামীর শিষ্য)

('গোবিন্দপূজক') 'চৈতন্যদাস'[১৫] (ভুগর্ভ গোস্বামীর শিষ্য, গদাধর পণ্ডিতের প্রশিষ্য)

'কুমুদানন্দ চক্রবর্তী' (ভুগর্ভ গোস্বামীর শিষ্য, গদাধর পণ্ডিতের প্রশিষ্য)

'প্রেমী কৃষ্ণদাস' (ভুগর্ভ গোস্বামীর শিষ্য, গদাধর পণ্ডিতের প্রশিষ্য)

---

১২. সুকুমারবাবু বলেছেন, 'যাঁহাদের অনুরোধে কৃষ্ণদাস চৈতন্যচরিত বর্ণনায় হাত দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে গদাধর পণ্ডিতের দুই শিষ্য ভূগর্ভ গোস্বামী ও শিবানন্দ চক্রবর্তী এবং চৈতন্যসেবক কাশীশ্বরের শিষ্য গোবিন্দও ছিলেন।' আজ্ঞাদাতাদের মধ্যে গোবিন্দ ছিলেন, শিবানন্দ চক্রবর্তী ছিলেন কিনা থাকলেও কি নামে ছিলেন তাতে সংশয় আছে। তবে ভূগর্ভ গোস্বামী অবশ্যই ছিলেন না। ভুগর্ভের নাম তালিকায় আছে, তবে আজ্ঞাদাতা হিসাবে নয়, আজ্ঞাদাতাদের পরিচয়সূত্রে, যেমন আছে গদাধর পণ্ডিত, অনন্ত আচার্য, শ্রীরূপ, কাশীশ্বর গোসাইর নাম।

১৩. কাশীশ্বর গোসাঞির শিষ্য গোবিন্দ গোসাঞি।
গোবিন্দের প্রিয় সেবক তাঁর সম নাঞি॥

১৪. যাদবাচার্য গোসাঞি শ্রীরূপের সঙ্গী।
চৈতন্যচরিতে তিহোঁ অতি বড় রঙ্গী॥

১৫. চৈতন্যদাস, কুমুদানন্দ এবং প্রেমী কৃষ্ণদাসের নাম যেভাবে করা হয়েছে তাতে এঁদের তিনজনকেই ভূগর্ভের শিষ্য এবং পণ্ডিত গোসাইর প্রশিষ্য মনে করতে হয়।

পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য ভুগর্ভ গোসাঞি।
গৌরকথা বিনা তাঁর মুখে অন্য নাঞি॥
তাঁর শিষ্য [১] গোবিন্দ পূজক চৈতন্যদাস।
[২] কুমুদানন্দ চক্রবর্তী [৩] প্রেমী কৃষ্ণদাস॥

আজ্ঞাদাতাদের মধ্যে যাদব আচার্য এবং গোবিন্দ গোসাঞি বোধ হয় প্রাচীনতম। এঁরা দুজন রূপ গোস্বামীর সঙ্গে মথুরার বিট্ঠলেশ্বরের বাড়িতে গোপাল দর্শনে গিয়েছিলেন ('চৈতন্যচরিতামৃত', ২/১৮), শ্রীনিবাস গোস্বামীগ্রন্থ নিয়ে যখন গৌড়ে রওনা হন তখনও তাঁরা উপস্থিত ছিলেন ('ভক্তিরত্নাকর', ৬/৪৮৬) ; আবার বীরচন্দ্রের বৃন্দাবন আগমনের সময়ও তাঁরা উপস্থিত ছিলেন ('ভক্তিরত্নাকর' ; ১৩/১০২১)। প্রেমী কৃষ্ণদাস সম্ভবত একমাত্র অবাঙালী আজ্ঞাদাতা। চৈতন্যচরিতামৃত'-এর মধ্যলীলার অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে চৈতন্যের এক রাজপুত ভক্তের কথা আছে। তাঁর নাম কৃষ্ণদাস ; এক জায়গায় তাঁকে প্রেমী কৃষ্ণদাসও বলা হয়েছে। 'সাধনদীপিকা'য় রাধাকৃষ্ণ দাস বলেছেন, তাঁর পরম গুরু অনন্ত আচার্যের নামান্তর ছিলো প্রেমী কৃষ্ণদাস।[১৬] আজ্ঞাদাতাদের তালিকায় যে প্রেমী কৃষ্ণদাসের নাম আছে তিনি অবশ্যই অনন্ত আচার্য নন। চৈতন্য দাস 'গীত গোবিন্দ' এবং 'কৃষ্ণকর্ণামৃত'-র টীকাকার পূজারী গোস্বামীর নামান্তর মনে করা হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন ইনি 'গোবিন্দপূজক' ; 'ভক্তিরত্নাকর'-এ কিন্তু মদনমোহনের পূজককে পূজারী গোস্বামী বলা হয়েছে। গৌড়ে প্রত্যাবর্তনের আগে মদনমোহন মন্দিরে গেলে শ্রীনিবাসকে 'শ্রীমালা প্রসাদ দিল পূজারী গোস্বামী' ('ভক্তিরত্নাকর', ৬/৪৭০)। শিবানন্দের নাম যে আজ্ঞাদাতাদের তালিকায় প্রক্ষিপ্ত সে কথা আগে বলা হয়েছে। শিবানন্দের নামান্তর যদি কুমুদানন্দ হয় তাহলে কৃষ্ণদাস কবিরাজ শিবানন্দকে কুমুদানন্দ নামেই জানতেন এবং জানতেন কুমুদানন্দের গুরু ভুগর্ভ, পরমগুরু গদাধর পণ্ডিত। লিপিকরদের প্রক্ষেপে কুমুদানন্দ/শিবানন্দ প্রসঙ্গ জটিল হয়েছে এবং তার চেয়ে জটিল হয়েছে কুমুদানন্দ/শিবানন্দের গুরু/পরমগুরুকে সনাক্ত করা। তবে এ আলোচনায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের নির্দেশই জেনে নেওয়া হয়েছে। এবং মনে করা হয়েছে শিবানন্দ প্রসঙ্গ প্রক্ষিপ্ত তাই আজ্ঞাদাতাদের সংখ্যা সাত নয়, ছয়।

তালিকায় ছয়জনের নাম আর পরিচয় থাকলেও 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনার মূলে প্রেরণাদাতা গোবিন্দের 'সেবার অধ্যক্ষ' পণ্ডিত হরিদাস। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ২৭টি ছত্রে (১/৮, ১১৫-১৪২ ছত্র) হরিদাসের চরিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন এবং তাঁর গুণাবলী ব্যাখ্যা করতে ভাগবত থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর ভণিতায় যে সামান্য কয়েকজনের নাম কৃষ্ণদাস করেছেন হরিদাস তাঁদের একজন (মধ্যলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ভণিতা)। হরিদাস 'ছয় গোসাঞি'-র একজন নন, চৈতন্যের প্রত্যক্ষদর্শী নন, ভূগর্ভ-লোকনাথের মত প্রবীণ ব্রজবাসী বৈষ্ণবও নন ; তথাপি কৃষ্ণদাস যেভাবে হরিদাসের মহিমা কীর্তন করেছেন তাতেই বোঝা যায় 'চৈতন্যচরিতামৃত'-র রচনাকালে বৃন্দাবনের বৈষ্ণব সমাজে হরিদাসের প্রতিপত্তি কি রকম ছিলো, আর বোঝা যায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক কি রকম ছিলো। এই হরিদাসকে ইতিহাসের মধ্যে ধরাছোঁয়া যায়। হরিদাসের কিছু কাগজপত্র জয়পুর গোবিন্দ মন্দিরে আছে[১৭] (আরও কিছু নানা জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে আছে)। এই সব কাগজপত্রের কথা বাদ দিলেও কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিজে হরিদাস সম্বন্ধে যা বলেছেন তা

১৬. 'শ্রীপ্রেমিকৃষ্ণদাসাখ্যমনন্তং পরমং গুরুং,' হরিদাস দাস (সম্পাদিত) শ্রীশ্রীমদ্রাধাকৃষ্ণ গোস্বামীপাদকৃতা 'শ্রীসাধনদীপিকা,' নবদ্বীপ, শ্রীচৈতন্যাব্দা ৪৬০, ২১৬।

১৭. জয়পুর গোবিন্দ মন্দিরের বর্তমান সেবাধ্যক্ষ পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্নকুমার গোস্বামীর সৌজন্যে এই কাগজপত্রগুলি দেখার সুযোগ হয়েছিলো।

তলিয়ে দেখিনি বলেই 'চৈতন্যচরিতামৃত'-র রচনাকাল নিয়ে এখনও অনিশ্চয়তা আছে। মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ভণিতায় কৃষ্ণদাস বলেছেন—

পাঞা যাঁর আজ্ঞাধন ব্রজের বৈষ্ণবগণ
বন্দো তার মুখ্য হরিদাস।
চৈতন্যবিলাসসিন্ধু কল্লোলের এক বিন্দু
তার কণা কহে কৃষ্ণদাস ॥

এই ভণিতার অর্থ, 'ব্রজের বৈষ্ণবগণের মুখ্য অর্থাৎ ব্রজের গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের নেতা হরিদাসকে আমি বন্দনা করি। তাঁর আজ্ঞাধন পেয়ে চৈতন্যবিলাসসিন্ধুর কল্লোলের একটি বিন্দুর একটি কণা কৃষ্ণদাস বর্ণনা করছে।' এই ভণিতার আর যে অর্থই করি না কেন, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই যে 'চৈতন্যচরিতামৃত'-র রচনাকালে ব্রজবাসী গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন গোবিন্দ মন্দিরের অধিকারী হরিদাস গোস্বামী। এবং এবিষয়েও কিছুমাত্র সন্দেহ নেই যে, 'ছয় গোসাঞি'-র একজনেরও জীবিতকালে বা লোকনাথ, ভূগর্ভ, কাশীশ্বর বা অনন্ত আচার্যের (হরিদাসের গুরু) জীবিতকালে হরিদাসকে ব্রজের বৈষ্ণবগণের 'মুখ্য' বলে বন্দনা করা কৃষ্ণদাস কবিরাজের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং স্বীকার করতেই হবে যে, হরিদাস গোস্বামী যখন কৃষ্ণদাস কবিরাজকে 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনা করতে 'আজ্ঞা 'কৈল' তখন 'ছয় গোসাঞি' লোকান্তরিত হয়েছেন, লোকনাথ, ভূগর্ভ, কাশীশ্বর, অনন্ত আচার্যও দেহরক্ষা করেছেন। বৃন্দাবনে শাস্ত্রকারের যুগ তখন শেষ হয়েছে, চৈতন্যের প্রত্যক্ষদর্শীর যুগও শেষ হয়েছে এবং তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছেন দেবালয়ের অধিকারীরা। তাঁদের প্রথম এবং প্রধান পণ্ডিত হরিদাস গোস্বামী। তিনি 'সভার সম্মানকর্তা করেন সভার হিত'; তিনি 'বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী' এবং 'কায়মনোবাক্যে' তিনি 'বৈষ্ণব সন্তোষ' করেন; তাঁর 'যশগুণ সর্বজগতে প্রকাশ'। এক কথায়, হরিদাস গোস্বামী ব্রজের গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের নেতা এবং অভিভাবক। এই রকম নেতা এবং অভিভাবক ছিলেন রূপ গোস্বামী, তাঁর তিরোধানে জীব গোস্বামী, জীবের তিরোধানে এখন অর্থাৎ 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনাকালে নেতা এবং অভিভাবক হরিদাস গোস্বামী।

হরিদাস গোস্বামীকে তাঁর শিষ্য রাধাকৃষ্ণ দাস 'বারেন্দ্রবিপ্রাশ্বয়ভূষণং' বলে বন্দনা করেছেন। গুরুর গৌরব বাড়াবার জন্য রাধাকৃষ্ণ দাস বলেছেন, রূপ গোস্বামী নিজে অনন্ত আচার্যকে এবং পরে হরিদাসকে গোবিন্দ মন্দিরের অধিকারী পদে নিযুক্ত করেছিলেন। একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়; হরিদাস এমন কি তাঁর গুরু অনন্ত আচার্য গোবিন্দ মন্দিরের অধিকারী হওয়ার আগে রূপ গোস্বামীর তিরোধান হয়েছিলো। গোবিন্দ মন্দিরের প্রথম অধিকারী কাশীশ্বর। রূপের চিঠিতে গোবিন্দের প্রকট হওয়ার সংবাদ পেয়ে মহাপ্রভু পুরী থেকে কাশীশ্বরকে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছিলেন। মহাপ্রভুর নির্দেশে কাশীশ্বর গোবিন্দের সেবার ভার নিয়ে বৃন্দাবন আসেন, সঙ্গে নিয়ে আসেন মহাপ্রভুর স্বরূপ বিগ্রহ—'শ্রীগোবিন্দ দক্ষিণে প্রভুকে বসাইয়া/করয়ে অদ্ভুত সেবা প্রেমাবিষ্ট হইয়া' ('ভক্তিরত্নাকর', ২/৯১)। কাশীশ্বরের তিরোধানের পর 'চৈতন্যপার্ষদ' এবং 'মহাবিদ্যাবান' শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত গোবিন্দের অধিকারী হন—'কাশীশ্বর গোসাঞির হইলে সংগোপন/শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত সেবে গোবিন্দ-চরণ ॥' ('নরোত্তমবিলাস', ২/৫০)। শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিতের পর গোবিন্দের অধিকারী হন হরিদাস গোস্বামীর গুরু অনন্ত আচার্য ('ভক্তিরত্নাকর', ১৩/১০২০)। রঘুনাথ দাসের দানপত্রে (১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দ) সাক্ষীদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত এবং অনন্ত আচার্য দুজনেরই নাম আছে। নামদুটি যদি নকলকারের যোজনা না হয় তাহলে বুঝতে হবে

বৃন্দাবনের বিশিষ্ট বৈষ্ণব হিসেবেই অনন্ত আচার্য সাক্ষীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। বীরচন্দ্রের বৃন্দাবন আগমনকালে গোবিন্দ মন্দিরের অধিকারী অনন্ত আচার্যের শিষ্য হরিদাস গোস্বামী। বীরচন্দ্র কবে বৃন্দাবনে এসেছিলেন জানা যায় না, তবে রাধাকুণ্ডে রঘুনাথ দাসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের উল্লেখ না থাকায় বুঝতে হবে ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দে রঘুনাথ দাসের মৃত্যুর পর তিনি বৃন্দাবনে এসেছিলেন। বীরচন্দ্রের আগে শ্রীনিবাস, রামচন্দ্র কবিরাজ, জাহ্নবা দেবী সকলেই রঘুনাথ দাসের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। জাহ্নবা দেবী যখন এসেছিলেন তখন রঘুনাথ দাসের 'চলিবার সাধ্য নাই' ('ভক্তিরত্নাকর', ১১/৬৬৭)। ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দের পরে এলেও কত পরে বীরচন্দ্র বৃন্দাবনে এসেছিলেন জানবার উপায় নেই এবং তার কত আগে হরিদাস গোবিন্দ মন্দিরের অধিকারী হয়েছিলেন তাও জানবার উপায় নেই।

যে সব কাগজপত্রে হরিদাসকে 'গুসাই হরিদাস পণ্ডিত অধিকারী গোবিন্দজীউকী' বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে পুরনো কাগজখানির তারিখ ১৫৯৩ খ্রীস্টাব্দ ('সম্বৎ ১৬৫০ বরিষে সাবন শুদি ৬ শুভদিনে শ্রীপাদসাহ একবরসাহকী পাদসাহী মহ')। এই রকম আরও দুখানি কাগজ পাওয়া গেছে। একখানির তারিখ ১৫৯৪ খ্রীস্টাব্দ ('সম্বৎ ১৬৫১ বরিষে কুবর বদি ২ পাদশাহ শ্রীঅকবরসাহ সমরবিজয়িণাং রাজ্যে,' আর একখানির তারিখ ১৫৯৮ খ্রীস্টাব্দ ('সম্বৎ ১৬৫৫ বরষে আগহন সুদি ৩')। স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে গোবিন্দ মন্দিরের আশেপাশের যে জমি হরিদাস কিনেছিলেন এই কাগজগুলি তার দলিল। সুতরাং ১৫৯৩ খ্রীস্টাব্দে বা তার কিছু আগেই হরিদাস গোবিন্দ মন্দিরের অধিকারী হয়েছিলেন। তবে খুব বেশি আগেও হতে পারেন না; কারণ ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত গোবিন্দের অধিকারী (রঘুনাথ দাসের দানপত্র তার প্রমাণ), তারপরে অনন্ত আচার্য যদি খুব অল্পকালও অধিকারী হয়ে থাকেন তাহলেও ১৫৯৩ খ্রীস্টাব্দের খুব বেশি আগে হরিদাস গোবিন্দের অধিকারী হতে পারেন না। মহারাজ মানসিংহের অর্থে নোতুন গোবিন্দ মন্দির শেষ হয়েছিলো ১৫৯০ খ্রীস্টাব্দে; মন্দির শেষ হওয়ার ১৮ বছর পরে ১৬০৮ খ্রীস্টাব্দে ('সম্বৎ ১৬৬৫ বৈশাখ বদি ৮') লিখিত পরওয়ানায় মহারাজ মানসিংহ গোবিন্দদেবের সেবার জন্য দৈনিক ৯ টাকা এবং অধিকারী হরিদাস গোস্বামীর জন্য দৈনিক ১ টাকা 'দেহান্সী' (ভাতা) মঞ্জুর করেছিলেন। এর আগে ১৮ বছর গোবিন্দের সেবা কিভাবে চলেছিলো এবং জমি কেনার টাকাও কি উপায়ে সংগ্রহ হয়েছিলো তা জানা যায় না। মন্দির তৈরি করে ঠাকুর সেবার আর্থিক ব্যবস্থা না করা মানসিংহের পক্ষে অস্বাভাবিক। সম্ভবত ১৬০৮ খ্রীস্টাব্দের আগেও পরওয়ানা বেরিয়েছিলো সেগুলি পাওয়া যায় নি। সেই কারণে হরিদাস কবে গোবিন্দ মন্দিরের অধিকারী হয়েছিলেন জানা যায় না। অনুমান করি গোবিন্দের নোতুন মন্দিরের প্রথম অধিকারী হরিদাস, কিন্তু নিশ্চিত প্রমাণের অভাবে আপাতত ধরতে হবে ১৫৯৩ খ্রীস্টাব্দে বা তার কিছু আগে অনন্ত আচার্যের (তিরোধানের?) পর তাঁর শিষ্য হরিদাস গোবিন্দের অধিকারী হন। ১৬০৮ খ্রীস্টাব্দে জীব গোস্বামীর মৃত্যুকালে গোবিন্দের অধিকারী হরিদাস, মানসিংহের পরওয়ানা এবং জীবের 'সঙ্কল্পপত্রী'-তে হরিদাসের স্বাক্ষরই তার প্রমাণ। এরপর ১৬৪৩ খ্রীস্টাব্দে মহারাজ জয়সিংহের দরবার থেকে বৃন্দাবনের গোবিন্দ মন্দির সম্বন্ধে যে পরওয়ানা বেরিয়েছিলো তাতে গোবিন্দের অধিকারীর নাম গোসাই নিত্যানন্দ অধিকারী ঠাকুর। তার কত আগে হরিদাসের তিরোধান ঘটেছিলো তা অনুমানের বিষয় হলেও ১৬৩৭ খ্রীস্টাব্দে ('সম্বৎ ১৬৯৪ বর্ষে বৈশাখ সুদি ৩ শুভদিনে') রাধাদামোদরের অধিকারী কৃষ্ণদাসের লেখা ('লিখিতং সুগৃহীতনামধেয় শ্রীজীবাখ্যমহামহিমচরণানুচরকৃষ্ণদাস') একখানি দলিলে হরিদাস এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ সম্বন্ধে একটু সংবাদ আছে।

রাধাকুণ্ডে জীব গোস্বামীর জমি এবং কুঞ্জ ছিলো। রঘুনাথ দাস তাঁর সর্বস্ব রাধাদামোদরকে সমর্পণ করায় রাধাকুণ্ডের একটা বড়ো অংশ রাধাদামোদরের অধিকারভুক্ত হয়েছিলো। জীব গোস্বামীর মৃত্যুর পর রাধাদামোদরের অধিকারী কৃষ্ণদাস ১৬৩৭ খ্রীস্টাব্দে 'চৌবে হৃষীকেশ আদি পঞ্চকে আগে' রাধাকুণ্ডে জীবের কুঞ্জ এবং রঘুনাথ দাসের ঘরবাড়ি পুরোহিত কিশোর সোতীকে 'কৃষ্ণার্পণ' করেছিলেন। একদিকে জীবের কুঞ্জ আর একদিকে রঘুনাথ দাসের ঘরবাড়ি, এই দুয়ের মাঝখানে ছিলো কৃষ্ণদাস কবিরাজের ঘর। রাধাদামোদরের অধিকারী কৃষ্ণদাস 'শ্রীকবিরাজজীকে ঘরমাত্র বিনা' রঘুনাথের 'ঠৌরঘর' থেকে জীবের কুঞ্জ পর্যন্ত সমস্ত জমি কিশোর সোতীকে দিয়েছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের বাসস্থান বাদ দেওয়ার কারণ 'কবিরাজজী আপনো ঘর শ্রীঅধিকারী হরিদাস গুসাইকো দিএ হৈ'। সুতরাং কৃষ্ণদাস কবিরাজের ঘর রাধাদামোদরের এলাকাভুক্ত নয় এবং তা অন্যকে দেওয়ার অধিকার রাধাদামোদরের অধিকারীর নেই। ১৬৩৭ খ্রীস্টাব্দে লেখা এই দলিলের একটি লাইন থেকে জানতে পারি—সম্ভবত হরিদাস গোস্বামী ১৬৩৭ খ্রীস্টাব্দেও গোবিন্দের অধিকারী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ তার আগে দেহত্যাগ করেছেন (তবে বোধহয় দীর্ঘকাল আগে নয়) এবং হরিদাস গোস্বামীর সঙ্গে কৃষ্ণদাসের সম্প্রীতি এমন গভীর ছিলো যে মৃত্যুর আগে নিজের বসতবাড়িটিও তিনি হরিদাসকে দিয়ে গিয়েছিলেন। কৃষ্ণদাসের শিক্ষাগুরু রঘুনাথ দাস 'অন্তিম সময়ে' গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের নেতা জীব গোস্বামীকে তাঁর সর্বস্ব দিয়ে গিয়েছিলেন, কৃষ্ণদাসের পার্থিব সর্বস্ব তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুকালে যিনি গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন সেই হরিদাস গোস্বামীকে।[১৮]

নিরাসক্ত দৃষ্টিতে বিচার করলে স্বীকার করতেই হবে যাঁর আজ্ঞায় 'চৈতন্যচরিতামৃত' লেখা হয়েছিলো, যাঁকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মৃত্যুর আগে নিজের বসতবাড়িটি দিয়ে গিয়েছিলেন, যাঁকে 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ ব্রজের বৈষ্ণবগণের মুখ্য বলে বন্দনা করা হয়েছে তিনি আনুমানিক ১৫৯৩ খ্রীস্টাব্দে গোবিন্দের অধিকারী হলেও ১৬০৮ খ্রীস্টাব্দের শেষে (অথবা ১৬০৯ খ্রীস্টাব্দের গোড়ায়) জীব গোস্বামীর তিরোধানের পর ব্রজের বৈষ্ণবদের প্রধান হয়েছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ হরিদাসকে সম্প্রদায়ের নেতা বলে মান্য করতেন, জীব গোস্বামীর তিরোধানের আগে হরিদাসকে ব্রজের গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের নেতা বলে গণ্য করা অসম্ভব। সুতরাং ১৬০৯ খ্রীস্টাব্দের আগে 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর রচনা আরম্ভ হয়েছিলো একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। ১৬০৯ খ্রীস্টাব্দে যদি রচনা আরম্ভ হয়ে থাকে তাহলে শেষ করতে (যদিও রচনা শেষ করতে বৃদ্ধ এবং

১৮. মদনমোহন কৃষ্ণদাসের ঘরের ঠাকুর—'কুলাধিদেবতা মোর মদনমোহন' (১.৯.)। তাই গোবিন্দ মন্দিরে গোবিন্দের সেবার অধ্যক্ষ, গোবিন্দের সেবক এবং গোবিন্দের পূজকের 'আজ্ঞা' পেয়ে চৈতন্যলীলা বর্ণনায় হাত দেওয়ার আগে তিনি গোবিন্দের আজ্ঞা নিতে যান নি, 'মদনগোপালে গেলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে'। চৈতন্যলীলা বর্ণনা তিনি সমাপ্ত করতে পেরেছিলেন গোবিন্দ, চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, ভক্ত, শ্রোতাবৃন্দ স্বরূপ, রূপ, সনাতন, রঘুনাথ, গুরু, জীব প্রভৃতির 'চরণকৃপায়, ; কিন্তু একজনের বিশেষ কৃপা ছিল 'আর এক হয় তিঁহো অতি কৃপা করে'। এই 'আর এক' অর্থাৎ মদনমোহনের কৃপার কথা কৃষ্ণদাস স্বতন্ত্রভাবে বলেছেন—'মদনগোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি'। মদনগোপালের বিশেষ কৃপাভাজন হয়েও কৃষ্ণদাস গোবিন্দের সেবাধ্যক্ষকে যে নিজের বসতবাড়িটি দিয়ে গিয়েছিলেন তার একমাত্র কারণ গোবিন্দের সেবাধ্যক্ষ তখন ব্রজের গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের নেতা।

জরাতুর কৃষ্ণদাস খুবই ব্যগ্র ছিলেন) অন্তত দুবছর লাগলেও ১৬১১-১২ খ্রীস্টাব্দের আগে রচনা শেষ হয়েছিলো মনে করা শক্ত ।

কালজ্ঞাপক শ্লোকটিতে রচনাকাল বা লিপিকাল নির্দেশ করা হয়েছে সে প্রশ্নের উত্তর কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিজের হাতে লেখা পুথি না পেলে জানা যাবে না, শ্লোকটিকে লিপিকালজ্ঞাপক মনে করলেও রচনাকাল লিপিকালের বেশি পূর্ববর্তী হতে পারে না । এমন কি সমসাময়িক হতেও বাধা নেই । সেই কারণে শ্লোকটি রচনাকালজ্ঞাপক বা লিপিকালজ্ঞাপক সে প্রশ্ন আপাতত অবান্তর ॥

পরিশিষ্ট ১ : 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর পুথির শেষে শ্লোকমালা

কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিজের হাতে লেখা 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর পুথির শেষে শ্লোকমালা ছিলো কিনা, থাকলে কটি শ্লোক ছিলো তা অনুমানের বিষয় হলেও প্রাপ্ত পুথির কোনো একখানিতেও আটটির বেশি শ্লোক পাওয়া যায় না । সব পুথির শ্লোক একত্র সংগ্রহ করলে শ্লোকসংখ্যা হয় বারো । যে কয়েকখানি পুথিতে আটটি শ্লোক পাওয়া গেছে সেগুলিতে অন্ত্যলীলার পুষ্পিকা শেষ হয়েছে পুথির শেষ পাতার প্রথম লাইনে, অবশিষ্ট সাদা পাতায় আটটি শ্লোক । পুথির পাতা এবং অক্ষরের আকারে ছোটো বড়ো ভেদ থাকলেও সাধারণ মাপের পুথির একটি পাতায় আটটির বেশি শ্লোক লেখা সম্ভব নয়, সেই কারণেই বোধ হয় শ্লোকের ঊর্ধ্বসংখ্যা আট । এই অনুমানের পক্ষে যুক্তি এই যে, শ্লোকমালার শ্লোক লিখবার জন্য কোনো লিপিকর নোতুন পাতা ব্যবহার করেন নি । অন্ত্যলীলা শেষ হলে যদি একটি শ্লোক লিখবার মত সাদা পাতা অবশিষ্ট থাকে তাহলে একটি শ্লোক-ই লেখা হয়েছে, নোতুন আর একটি পাতায় আরও গোটা কয়েক শ্লোক লেখা যেতো কিন্তু এমন পুথি দেখিনি যার কোনো পাতায় কেবলমাত্র শ্লোকমালার শ্লোকই আছে মূল গ্রন্থের একটি ছত্র বা পুষ্পিকা পর্যন্ত নেই । এ থেকে নিঃসংশয়ে জানা যাচ্ছে যে মূল গ্রন্থ শেষ হলে পুথির শেষ পাতায় যে সাদা জায়গা অবশিষ্ট ছিলো তা পূরণ করার জন্য শ্লোকমালার শ্লোকগুলি লেখা হয়েছিলো এবং সেই কারণে কোনো কোনো পুথির আদি ও মধ্যলীলার শেষেও শ্লোক পাওয়া যায় । অনেক মুদ্রিত সংস্করণে শ্লোকমালাকে 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর 'উপসংহার' বা 'পরিশিষ্ট' মনে করা হয়েছে । পুথির সংগে পরিচয় থাকলে সম্পাদকেরা বুঝতে পারতেন শ্লোকমালা প্রধানত লিপিকরদের সৃষ্টি । 'চৈতন্যচরিতামৃত' এবং আরও দুখানি গোস্বামীগ্রন্থ থেকে জনপ্রিয় শ্লোক সংগ্রহ করে অন্ত্যলীলার শেষে লিপিকরেরা যে শ্লোকমালা সংযোজন করেছিলেন তা 'চৈতন্যচরিতামৃত' -এর মূল অংশ ত নয়ই, 'উপসংহার' বা 'পরিশিষ্ট'ও নয় । শ্লোকমালার সংযোজনে কৃষ্ণদাস কবিরাজের হাত ছিলো কি ছিলো না তা জানা যায় না । হাত থাকলেও তিনি 'উপসংহার' হিসাবে শ্লোকমালা সংযোজন করেন নি, করেছেন শেষ পাতার শূন্যস্থান পূর্ণ করার জন্য ।

বিভিন্ন পুথি থেকে সংগৃহীত শ্লোকমালার বারোটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত হলো । পরের তালিকায় দেখানো হয়েছে এই বারোটি শ্লোকের কয়টি কি ক্রমে কোন্ পুথিতে আছে ।

১. চরিতমমৃতমেতৎ শ্রীলচৈতন্যবিষ্ণোঃ
শুভদমশুভনাশি শ্রদ্ধয়াস্বদয়েদ্ যঃ ।
তদমলপদপদ্মে ভৃঙ্গতামেত্য সোঽয়ং
রসয়তি রসমুচ্চৈঃ প্রেমমাধ্বীকপূরম ॥

২. শ্রীমন্মদনগোপালগোবিন্দদেবতুষ্টয়ে।
চৈতন্যার্পিতমস্ত্বেতন্যচ্চৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥

৩. পরিমলবাসিতভুবনং স্বরসোন্মাদিতরসজ্ঞারোলম্বম্।
গিরিধরচরণাম্ভোজং কঃ খলু রসিকঃ সমীহতে হাতুম ॥

৪. বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহাদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌতমোনুদৌ ॥

৫. জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥

৬. মৎপ্রাণসর্বস্বপদাব্জরেণো মর্দীশ্বরী শ্রীযুতরাধিকায়াঃ
প্রাণোরুসর্বস্বপদাব্জরেণুং তং শ্রীলগোবিন্দমহং প্রপদ্যে।

৭, শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষণ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েস্তু নঃ ॥

৮. তদিদমতিরহস্যং গৌরলীলামৃতং যৎ
খলসমুদয়োলোকৈ র্নাদৃতং তৈ রলভ্যম্।
ক্ষিতিরিহমিহ কামে স্বাদিত যৎ সমন্তাৎ
সহৃদয়সুমনোভি র্মোদমেধাং তনোতি ॥

৯, বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবং।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

১০. শ্রীকৃষ্ণকৃষ্ণচৈতন্য সসনাতনরূপক।
গোপালরঘুণাথাপ্ত ব্রজবল্লভ পাহিমাং ॥

১১. বৈকুণ্ঠজ্জানিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণি রমণাদ অত্রাপি গোবর্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডং ইহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতপ্লাবণাৎ
সেবাং তস্য বিরাজতো গিরিতটে কুর্য্যাদ্ বিবেকী ন কঃ ॥

১২. শাকে সিন্ধ্বাগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্যেহ্ন্যাসিতপঞ্চম্যাংগ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥

পুঁথি	শ্লোকমাবার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি শ্লোক এখানে ১, ২, ৩											মোট শ্লোক
পাটনা ২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	×	×	×	১১	×	৮
বৃন্দাবন ৯৩	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	×	×	×	×	১২	৮
বৃন্দাবন ৯৪	১	২	×	×	৫	×	৭	৮	৯	×	×	১২	৭
বৃন্দাবন ৪৫৩	১	২	×	৪	৫	×	৭	×	৯	×	×	১২	৭
বৃন্দাবন ৪৭৫	১	×	×	×	×	×	×	৮	৯	+	×	×	৩
বৃন্দাবন ১২৪২	১	×	×	×	৫	×	৭	×	৯	×	×	১২	৫
বৃন্দাবন ৩০২১	১	২	×	×	৫	×	৭	×	৯	×	×	১২	৬
বৃন্দাবন ৪৫১৪	১	×	৩	৪	৫	×	৭	×	৯	×	১১	১২	৮

পরিশিষ্ট ২ : রঘুনাথ দাসের দানপত্র

রঘুনাথ দাসের মূল দানপত্রখানির সন্ধান পাওয়া যায় নি, তবে রাধাদামোদর মন্দির থেকে নাগরী অক্ষরে লেখা দুখানি নকল উদ্ধার করা গেছে। নকল হলেও দানপত্রের তারিখ মূল পাঠের মধ্যে এমনভাবে সন্নিবিষ্ট যে ১৫৮৩ খ্রীস্টাব্দ নকলের তারিখ বলে মনে করার কারণ নেই। রঘুনাথ দাসের 'মুক্তাচরিত্র'-এর একটি শ্লোক দিয়ে দানপত্রের শুরু।

শ্রীমদীশ্বরীকুণ্ডজয়তি
বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যম্ উদারপাণিরমণাদ্ তত্রাপি গোবর্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমুইহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতপ্লাবনাৎ
সেবাং তস্য বিরাজতো গিরিতটে কুর্যাদ্বিবেকী ণ কঃ ॥
সম্বৎ সোমসমুদ্রযোড়শমিতে শ্বেতাশ্বযুক সপ্তমী
সংযুক্তে কবিরাজ তো' স্বসময়ে সংলেখ্য পত্রং ময়া।
অন্ধ শ্রীরঘুনাথ দাস লঘুনা শ্রীকুণ্ড সেবৈষণা
জীবারাধ্যপদাম্বুজেষু নিহিতং সর্বং মমস্বাসপদং ॥

অত্র সাক্ষী ভুগর্ভনামা
সাক্ষী অনন্তাচার্যঃ ॥
অত্র সাক্ষী গোপালভট্টঃ ॥
রঘুনাথভট্টশ্চ……
গোপালদাস কৃষ্ণপণ্ডিতো
উগাহী পাণ্ডে দাস গোপাল ॥

রঘুনাথ দাসের নামের আগে 'শ্রী' নকলকারের যোজনা বলে মনে হয় এবং সাক্ষীদের নামের তালিকায়ও তাঁর হস্তক্ষেপ থাকা অসম্ভব নয়। মূলে সাক্ষীরা যদি নিজের হাতে নাম সই করে থাকেন তাহলে 'গোপালদাসকৃষ্ণপণ্ডিতো' নকলকারের সংক্ষেপীকরণ। নকলকারের অনবধানতায় 'গোপালদাস' এবং 'দাসগোপাল' একজনের নাম দুবার লেখা হয়ে থাকতে পারে। দুখানি নকলের মধ্যে একখানিতে সাক্ষীদের নামের তালিকায় কেবলমাত্র গোপালভট্ট ও ত্রিভঙ্গী পাণ্ডের নাম আছে—'অত্র সাক্ষিণৌ গোপালভট্টনামা নৌ উগাহী ত্রিভঙ্গী পাণ্ডে। অন্য সাক্ষীগুলির নামের পাঠোদ্ধার করতে না পারায় সম্ভবত একখানি নকলে নামগুলি বাদ পড়েছে, অন্যথায় সেগুলি নকলকারের সৃষ্টি।

ত্রিভঙ্গী পাণ্ডে সম্ভবত স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, আর সকলে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রজবাসী বৈষ্ণব। ভুগর্ভ—গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ভুগর্ভ গোস্বামী। বীরচন্দ্রের বৃন্দাবন আগমনকালেও তিনি জীবিত ছিলেন এবং বীরচন্দ্রের সঙ্গে তিনি গোবর্ধন ও রাধাকুণ্ড গিয়েছিলেন (ভক্তি 'রত্নাকর', ১৩/১০২১)। অনন্ত আচার্য—গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য এবং হরিদাস পণ্ডিতের গুরু। শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিতের পরে এবং হরিদাস পণ্ডিতের আগে অনন্ত আচার্য গোবিন্দের অধিকারী হয়েছিলেন ('ভক্তিরত্নাকর,' ১৩/১০২১)। গোপাল দাস—গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য, কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীর পর মদনমোহনের অধিকারী হন। বীরচন্দ্র বৃন্দাবন পেঁছিলে গোবিন্দ, মদনমোহন এবং গোপীনাথের তিন অধিকারী যথাক্রমে হরিদাস, গোপাল এবং ভবানন্দ তাঁকে

'আগুসরি লইতে' এসেছিলেন ('ভক্তিরত্নাকর,' ১৩/১০২১)। কৃষ্ণ পণ্ডিত—চৈতন্যের পরিকর, কাশীশ্বর গোস্বামীর তিরোধানের পর গোবিন্দের অধিকারী হয়েছিলেন। শ্রীনিবাস প্রথমবার যখন বৃন্দাবন এসেছিলেন তখন গোবিন্দের অধিকারী ছিলেন কৃষ্ণ পণ্ডিত। গোপাল ভট্ট এবং রঘুনাথ ভট্ট 'ছয় গোসাঞি'র দুজন। সাক্ষীদের মধ্যে জীব গোস্বামীর নাম নেই, থাকবার কথাও নয়। 'জীবারাধ্যপদাম্বুজেষু' যদি জীবের আরাধ্য 'রাধাদামোদর'কে বুঝিয়ে থাকে তাহলে সাক্ষীদের মধ্যে জীব গোস্বামীর নাম থাকা অসঙ্গত।

১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দের দলিলে সাক্ষীদের মধ্যে রঘুনাথ ভট্টের নাম বা স্বাক্ষর থাকা বিস্ময়কর। 'ভক্তিরত্নাকর'-এর বিবরণ অনুসারে শ্রীনিবাসের প্রথমবার বৃন্দাবন আগমনের আগেই রঘুনাথ ভট্টের তিরোধান হয়েছিল—'রঘুনাথভট্ট ভাগবত বক্তা যেঁহ প্রভুর বিয়োগে অদর্শন হৈলা তিঁহ ॥ ('ভক্তিরত্নাকর,' ৪/১৩৩)। এই মন্তব্য থেকে মনে হয় মহাপ্রভুর তিরোধানের পরে এবং সনাতন রূপের জীবিতকালেই রঘুনাথ ভট্ট দেহত্যাগ করেছিলেন। রামচন্দ্র কবিরাজ এবং জাহ্নবা দেবী বৃন্দাবনে এসে রঘুনাথ ভট্টের সমাধি দেখে কেঁদেছিলেন, রঘুনাথ দাস তখনও জীবিত। সুতরাং 'ভক্তিরত্নাকর'-এর বিবরণ সত্য হলে রঘুনাথ দাসের দলিলে রঘুনাথ ভট্টের সাক্ষী হওয়া অসম্ভব মনে হয়। সম্ভবত নামটি নকলকারের যোজনা এরকম আর কটি নাম তিনি যুক্ত করেছিলেন বলা শক্ত। তবে 'ভক্তিরত্নাকর'-এর সংবাদের ভিত্তি যদি কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' হয় তাহলে সে সংবাদের সত্যতায় সংশয় আছে।

'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর দুটি ছত্রের উপর নির্ভর করে বলা হয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ রঘুনাথ ভট্টের তিরোধানের সংবাদ দিয়েছেন। ছত্র দুটি এই—

মহাপ্রভুর দত্তমালা মরণের কালে।
প্রসাদ কড়ার সহ বান্ধিলেন গলে ॥

অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর সংস্করণে এবং আরও কোনো কোনো ছাপা বই ও পুঁথিতে 'মরণের কালে' পাঠ থাকলেও এটাকেই শুদ্ধ এবং একমাত্র পাঠ মনে করলে ভুল হবে। অনেক পুঁথি এবং কোনো কোনো ছাপা বইয়েও 'মরণের কালে'-র পরিবর্তে 'স্মরণের কালে' বা 'মননের কালে' এবং 'বান্ধিলেন'-এর পরিবর্তে 'বান্ধিলন' বা 'বান্ধি লয়' পাঠ আছে। প্রসঙ্গের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে 'স্মরণের কালে' এবং 'বান্ধি লন'-কে শুদ্ধ পাঠ বলতে হয়। রঘুনাথ ভট্টের 'কৃষ্ণকথাপূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায়' এবং এই অষ্টকালীয় 'স্মরণের কালে' তিনি নিত্য 'প্রসাদ কড়ার সহ' মহাপ্রভুর দেওয়া মালা 'বান্ধি লন,' তাতে 'মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম অনর্গল' হয়। অষ্টকালীয় কৃষ্ণকথাপূজার প্রসঙ্গে 'মরণের কালে' পাঠ নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রঘুনাথ ভট্টের নিত্যকার নামস্মরণ পদ্ধতির বিবরণ দিয়েছেন সেটাই লিপিকরের হস্তক্ষেপে মৃত্যুকালের বিবরণ হয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ সনাতন, রূপ, রঘুনাথ দাস, গোপাল ভট্ট, জীব গোস্বামী—এই পাঁচ গোস্বামীর মৃত্যুকালে উপস্থিত ছিলেন; কারও মৃত্যুর বিবরণ তিনি দেন নি (কৃষ্ণদাস নিত্যলীলায় বিশ্বাসী, রঘুনাথ ভট্টের মৃত্যুসংবাদ দেওয়ার জন্য তিনি দুটি ছত্র লিখেছিলেন তা বিশ্বাস করতে পারি না। 'স্মরণের কালে'-র প্রয়োগ 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর অন্যত্র আছে। শঙ্করানন্দ সরস্বতীর কাছ থেকে

দুই অপূর্ব বস্তু পাঞা প্রভু তুষ্ট হৈলা।
স্মরণের কালে গলে পরে গুঞ্জামালা ॥ ৩.৬.

সৌভাগ্যক্রমে এখানে 'স্মরণের কালে' লিপিকর বিকৃতিতে 'মরণের কালে' হয়ে চৈতন্যের

তিরোভাব সম্বন্ধে নোতুন ধাঁধা সৃষ্টি করে নি। রঘুনাথ দাসও 'সাড়ে সাত প্রহর…স্মরণে' কাটাতেন। কেদারনাথ ভক্তিবিনোদের সংস্করণে 'মননের কালে' এবং 'বান্ধি লন' পাঠ আছে। জগদ্বন্ধু ভদ্রও 'মননের কালে' এবং 'বান্ধি লয়' পাঠই জানতেন, এবং জানতেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ এখানে রঘুনাথ ভট্টের কৃষ্ণকথাপূজার বিবরণ দিয়েছেন, তিরোধানের সংবাদ দেন নি। 'গৌরপদতরঙ্গিণী'-র ভূমিকায় জগদ্বন্ধু ভদ্র বলেছেন; 'তাঁহার [রঘুনাথ ভট্টের] কৃষ্ণকথাপূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায়। তখন

'বৈষ্ণবের নিন্দ্যকর্ম নাহি পাড়ে কানে।
সবে কৃষ্ণ ভজন করে এই মাত্র জানে॥
মহাপ্রভুর দত্তমালা মননের কালে।
প্রসাদ কড়ার সহ বান্ধি লয় গলে॥'

তবে 'ভক্তিরত্নাকর'-এ রঘুনাথ ভট্টের তিরোধানের যে সংবাদ দেওয়া হয়েছে সে সংবাদের মূলে 'চৈতন্যচরিতামৃত' নাও হতে পারে। সুকুমার সেন যে প্রাচীন পুঁথির পাতায় রূপ, সনাতন এবং জীবের বংশপরিচয় পেয়েছেন তাতে পাঁচ গোস্বামীর তিরোধানের তিথির উল্লেখ যদি কালানুক্রমিক হয় তাহলে স্বীকার করতে হয় প্রথমে রঘুনাথ ভট্টের পর সনাতন, রূপ এবং রঘুনাথ দাসের তিরোধান হয়েছিল। তবে সংবাদদাতাদের মধ্যে কে কাকে অনুসরণ করেছেন সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই।[১৯]

রঘুনাথ ভট্ট এবং আরও কোনো কোনো সাক্ষীর নাম নকলকারের যোজনা প্রমাণিত হলেও বলা চলে না রঘুনাথ দাসের দানপত্রখানি জাল এবং তাঁর তিরোভাবকাল অনিশ্চিত। এই নকল কার এবং কবেকার জানা নেই তবে সাক্ষীদের নামের তালিকায় ছাড়া দানপত্রের মূল পাঠে নকলকার হস্তক্ষেপ করেন নি সে সম্বন্ধে বোধ হয় কোনো সংশয় নেই।

দানপত্রখানি লেখা হয়েছিলো ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দের আশ্বিন মাসের শুক্লা সপ্তমীতে। সুকুমার সেনের প্রাচীন পুঁথির পাতায় রঘুনাথের তিরোভাব তিথি আশ্বিনের শুক্লা দ্বাদশী ('বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,' ১/১, ১৯৭৮, ৩১)। এতে সালের উল্লেখ না থাকলেও অনুমান করতে পারি ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দের শুক্লা দ্বাদশীতে অর্থাৎ দানপত্র লেখার চার দিন পরে রঘুনাথ দাস দেহরক্ষা করেছিলেন। অনুমান ঠিক হলে দানপত্রের 'অন্তিম সময়' আক্ষরিকভাবে সত্য।

১৯. 'ভক্তিরত্নাকর'-এর বিবরণ থেকে ধারণা হয়, প্রথমে কাশীশ্বর গোস্বামীর তারপরে রঘুনাথ ভট্টের তারপরে সনাতনের তারপরে রূপ গোস্বামীর তিরোধান হয়েছিলো (দ্র. ৪. ১৩৩)। সুকুমার সেনের প্রাচীন পুঁথির পাতায়ও তিরোধানের ক্রম 'ভক্তিরত্নাকর'-এর অনুরূপ। কিন্তু 'চৈতন্যচরিতামৃত' অনুসারে 'বৃদ্ধকালে' রূপ গোস্বামী যখন মথুরায় গোপালদর্শনে গিয়েছিলেন তখন রঘুনাথ ভট্ট তাঁর সঙ্গী ছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিবরণ থেকে মনে হয় সনাতন তখন পরলোকগত।

বৃদ্ধকালে রূপগোসাঞি না পারে যাইতে।
বাঞ্ছা হৈল গোপালের সৌন্দর্য দেখিতে॥
ম্লেচ্ছভয়ে আইল গোপাল মথুরা নগরে।
একমাস রহিল বিট্‌ঠলেশ্বর ঘরে॥
তবে রূপ গোসাঞি সব নিজ গণ লঞা।
এক মাস দর্শন কৈল মথুরা রহিয়া॥
সঙ্গে গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ।
রঘুনাথ ভট্ট গোসাঞি, আর লোকনাথ॥
ভূগর্ভ গোসাঞি, আর শ্রীজীব গোসাঞি।
শ্রীযাদবাচার্য আর গোবিন্দ গোসাঞি॥

পরিশিষ্ট ৩ঃ স্বরূপ দামোদর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ

মুদ্রিত সংস্করণগুলিতে প্রক্ষেপ বিচারের চেষ্টা নেই বলে 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর অনেক জায়গায় অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। শিবানন্দ চক্রবর্তী প্রসঙ্গে এই রকম অসঙ্গতির কথা আগেই বলা হয়েছে। আর একটি অসঙ্গতি আছে স্বরূপ দামোদর প্রসঙ্গে। আদিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে—

জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময়।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপসনাতনাশ্রয় ॥ [১]
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ আশ্রয় ॥ [২]
সনাতন কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ কৃপায় পাইনু ভক্তিরসপ্রান্ত ॥ [৩]

(উল্লেখের সুবিধার জন্য পদ তিনটিকে ১, ২ এবং ৩ সংখ্যায় চিহ্নিত করা হয়েছে।)

আদিলীলার দশম পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে নীলাচলে রঘুনাথ দাস স্বরূপের সাথে ১৬ বছর প্রভুর গুপ্তসেবা করেছিলেন, তারপর 'স্বরূপের অন্তর্ধানে আইলা বৃন্দাবন'। নীলাচলে স্বরূপ দামোদরের তিরোভাবের পর রঘুনাথ দাস যদি বৃন্দাবনে এসে থাকেন তাহলে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনে এসে 'রঘুনাথ মহাশয়' এবং 'শ্রীস্বরূপ'-এর আশ্রয় পান কি উপায়ে? পঞ্চম ও দশম পরিচ্ছেদের এই দুই উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য করা শক্ত। পঞ্চম পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় পদটি 'যাঁহা হৈতে পাইনু…শ্রীস্বরূপ আশ্রয়'—যদি আপাতত অগ্রাহ্য করি তাহলে 'চৈতন্য-চরিতামৃত'-এর কোথায়ও এমন কথা বলা হয় নি যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বরূপ দামোদরের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং তাঁর মুখ থেকে চৈতন্যের অন্ত্যলীলার বিবরণ শুনেছিলেন। বরঞ্চ একথা 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ বার বার বলা হয়েছে যে, চৈতন্যের শেষলীলা স্বরূপ দামোদর কড়চায় লিখেছিলেন এবং রঘুনাথ দাসকে মুখে মুখে বলেছিলেন—

চৈতন্যলীলারত্নসার　　স্বরূপের ভাণ্ডার
তিঁহো থুইল রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাহা কিছু যে শুনিল　　তাহা ইহ বিস্তারিল
ভক্তগণে দিল এই ভেটে ॥

স্বরূপ দামোদরের লিখিত কড়চা এবং রঘুনাথ দাসের মৌখিক বিবরণ 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর অন্ত্যলীলার প্রধান অবলম্বন। রূপ-সনাতনের কাছ থেকেও কিছু উপাদান পাওয়া গিয়েছিলো, তাই অন্ত্যলীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদের প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে—

লিখ্যতে শ্রীলগৌরস্য অত্যদ্ভুতমলৌকিকং।
যৈদৃষ্টং তন্মুখাচ্ছ্রুত্বা দিব্যোন্মাদবিচেষ্টিতং ॥

এখানে 'যৈদৃষ্টং তন্মুখাচ্ছ্রুত্বা'-র লক্ষ্য সনাতন, রূপ এবং রঘুনাথ দাস। রঘুনাথ ভট্টও এঁদের মধ্যে আছেন কিনা জানি না, তবে স্বরূপ দামোদর অবশ্যই নেই। 'চৈতন্যলীলারত্নসার'

যাঁর 'ভাণ্ডার' সেই স্বরূপ দামোদরের মুখ থেকে কিছু শুনলে কৃষ্ণদাস সে কথা গোপন রাখতেন না বা আভাসে ইঙ্গিতে বলতেন না। সেই কারণে বৃন্দাবনে এসে কৃষ্ণদাস স্বরূপ দামোদরের আশ্রয় পেয়েছিলেন একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। চৈতন্যকে নীলাচলে রেখে স্বরূপ দামোদর বৃন্দাবনে এসেছিলেন তারও কোনো প্রমাণ নেই।

সব ছাপা বইতে থাকলেও 'যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়/যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ আশ্রয়' পদটিকে লিপিকরের প্রক্ষেপ বলে মনে করি। তার একটি কারণ কোনো কোনো পুঁথিতে পদটি নেই ; যেমন পাটনা ১, বৃন্দাবন ৪১৬। অনুমান করি পুরনো এবং নির্ভরযোগ্য অনেক পুঁথিতেই পদটি পাওয়া যাবে না। সব পুঁথি মিলিয়ে দেখার সুযোগ হয় নি বলে এখনও নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না, তবে পদটির ইতিহাস অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। পদটির অকৃত্রিমতায় সংশয় যে অযথার্থ নয় প্রসঙ্গের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে সে কথা সহজেই বোঝা যায়। বর্ণনার ক্রমভঙ্গ করে এমন অসতর্কতায় পদটিকে মূলের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে জোড়ার দাগ খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়। অনুমান করি ছাপা বইতে এখন যা তিনটি পদ, মূলে তা ছিলো দুটি পদ। কৃষ্ণদাসের মূল রচনায় এই পদ দুটির বিষয়ের ক্রম ছিলো এই রকম—বৃন্দাবনে এসে কৃষ্ণদাস রূপ-সনাতনের আশ্রয় পেলেন (প্রথম পদের বিষয়)। রূপ-সনাতনের কৃপায় কৃষ্ণদাস পেলেন যথাক্রমে 'ভক্তিরসের প্রান্ত' এবং 'ভক্তিরস-সিদ্ধান্ত' (দ্বিতীয় পদের বিষয়)। প্রথম ও দ্বিতীয় পদের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত পদটিতে কোনো এক লিপিকর জানাতে চেয়েছেন যে, 'রঘুনাথ মহাশয়' এবং 'শ্রীস্বরূপ'-এর আশ্রয়ও কৃষ্ণদাস পেয়েছিলেন। লিপিকর খেয়াল করেন নি যে, প্রক্ষিপ্ত পদটিতে বর্ণনার ক্রমভঙ্গ হয়েছে। 'রঘুনাথ মহাশয়' এবং 'শ্রীস্বরূপ'-এর কৃপায় কৃষ্ণদাস কি পেলেন তার উল্লেখ করে যদি একটি চতুর্থ পদ তিনি জুড়ে দিতেন তাহলে বর্ণনার ক্রমভঙ্গ হতো না, জোড়ার দাগ ধরাও শক্ত হতো।

প্রক্ষিপ্ত পাঠ এখানে যে অসঙ্গতি সৃষ্টি করেছে তার সামঞ্জস্য করতে বিশেষজ্ঞরা যে সব যুক্তির অবতারণা করেছেন অবিশেষজ্ঞের সাধারণ বুদ্ধিতে তাকে যুক্তি বলে না। সেই কারণে তার উল্লেখ অবান্তর।

পরিশিষ্ট ৪ : ব্রজের গৌড়ীয় মন্দিরের সেবাধিকারী

জীব গোস্বামীর পর ব্রজমণ্ডলে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ছিলেন দেবালয়ের অধিকারীরা, বিশেষত গোবিন্দ, মদনমোহন, রাধারমণ এবং রাধাদামোদরের অধিকারীরা। এই অধিকারীদের ইতিহাসই সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্রজের গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ইতিহাস। তথ্যের অপ্রতুলতা না থাকলেও এই ইতিহাসের অনেকটাই অজ্ঞাত। কে কোন্ সময় কতদিন কোন্ মন্দিরের অধিকারী ছিলেন সে সংবাদও জানা নেই ; তাছাড়া জানি না অধিকারী নিয়োগের বিধিব্যবস্থা কিরকম ছিলো। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে প্রথমে ব্রহ্মচারীরাই মন্দিরের সেবাধ্যক্ষ হতেন এবং সেবাধ্যক্ষের পদ ছিলো শিষ্য পারম্পরিক। অষ্টাদশ শতকে জয়পুর মহারাজের নির্দেশে অধিকারীরা বিবাহ করেন এবং তখন থেকে অধিকারী পদ বংশানুক্রমিক। এ বিশ্বাস অংশত সত্য। কাশীশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত এবং অনন্ত আচার্য গোবিন্দ মন্দিরের এই প্রথম তিনজন অধিকারীর মধ্যে গুরু, শিষ্য এবং

প্রশিষ্যের সম্পর্ক নয়। মদনমোহনের প্রথম দুজন অধিকারী—কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী এবং গোপাল দাস—গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য। রাধারমণ মন্দিরে গোপাল ভট্টের পর তাঁর কোনো শিষ্য সেবাধ্যক্ষ হন নি, হয়েছিলেন গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ভবানন্দ অধিকারী। জীব গোস্বামীর পর রাধাদামোদরের সেবাধিকারী কৃষ্ণদাসকে জীব গোস্বামীর শিষ্য বলা হলেও তাঁর শিষ্যত্ব সংশয়াতীত নয় (পরে দ্রষ্টব্য)। কৃষ্ণদাসের মৃত্যুর পর তাঁর দুই ভ্রাতুষ্পুত্র গৌড় থেকে এসে সেবাধিকার নেওয়ায় রাধাদামোদরের সেবাধিকার কৃষ্ণদাসের সময় থেকেই বংশানুক্রমিক হয়ে গিয়েছিলো জয়পুর মহারাজের সঙ্গে রাধাদামোদরের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার অনেক আগে।

মৃত্যুর আগে জীব গোস্বামী গৌড়ীয় দেবালয়গুলির—বিশেষত গোবিন্দ, মদনমোহন এবং রাধাদামোদর—ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে বিশেষ উৎকণ্ঠিত ছিলেন তার প্রমাণ আছে। এই উৎকণ্ঠা নিবারণের জন্য তিনি যে সব বিধিব্যবস্থা করেছিলেন তা থেকে জানি মহারাজ টোডরমল্লের সঙ্গে জীব গোস্বামীর বিশেষ সম্প্রীতি ছিলো। ১৫৯০ খ্রীস্টাব্দে জীব গোস্বামীর হয়ে মহারাজ টোডরমল্ল সম্রাট আকবরের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন যে, রূপ সনাতনের মৃত্যুর পর তাঁদের প্রতিষ্ঠিত মন্দির দুটির তত্ত্বাবধায়ক জীব গোস্বামীর অভিপ্রায় অনুসারে যাঁরা আজীবন এই মন্দির দুটির (গোবিন্দ এবং মদনমোহন) সেবাধিকারীর কাজ করে এসেছেন তাঁদের আইনসম্মত সেবাধিকার দেওয়া হক। মহারাজ টোডরমল্লের এই আবেদন থেকে প্রথম জানতে পারি যে, দেবালয়ের সেবাধিকারের পদ আইনসম্মত হওয়ার প্রয়োজন ছিলো। সম্রাট টোডরমল্লের আবেদন মঞ্জুর করেছিলেন কিনা জানা যায় না। তবে ১৬৪৬ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট সাজাহানের একখানি ফরমানে চৌধুরী, কানুনগো, জায়গীরদারদের অবগতির জন্য ঘোষণা করা হয়েছিলো যে, কৃষ্ণদাস রাধাদামোদরের আইন-সম্মত সেবাধিকারী। মোগল বাদশাহরা গৌড়ীয় দেবালয়ে প্রচুর ধনসম্পত্তি দান করেছিলেন বলেই মন্দিরের সেবাধ্যক্ষের পদ আইনসম্মত হওয়ার প্রয়োজন ছিলো। [গৌড়ীয় মন্দির সম্পর্কিত মোগল বাদশাহদের ফরমানগুলি সম্পাদিত হয়ে প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। গোকুলের বল্লভ সম্প্রদায়ের মন্দিরের ভূমিদান সম্পর্কিত ফরমানগুলি বহুকাল আগে প্রকাশিত হয়েছিলো। দ্র. *Krishnalal Mohanlal Jhaveri, Imperial Farmans (A.D. 1557 1805), Bombay, 1928*]।

রূপ সনাতন প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দ-মদনমোহনের তত্ত্বাবধায়ক হলেও এই মন্দির দুটির উপর জীব গোস্বামীর আইনসম্মত অধিকার ছিলো না। তাই জীব টোডরমল্লের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলেন। (এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে জীব নিজে বাদশাহের সাহায্যপ্রার্থী হন নি, এমন কি মানসিংহেরও শরণার্থী হন নি, কি কারণে জানি না, যদিও মানসিংহের অর্থে বর্তমান গোবিন্দ মন্দিরের নির্মাণকার্য ১৫৯০ খ্রীস্টাব্দেই শেষ হয়েছিলো)। রাধাদামোদরের ভবিষ্যৎ সেবাধ্যক্ষ নির্বাচনের অধিকার মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা জীব গোস্বামীর ছিলো এবং সে অধিকার আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি পালন করেছিলেন নিজের হাতে 'সঙ্কল্পপত্রী' বা 'উইল' লিখে। [উইল করার ব্যাপারে বোধহয় টোডরমল্লই জীব গোস্বামীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। হিন্দু আইনে টোডরমল্লের আগ্রহ ছিলো এবং তাঁর উদ্যমে একখানি বৃহৎ ধর্মশাস্ত্রসংহিতা সঙ্কলিত হয়েছিলো। দ্র. *Todarananda*, P.L, Vaidya (ed.), Bikaner, 1948 ; টোডরমল্লের পরামর্শ ছাড়া উইল করার কথা জীব গোস্বামীর মাথায় কি করে এলো বোঝা শক্ত]। 'সঙ্কল্পপত্রী'-তে জীব গোস্বামী তাঁর মৃত্যুর পর রাধাদামোদরের সেবাধ্যক্ষের পদে দুজনকে মনোনীত করেছিলেন। প্রথম মনোনয়ন

পেয়েছিলেন শ্রীবিলাস দাস, দ্বিতীয় কৃষ্ণদাস। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে শ্রীবিলাস দাস নামটি অপরিচিত। তিনি বাঙালী বা অবাঙালী জানি না, গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত কিনা তাও জানি না। প্রামাণিক বা অপ্রামাণিক কোনো বইয়ে তাঁর নাম পাওয়া যায় না। কোন্ যোগ্যতায় জীব তাঁকে মনোনীত করেছিলেন তা রহস্যাবৃত আছে। একমাত্র রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের ধ্রুবদাসের 'ভক্তনামাবলী'তে শ্রীবিলাস সম্বন্ধে বলা হয়েছে তিনি মদনমোহনে ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। জীব গোস্বামীর মনোনীত দ্বিতীয় ব্যক্তি কৃষ্ণদাস। ইনি জীব গোস্বামীর একজন অনুগত ছাত্র (বা শিষ্য)। 'সাধনদীপিকা'-র রাধাকৃষ্ণদাস (হরিদাস গোস্বামীর শিষ্য) বোধ হয় কৃষ্ণদাসের সমসাময়িক ছিলেন। রাধাকৃষ্ণ দাসের ধারণা, কৃষ্ণদাস জীবের শিষ্য নন, ছাত্র। এক কৃষ্ণদাস 'প্রভা' নামে জীব গোস্বামীর 'কৃষ্ণার্চনদীপিকা'-র টীকা লিখেছিলেন। তাতে গুরু বা শিক্ষক সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস বলেছেন, 'শ্রীজীবগতিনা দীপ্তা কৃষ্ণদাসেন দীপিকা॥ এবং অত্মপরিচয়ে বলেছেন, 'সাবিত্র্যা ভারতাচার্য্যাত্মজেন'। জীবের 'সঙ্কল্পপত্রী'-তেও কৃষ্ণাদাসের পরিচয় দেওয়া হয়েছে 'ভারতাচার্য্যাত্রতনুজঃ' বলে। সুতরাং 'প্রভা'-র গ্রন্থকারই যে জীবের দ্বিতীয় মনোনয়ন পেয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। জীব গোস্বামীর যে কয়েকখানি চিঠি 'ভক্তিরত্নাকর'-এ উদ্ধৃত হয়েছে তার একখানির শেষে আছে 'ইহ কৃষ্ণদাসস্য নমস্কারাঃ'। 'ভক্তিরত্নাকর'-এর রচয়িতার ধারণা 'পত্রীমধ্যে শ্রীকৃষ্ণদাসের নমস্কার। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রচার॥' আসলে এই কৃষ্ণদাস জীব গোস্বামীর ছাত্র কৃষ্ণদাস কবিরাজ নন। অনুগত ছাত্র বলে কৃষ্ণদাস বোধহয় শিক্ষাগুরুর কাজকর্মে সাহায্য করতেন, জীবের চিঠিগুলি বোধ করি কৃষ্ণদাসের হস্তাক্ষরে লেখা হয়েছিলো। বৃদ্ধ বয়সে মন্দির পরিচালনায় জীব সম্ভবত কৃষ্ণদাসের সাহায্য নিতেন। তার ফলে কৃষ্ণদাসের ধারণা হয়েছিলো, জীবের অবর্তমানে তিনি রাধাদামোদরের সেবাধ্যক্ষ হবেন। কৃষ্ণদাসের প্রত্যাশা স্বাভাবিক তবে কৃষ্ণদাসের পরিবর্তে শ্রীবিলাসদাসকে প্রথম মনোনয়ন দেওয়া খুবই অস্বাভাবিক। কি কারণে কৃষ্ণদাসের প্রতি জীব বিমুখ হয়েছিলেন তা যেমন কোনোদিন জানা যাবে না, তেমনি কি কারণে তিনি শ্রীবিলাসদাসকে যোগ্যতর মনে করেছিলেন তাও অজ্ঞাত থেকে যাবে। 'সঙ্কল্পপত্রী'-র কয়েকটি কথা যে সরাসরি কৃষ্ণদাসের উদ্দেশ্যে সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। কৃষ্ণদাসের কথা মনে রেখেই জীব 'সঙ্কল্পপত্রী'-তে লিখেছিলেন, 'য[দি]তদিদং সংপ্রতি লোকেষু ন স্পষ্টীকৃতং তৎ খলু সংপ্রণে [তা] কশ্চিৎ কশ্চিদ অত্র মাৎসর্য্যং করিষ্যতীতি বিচার্য্য[ং]'। ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে লেখা মূল 'সঙ্কল্পপত্রী'-র বিষয় কৃষ্ণদাসের অজ্ঞাত ছিলো না। সেবাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ায় হয়ত কৃষ্ণদাস কিঞ্চিৎ উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন এবং ভেবেছিলেন মৃত্যুর আগে জীবের মতের পরিবর্তন হবে। জীব গোস্বামীর মতের পরিবর্তন হলো না, তবে মৃত্যুর আগে ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে 'সঙ্কল্পপত্রী'-তে তিনি আর একটি অনুচ্ছেদ যুক্ত করলেন। তার মূল কথা, শ্রীবিলাসদাসের অবর্তমানে অথবা তাঁর জীবিতকালে তাঁর সম্মতিক্রমে কৃষ্ণদাস রাধাদামোদরের সর্বস্ব গ্রহণ করতে পারেন, তবে বলপ্রয়োগে নয়—'শ্রীবিলাসদাসস্যাভাবে ইচ্ছায়াং বা কৃষ্ণদাসেন সর্বং গ্রহীতব্যং বলান্নেতি'। 'বলান্নেতি' শব্দটি মনে রেখে যদি 'সাধনদীপিকা'-য় কৃষ্ণদাস সম্পর্কিত মন্তব্যটি পড়ি তাহলে জীবের মৃত্যুকালে কি ঘটেছিলো হয়ত তার আভাস পেতে পারি। রাধাকৃষ্ণদাস বলেছেন, 'শ্রীকৃষ্ণদাসনামা ব্রাহ্মণো গৌড়ীয়ঃ শ্রীমজ্জীব বিদ্যাধ্যয়নে শিষ্যঃ ন তু মন্ত্রশিষ্যঃ তেষাং শিষ্যাকরণাৎ। শিষ্যাকরণে প্রবৃত্তিশ্চেত্তহি শ্রীনিবাসনরোত্তমাদীনাং শিষ্যত্বং শ্রীজীবেন কথমত্যাগি। তস্মাৎ তৈস্বপ্রকটেষু স্বাধিকারচ্ছেন্না তন্মন্ত্রশিষ্যত্ব কৃষ্ণদাসেন স্বৈনৈব কৃতম।'

রাধাকৃষ্ণ দাসের কথায় যদি কিছুমাত্র সত্য থাকে তাহলে জীবের মৃত্যুর এক শত বছরের মধ্যে রাধাদামোদরের সেবাধিকার নিয়ে যে দলাদলি এবং বাদ-প্রতিবাদ চরমে উঠেছিলো তার সূচনা জীব গোস্বামীর জীবৎকালেই দেখা দিয়েছিলো। শ্রীবিলাস দাস রাধাদামোদরের অধিকারী পদ নিয়েছিলেন কিনা জানা যায় না। কৃষ্ণদাস অনেকদিন অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর গৌড় থেকে নন্দকুমার এবং রাধাবল্লভ নামে তাঁর দুই ভাইপো বৃন্দাবনে এসে রাধাদামোদরের বিষয় সম্পত্তির অধিকার নেন।[২০] *

২০. 'চৈতন্যচরিতামৃত' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজকে নিয়ে বহু গল্প সৃষ্টি হয়েছিলো। 'ভক্তিরত্নাকর-এর লেখকও কোনো কোনো গল্প বিশ্বাস করেছিলেন। যেমন, 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ নিজের প্রসঙ্গ উত্থাপনে গোপাল ভট্টের অসম্মতি। এই গল্পটির স্রষ্টা তাঁরাই যাঁরা চৈতন্যবৃক্ষশাখায় 'গোপালভট্ট এক শাখা সর্বোত্তম' প্রক্ষিপ্ত পদটির রচয়িতা। নরহরি চক্রবর্তী জানতেন না 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর রচনা গোপালভট্টের তিরোধানের পরে। গোপালভট্টের নাম না পেয়ে যাঁরা বিস্মিত হন তাঁদের জানা উচিত কৃষ্ণদাস কবিরাজ সম্প্রদায়ের ইতিহাস লেখেন নি। সম্প্রদায়ের ইতিহাসে গোপালভট্টের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ জীব গোস্বামীর কথা 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ কতটুকু? গোপালভট্টের মত জীব গোস্বামীর শিষ্যবস ছিলো না বলে প্রক্ষিপ্ত রচনা দিয়ে কেউ কৃষ্ণদাসের ত্রুটি সংশোধন করেন নি। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর একখানি মাত্র পুঁথি ছিলো, সে পুঁথিখানি গৌড়ে পাঠানো হয়েছিলো, পথে পুঁথিখানি ডাকাতে লুঠ করেছিলো, খবর পেয়ে কৃষ্ণদাস রাধাকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিলেন (মতান্তরে আত্মহত্যার উপক্রম করেছিলেন) এমন পাষাণ গলানো গল্পগুলি যাঁরা বানিয়েছিলেন তাঁরা জানেন না যে, সনাতনের প্রতি মহাপ্রভুর উপদেশ 'দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাই রে ভজনে' কৃষ্ণদাস নিজের হাতে তাঁর বইতে লিখেছিলেন। জীব গোস্বামী এবং 'চৈতন্যচরিতামৃত' নিয়েও গল্প আছে। সেগুলি তাঁদের সৃষ্টি যাঁরা কৃষ্ণদাসকে cult-এ পরিণত করে, 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর পরিচিত ভণিতার ছাপ দিয়ে এক শ্রেণীর রচনাকে বৈষ্ণব সমাজে চালাবার চেষ্টা করেছিলেন। রচনাগুলি চলে নি, গল্পগুলি চলেছিলো এবং সেগুলির সত্যমিথ্যা যাচাই করতে বিস্তর গবেষণাও হয়েছে। গল্পগুলি 'চৈতন্য-চরিতামৃত'-এর জনপ্রিয়তার দলিল, তাতে ছিঁটে ফোঁটাও সত্য নেই।

* ১ চৈত্র ১৩৮৬ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ডঃ সুকুমার সেনের সভাপতিত্বে পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি রামপ্রসাদ রায়ের নবাবিষ্কৃত কাব্য 'কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু'

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার কার্তিক-চৈত্র সংখ্যা ১৩৮৫তে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন লাহা তাঁর "রামপ্রসাদের 'দূতীসম্বাদ' ও 'উদ্ধবসম্বাদ' শীর্ষক প্রবন্ধে অষ্টাদশ শতাব্দীর এক নূতন কবি রামপ্রসাদ রায়ের কথা লিখেছিলেন।[১] তিনি ঐ কবির 'দূতীসম্বাদ' ও 'উদ্ধবসম্বাদ' নামে দুখানি পুথির সন্ধান পেয়েছিলেন বিহারের বর্তমান চাণ্ডিল থানার অন্তর্গত রসুনিয়া গ্রাম থেকে।[২] পুথি দুখানি খুবই সংক্ষিপ্ত, প্রথমখানি ১১ পৃষ্ঠার এবং দ্বিতীয় খানির মাত্র ৪ পৃষ্ঠা পাওয়া গেছে। যেটুকু পাওয়া গেছে তার থেকে লেখক ধারণা করেছেন যে কবি বিশেষ শক্তিশালী রচয়িতা। উদ্ধবসম্বাদ বর্ণনামূলক কিন্তু দূতীসম্বাদে পদসংযোগ আছে 'যথারাগঃ' এই নির্দেশ সহযোগে। তাই লেখক সিদ্ধান্ত করেছেন যে দুটি পুথির রচনারীতি বিভিন্ন।[৩] একটি পদের প্রারম্ভাংশ লেখক উদ্ধৃতও করেছেন।[৪] যেহেতু মধ্যযুগের জনৈক রামপ্রসাদ রায়ের 'কৃষ্ণলীলারস' কাব্য সম্পর্কে পণ্ডিতমহলে সংশয় ছিল[৫] তাই লেখক এমনও মনে করেছেন যে প্রাপ্ত পুথি দুটি সম্ভবতঃ রামপ্রসাদের সেই বিতর্কিত মূল কাব্যের অংশবিশেষ। তবে প্রাপ্ত ভণিতার নজীরে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে রামপ্রসাদের সেই অপ্রাপ্তপূর্ব কাব্যের প্রকৃত নাম ছিল 'কৃষ্ণলীলামৃত', 'কৃষ্ণলীলারস' নয়।[৬] বর্তমান প্রবন্ধে পূর্বোক্ত রামপ্রসাদ রায়ের বিতর্কিত কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য সম্পর্কে নূতন ও চূড়ান্ত তথ্যাদি প্রকাশের চেষ্টা করা হল।[৭] আগ্রহী পাঠক শ্রীযুক্ত লাহার উল্লিখিত প্রবন্ধটিও দেখে নিতে পারেন।

প্রথমেই বলি যে, শ্রীযুক্ত লাহার সংগৃহীত পুথি দুটি রামপ্রসাদ রায়ের বিতর্কিত মূল কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের অংশবিশেষ বলে তিনি যে অনুমান করেছিলেন তা সত্য।[৮] তবে মূল কাব্যটির নাম 'কৃষ্ণলীলারস' তো নয়ই 'কৃষ্ণলীলামৃতও' ঠিক নয়, এর পুরো নাম 'কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু'। এর রচয়িতা রামপ্রসাদ রায় ছিলেন অদ্ভুতরামায়ণরচয়িতা জগদ্রাম রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। এঁর কাব্যের সর্বাধিক ব্যবহৃত ভণিতা হল,

---

১. সা-প-প, ১৩৮৫, কার্তিক-চৈত্র সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১৫

২. ঐ, পৃষ্ঠা ঐ, পাদটীকা

৩. ঐ, পৃষ্ঠা ১৬

৪. ঐ, পৃষ্ঠা ঐ

৫. দ্রষ্টব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ঃ প্রথম খণ্ড, অপরার্ধ, শ্রীসুকুমার সেন, পৃ. ৪১৩

৬. সা-প-প, কার্তিক-চৈত্র সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১৫

৭. সম্প্রতি রামপ্রসাদ রায়ের 'কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু'র একটি প্রায় সম্পূর্ণ (মধ্যখণ্ডে ১৫ পৃষ্ঠা বাদে) পুথি বর্তমান লেখক কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছে এবং বর্তমান লেখক-রচিত এতৎসম্পর্কিত ভূমিকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গবেষণাপত্ররূপে গৃহীত হয়েছে।

৮. রামপ্রসাদ রায়ের 'কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু' কাব্য, পৃষ্ঠা ৬০

জন্মখণ্ডমত কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু।
জগদ্রামসুত গায় তারি এক বিন্দু ॥[৮]

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন লাহা 'দূতীসম্বাদ' এবং 'উদ্ধবসম্বাদ' নামক যে পুঁথি দুটি পেয়েছেন তা প্রকৃতপক্ষে রামপ্রসাদের কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু কাব্যের অন্ত্য-মথুরালীলাখণ্ডের অংশবিশেষ। মূল কাব্যে ঐ খণ্ডের ২৭৬ পৃষ্ঠা 'অথ উদ্ধবসংবাদ' শুরু হয়েছে নিম্নলিখিতভাবে ঃ—

হরিপদে নতি করি হইয়া বিদায়।
শুভক্ষণে উদ্ধব গোকুলপুরে যায় ॥

শেষ হয়েছে ২৮৫ পৃষ্ঠায় ঃ—

জন্মখণ্ডমত হেন উদ্ধবসংবাদ।
সংক্ষেপে রচনা কল্য ব্রাহ্মণ প্রসাদ ॥
সীতারাম রাধাশ্যাম অভেদ শরীরে।
খেল রামপ্রসাদের হৃদয় মন্দিরে ॥

'ইতি উদ্ধবসংবাদ' এইভাবে শেষ হয়েছে। মূল কাব্যে উদ্ধবসংবাদ হোল আগে, দূতীসম্বাদ পরে। মূল পুঁথিতে দূতীসম্বাদ বলে উল্লেখ নেই। ২৮৫ থেকে ২৯০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত চলেছে। সূচনা হোল, 'অথ রাধিকাদীনাং মাথুর বিরহ। পদ যথারাগঃ ॥' সমাপ্তি হোল ঃ—

জগততনয় প্রসাদে গায়।
মাথুর বিরহ হইল সায় ॥ ইতি মাথুর বিরহ সংপূর্ণ ॥

শ্রীযুক্ত লাহা লিখেছেন যে, উদ্ধবসংবাদ বর্ণনামূলক বা পাঠ্য এবং দূতীসম্বাদ গীতিমূলক অথবা গেয়, তাই দুটি অংশের রচনারীতি পৃথক।[৯] রামপ্রসাদের কাব্য যেহেতু স্মরণ, শ্রবণ এবং কীর্তনের ত্রিবিধ উপাদানের সমন্বয়, তাই মূল কাব্যের ব্যাপকতর পটভূমিকায় লেখকের কথা সত্য হলেও সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে যথার্থ নয়। অর্থাৎ উদ্ধবসংবাদের মধ্যেও পদাবলীর সংযোগ ঘটেছে। লেখক ভগ্নাংশ পেয়েছেন বলে ধরতে পারেন নি। এটি অবশ্য তাঁর দোষ নয়। উদ্ধবসংবাদের মাঝামাঝি ভাগবতের ভ্রমরগীতা অবলম্বনে রামপ্রসাদ রাধিকার জবানীতে কয়েকটি পদসংযোগ করেছেন। তবে দূতীসম্বাদ যেন পদাবলীর মালা, একথা সত্য।

এবারে রামপ্রসাদ রায়ের নবাবিষ্কৃত কাব্য 'কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু' ও তার কবির বিষয়ে দু'একটি কথা লিপিবদ্ধ করা সমীচীন হবে বোধ করি। পূর্বোক্ত জগদ্রাম-পুত্র রামপ্রসাদের ভিটে ছিল তৎকালীন পঞ্চকোট রাজার শাসনাধীন, আধুনিক বাঁকুড়া জেলার ভুলুই গ্রামে। জগদ্রামের এই পৈতৃক ভিটে থেকেই বর্তমান প্রবন্ধের লেখক যথাবিধ অনুসন্ধান চালিয়ে ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর-শেষে রামপ্রসাদের 'কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু' কাব্যটি উদ্ধার করেন। এই বিষয়ে তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা করেন প্রবন্ধকারের ছাত্র শ্রীমান্ ষষ্ঠীপদ রায় এবং জগৎরাম রায়ের সপ্তম বংশধর (ভ্রাতুষ্পুত্র) শ্রীযুক্ত শিবপদ রায় মহাশয়, যিনি বর্তমানে বাঁকুড়ার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। রাণীগঞ্জ শহরের বাসস্ট্যাণ্ড থেকে দক্ষিণ পূর্বে তিন মাইলের মতো দূরত্বে অবস্থিত বল্লভপুরের নদীঘাট। সেখানে দামোদর পেরিয়ে দক্ষিণতীরের মেজিয়াঘাট থেকে ভুলুই যেতে হয়। দুভাবে ভুলুই যাওয়া যায়, হয়, দামোদর পেরিয়ে নদীতীর ধরে এগিয়ে অর্ধগ্রামের ভেতর দিয়ে পায়ে হাঁটা পথে ৫ মাইলের মতো পথ পেরিয়ে ভুলুই পোঁছোনো যায়। অথবা মেজিয়াঘাট থেকে শালতোড়ের বাসে চেপে ৬ মাইলের মতো গিয়ে আবার পায়ে হাঁটা পথে ২ মাইল পথ অতিক্রম করে ভুলুই যাওয়া যায়। বর্তমান

---

৮. রামপ্রসাদ রায়ের 'কৃষ্ণলীলামৃত সিন্ধু' কাব্য, পৃষ্ঠ ৬০।
৯. সা-প-প, কার্তিক-চৈত্র সংখ্যা, ১৩৮৫ পৃষ্ঠা ১৬।

প্রবন্ধকার দুভাবেই ভুলুই গেছেন। এতদঞ্চলে জগদ্রাম-প্রতিষ্ঠিত অষ্টনায়িকা-পরিবৃত দুর্গামূর্তির পূজা উপলক্ষ্যে প্রচুর জনসমাগম হয়।

অতঃপর প্রাপ্ত পুথির বিষয়ে কিছু নিবেদন করি। 'কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধুর' এ পর্যন্ত দুখানি পুথি দেখেছি। একটি পুরুলিয়ার পুথি। এটির লিপিকার পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের তাঁতিবাজার এলাকার রাধচরণ তন্তুবায়, লিপিকাল ১২৭৯ সাল। এটি ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের (বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা-বিভাগের প্রধান) সংগ্রহ। এতে আদিলীলা এবং অন্ত্যলীলা দুটি খণ্ড আছে। প্রথম পৃষ্ঠা খণ্ডিত থাকায় সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার দুরূহ। পাতার বর্ণ ধূসর। হস্তাক্ষর বড়ো, বড়ো, ভাঙা, ভাঙা এবং ভ্রম সংশোধনের চেষ্টা স্বল্প।

অপর পুথিটি ভুলুই থেকে বর্তমান লেখক কর্তৃক আবিষ্কৃত। পুথিটি আদ্যন্ত-মধ্য-সমন্বিত। তিন খণ্ডের রচনা, আদিলীলা, মধ্যবৃন্দাবনলীলা এবং অন্ত্যলীলা। পুথিটি প্রায় সম্পূর্ণ। কেবল সূচনায় দেবদেবীবন্দনার পূর্বে চৈতন্যের স্বগুণ, নিগুর্ণ বর্ণনার প্রথম পাতাটি ঈষছিন্ন এবং কাব্যটির মধ্যখণ্ডে ১৪৮ থেকে ১৬২ এই ১৫খানি পাতা নেই। অন্ততঃ তিন প্রকারের হস্তাক্ষর পুথির মধ্যে পাওয়া যায়। পুথির পাতা হলুদ, মাঝে মাঝে এক, আধ গুচ্ছ ধূসর বর্ণের পাতার সাহায্যে স্থান পূরণ করা হয়েছে, হস্তাক্ষর সর্বত্র সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন, পাতার দুপিঠে লেখা। তোলা পাঠে সংশোধনের প্রয়াস সমধিক। লিপিকারের নাম কেনারাম রায়। আদিলীলার শেষে কোন লিপিসমাপ্তিকাল নেই। মধ্যলীলার শেষে লিপিকালে উল্লেখ আছে, ১৭৬৭ শক, লিপিকার শ্রীকেনারাম শর্মা। অন্ত্যলীলার শেষে লিপিকালর আছে, ১৭৬৯ শক, ১২৫৪ সাল, লিপিকার কেনারাম রায়। ভুলুই পুথির আদিলীলায় মূল কাব্যাংশ ১ পৃষ্ঠা থেকে ৬১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। কাব্যে ভাগবতাচার্যের মতো অধ্যায়বিভাগ নেই। কিছু কিছু পরিচ্ছেদসূচক সংখ্যা আছে। মধ্যলীলায় পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬২ থেকে ২৬৫ পর্যন্ত। অন্ত্যলীলায় ২৬৬ থেকে ৩৫৩ পর্যন্ত। আদিলীলায় শ্রীকৃষ্ণজন্মকথা থেকে নন্দ ইত্যাদি সকলের বৃন্দাবন গমন পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। মধ্যবৃন্দাবনলীলায় শ্রীরূপের অনুসরণে উজ্জ্বলরসের বিস্তারপ্রসঙ্গে দানখণ্ড, মানখণ্ডাদি লৌকিক উপাদানের চয়ন, এবং তৎসঙ্গে ভাগবত এবং ব্রহ্মবৈবর্তের প্রাসঙ্গিক বীর ও মধুররসাত্মক ঘটনার বর্ণনা। অন্ত্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণের মথুরাভ্রমণ থেকে ঘটনা শুরু হয়ে শ্রীকৃষ্ণের গোলোকনগরীতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত বিস্তৃত। এই নিয়ে কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধুর সমগ্র পুথি ৩৫৩ পৃষ্ঠার। মূল পুথির রচনাকালজ্ঞাপক পয়ারের পরিচয় নিম্নলিখিতরূপ ঃ—

রাম ভুজ মুনি চন্দ্র শক মন্বন্তরে
সিতপক্ষ মাঘে আর পঞ্চবিংশতি বাসরে ॥
ভৃগুবার আর তিথি ত্রিতিয়া সোভনে।
পূর্বভাদ্রপদ তারা সিবজোগদিনে ॥
কৃষ্ণলিলামৃতসিন্ধু গ্রন্থ সাঙ্গ হল্যা।
সাধুজন হরিধ্বনি কর সভে মেল্যা ॥[১০]

রামপ্রসাদ রায়ের কাব্যরচনার প্রেরণা স্বপ্নদর্শন ছিল না। সেদিক থেকে দেখলে রামপ্রসাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন শিল্পসচেতন লেখক। অদ্ভুতরামায়ণ এবং দুর্গাপঞ্চরাত্রি রচনায়

১০. ভুলুই পুথি, কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু, পৃষ্ঠা ৩৫৩।

তিনি পিতার সহযোগিতা করেছিলেন পিতারই আদেশে। আর বৈষ্ণব রসতত্ত্ববিশ্লেষণের একটি সুগভীর ইচ্ছা থেকেই তিনি কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু কাব্য রচনার পরিকল্পনা করেন। এ বিষয়ে তাঁর আপন স্বীকৃতি :—

সেইকালে হত্যে মোর মনে ছিল আসা।
রাধাকৃষ্ণ রসতত্ত্ব বর্ণিবারে ভাসা ॥[১১]

কাব্যে মুখ্যতঃ ব্রহ্মবৈবর্তের এবং অতিরিক্ত ভাগবতের ও শ্রীরূপ-রচিত উজ্জ্বলনীলমণির ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর প্রভাব আছে। কাহিনীতে যেমন আছে ব্রহ্মের এবং ভাগবতের অনুসরণ, তেমনি শ্রীরূপ-প্রদর্শিত পথে মধুররসবৈচিত্র্যবর্ণনায় উজ্জ্বল এবং ভক্তি থেকে প্রচুর সুললিত স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করা হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর যে কোন কবির পক্ষে এই অনুবাদকার্য শ্লাঘনীয় গণ্য হবে। বৈষ্ণব সাহিত্যের পাঠক অবগত আছেন যে শ্রীরূপের গ্রন্থ দুটি খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। জনৈক বিশেষজ্ঞের এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য মন্তব্য হোল :—

'এই গ্রন্থ সংস্কৃতভাষায় রচিত হওয়ায় সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের বোধগম্য হয় না। যাঁহারা সংস্কৃতভাষায় কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষেও এই গ্রন্থ সহজবোধ্য হয় না।'[১২] এই দুরূহ কাজ রামপ্রসাদ যে সাবলীলতায় সম্পন্ন করেছেন, তাতে পাঠক বিস্মিত হন। এতদ্বিষয়ে রামপ্রসাদের স্বীকৃতি :—

উজ্জ্বলকিরণকনা রসামৃতসিন্ধু।
এদুই গন্থের সূত্র লয়্যা বিন্দু বিন্দু ॥
কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু প্রসাদেতে গায়।
সীতারাম রাধাস্যাম রাখ রাঙা পায় ॥[১৩]

রামপ্রসাদের কাব্যে শ্রীরূপের এই প্রভাবকে খুব সংক্ষেপে কয়েকটি ধারায় ভাগ করে দেখা যেতে পারে। প্রথমতঃ শ্রীরূপের গ্রন্থদ্বয়ের বিষয়বস্তুর অনুসরণ এবং সাক্ষাৎ অনুবাদকার্যগত প্রভাব। দ্বিতীয়তঃ শ্রীরূপের গ্রন্থদ্বয়ের পরিস্থিতি অবলম্বনে কাব্যে পরিস্থিতি চয়ন এবং নূতন, নূতন পদাবলী রচনা। তৃতীয়তঃ শ্রীরূপের গ্রন্থের প্রভাবে পৌরাণিক চরিত্রের মার্জনা। স্থানে, স্থানে পীতাম্বরের রসমঞ্জরীর অনুকূল বিস্তারও রামপ্রসাদে আছে।

অবশ্য রামপ্রসাদের পাণ্ডিত্য কেবলমাত্র শ্রীরূপের প্রভাবাশ্রয়ী নয়। তাঁর পিতা জগদ্রামের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন শ্রীসুকুমার সেন মহাশয়।[১৪] রামপ্রসাদ ছিলেন পণ্ডিত পিতার পণ্ডিত পুত্র। তাঁর কাব্যে যে সব গ্রন্থানুসরণের চিহ্ন আছে, সেগুলি হোল, রামায়ণ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, উজ্জ্বলনীলমণি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং শ্রীরূপের অন্যান্য গ্রন্থ, চৈতন্যচরিতামৃত, জয়দেব, ষড়গোস্বামীদের রচনাবলী (শ্রদ্ধানিবেদন অনুযায়ী), গীতা, রাধাহৃদয় ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, ও অপরা কিছু পদাবলীকারের রচনা, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী (দুর্গাপঞ্চরাত্রির অনুবাদ স্মর্তব্য) এবং সুরদাসের সুরসাগর। এছাড়া পূর্ববর্তী কিছু কৃষ্ণলীলানুবাদকের কাব্যের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল বলে ধারণা করতে হয়। মালাধরের এবং মাধবাচার্যের সঙ্গে কোথাও কোথাও তাঁর কিছু সাদৃশ্য যেন ধরা পড়ে। কাজেই রামপ্রসাদ শুধু স্বভাবকবি ছিলেন না, তাঁর কবিত্বশক্তি ছিল অনুশীলিত।

পরিশেষে উদ্ধৃত করি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন লাহার উল্লিখিত[১৫] রামপ্রসাদের পদটির শেষাংশ।[১৬] পদটি শেষ হয়েছে নিম্নলিখিতভাবে :—

---

১১. ঐ পৃষ্ঠা ৬৩। ১২. উজ্জ্বলনীলমণির শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় কৃত অনুবাদের শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায় রচিত ভূমিকা। ১৩. কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু, পৃষ্ঠা ৯২। ১৪. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস; ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃষ্ঠা ৪১৩।

১৫. সা.প.প. ১৩৮৫, কার্তিক-চৈত্র সংখ্যা, পৃষ্ঠা, ১৬।১৭। ১৬. কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু, পৃষ্ঠা, ২৮৫।

কেন পিয়া হেন কল্য।
আবার দিগুন আগুন জাল্যে গেল ॥
সুন প্রাণসহচরি ধৈরজ ধরিতে নারি
মাধব রহিল পরবাসে।
প্রসাদ বিসাদ মনে কান্দ্যে কান্দ্যে রাধা ভনে
প্রাণ দিব গোবিন্দ উদ্দেসে ॥
হে সখি ধরিয়ে করে
তোরা কিছু না বলিহ মোরে ॥

প্রকৃতপক্ষে এই পদটিরও পরিকল্পনা উজ্জ্বলনীলমণির নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুচ্ছ-প্রভাবিত :—

প্রযাতো মাং হিত্বা যদি কঠিনচূড়ামণিরসৌ,
প্রযাতু স্বচ্ছন্দং মম সময়ধর্ম্মঃ কিল গতিঃ।
ইদং সোঢ়ুং কো বা প্রভবতি যতঃ স্বপ্নকপটা,—
দিহায়াতো বৃন্দাবনভুবি বলান্মাং রময়তি ॥[১৭]

উপসংহারে বক্তব্য যে রামপ্রসাদ যে অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন শক্তিশালী কবি ছিলেন তাই নয়। কৃষ্ণমঙ্গলরচয়িতাদের মধ্যে তাঁর রচনাকে শিল্পোৎকর্ষের বিচারে শ্রেষ্ঠ বললেও বিস্মিত হব না। আত্মপরিচয়ে রামপ্রসাদ তাঁর পিতা জগদ্রামকেই নিজের গুরু বলে স্বীকার করেছেন।[১৮] যদিও তাঁর রচনারীতি জগদ্রামের বলিষ্ঠ আত্মঘোষণার পথানুসরণ করেনি।[১৯] তার পরিবর্তে তাঁর স্টাইলকে প্রভাবিত করেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। তাঁর গ্রন্থনামেও কৃষ্ণদাসের প্রভাব সহজলক্ষ্য। কৃষ্ণদাসের গোবিন্দলীলামৃত এবং শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু নাম দুটি একত্র করেই তিনি 'কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু' নামটি পেয়েছেন। কৃষ্ণদাস যেমন চৈতন্যকথার বিবরণ দিতে গিয়ে বৈষ্ণব সাধ্যসাধনতত্ত্ব আলোচনা করেছেন, রামপ্রসাদও তেমনি কৃষ্ণকথার বিবরণপ্রসঙ্গে বৈষ্ণবরসতত্ত্ব আলোচনা করেছেন।

তাঁর বিখ্যাত পিতা জগদ্রাম রায়ের সাক্ষাৎ প্রভাবে রামপ্রসাদ সীমিত পরিচিতি লাভ করলেও পাঠকসমাজে তিনি যে একেবারে অনাদৃত হননি, ভুলুই পুথি, পুরুলিয়ার পুথি এবং শ্রীযুক্ত লাহার সংগৃহীত পৃষ্ঠাগুলির দ্বারা তা প্রমাণিত হয়। বিশেষ করে কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধুতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে যে দুশোটির মতো রামপ্রসাদের স্বরচিত পদাবলী তা কোনো অংশেই অবহেলার যোগ্য নয়। বরং কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত সংস্করণে স্থান পাবার মতো বহু পদ যে তাতে আছে, তা বোঝা যাবে রামপ্রসাদের একটি পদাবলী-সংকলন প্রকাশিত হলে। বর্তমান লেখক সেই কাজে নিযুক্ত আছেন। ঈশ্বরেচ্ছায় কাজ সম্পন্ন হলে বৈষ্ণবসাহিত্যরসপিপাসু পাঠক-সমাজে রামপ্রসাদ পুনর্বার অভিনন্দিত হবেন বলে ভরসা করি।

১৭. নবদ্বীপ হরিবোল কুটীর থেকে প্রকাশিত শ্রীমৎ হরিদাস বাবাজীকৃত উজ্জ্বলের ১ম সংস্করণ, শৃঙ্গারভেদ প্রকরণ, পৃষ্ঠা, ৩৪৫ ; ১৮. কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু, পৃষ্ঠা, ৬২। ১৯. দ্রষ্টব্য, শ্রীসুকুমার সেনের বা. সা. ই, পূর্বোক্ত সংস্করণ, অপরাধ', পৃষ্ঠা ৪১৪-৪১৫, যথা :—

বিদ্যাহীন মূর্খ বটে সে আমারে ভাল।
ঘটদ্বে পটদ্বে কাল বৃথা নাহি গেল ॥
বিষয় বিহীন আছি সে আমারে ভাল।
সাধুসঙ্গে সদালাপে পাই কিছু কাল ॥
....
এই হস্ত প্রশস্ত লিখয়ে রামলীলে।
ধন্য এই পদ রাম প্রদক্ষিণে চলে ॥ ইত্যাদি

দ্বিজ কবিচন্দ্রের রাধিকামঙ্গল প্রসঙ্গে

শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল

গত বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা (১৩৮৬) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন লাহা মহাশয়ের 'দ্বিজ কবিচন্দ্রের রাধিকামঙ্গল' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, প্রাচীন সাহিত্যরসিক ব্যক্তিমাত্রই এতে খুশি হবেন সন্দেহ নেই। কিন্তু ঐ প্রবন্ধ সম্পর্কে আমাদের যৎসামান্য বক্তব্য আছে। লাহা মহাশয় একখানি খণ্ডিত পুঁথি অবলম্বন করে প্রবন্ধটি লিখেছেন এবং ঐ পুঁথির প্রথম চারিপত্র (অর্থাৎ ৮ পৃষ্ঠা) না থাকায় বলেছেন—'পূর্ববর্তী কাহিনী অনুমানগম্য'। কিন্তু কেবল পশ্চিমবঙ্গেই দ্বিজ কবিচন্দ্রের রাধিকামঙ্গল বা কলঙ্ক ভঞ্জন পালার ন্যূনাধিক ৭০ খানি সম্পূর্ণ পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায় ('বাংলা পুঁথির তালিকা সমন্বয়' ১ম খণ্ড পৃ ২৬-২৭, ২৪১), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেই প্রায় ২০ খানা সম্পূর্ণ পুঁথি আছে (বাংলা পুঁথির বিবরণ ১ম ভাগ পৃ. ৫৫-৫৬, ৫৮)। লাহা মহাশয় দুচারখানি পুঁথি ব্যবহার করলেই রাধিকামঙ্গলের সম্পূর্ণ কাহিনী পেতেন, এ সম্পর্কে তাঁর মতামত গঠনে সহয়তা হত এবং সুষ্ঠু পাঠও তিনি দিতে পারতেন।

মৎ-সংগৃহীত একখানি পুঁথি থেকে উপরোক্ত খণ্ডিতাংশের কাহিনীটুকু পূরণ করা গেল। বক্তা শুকদেব; শ্রোতা পরীক্ষিৎ। একদিন যশোদা কৃষ্ণকে ক্ষীরননী খাইয়ে গৃহকাজে গেলেন। আঙ্গিনাতে কৃষ্ণ খেলা করতে লাগল। গোপীরা যুক্তি করল, চল, আমরা শ্রীনন্দনন্দনকে দেখে আসি। কেউ আপত্তি তুলল, কৃষ্ণ বড়ই অবোধ, 'বস্ত্র ধরি করে টানাটানি'। কিন্তু সে-আপত্তি টিকল না। রাধিকাদি গোপীরা কৃষ্ণের কাছে গেল। কৃষ্ণ এক গোপীর বসন ধরে টানতে লাগল। কিছুতেই ছাড়াতে না পেরে গোপী যশোদাকে ডাকল। যশোদা এসেও কৃষ্ণকে নিবৃত্ত করতে পারলেন না। কৃষ্ণ কাঁদতে কাঁদতে বলল, গোপী আমার গেঁড়ু চুরি করেছে। যশোদা বললেন, আমি গেঁড়ু দিলাম না তুই কোথায় পেলি? কৃষ্ণ বলল,বলাইদা দিয়েছে। গোপী শপথ করে বলল, আমি গেঁড়ু নিইনি। এই বলে কাপড় ঝেড়ে দেখাতে লাগল। 'বিবস্ত্র হইতে নাচে নন্দের নন্দন।' কৃষ্ণ বলল, গোপীর কাচলির ভেতর গেঁড়ু আছে। গোপী রেগে গিয়ে বলল, গেড়ু কোথায় আছে, তুই বার কর। কৃষ্ণ কাচলি ধরে টানাটানি করতে লাগল। তখন সত্যিই একটা সোনার গেঁড়ু মাটিতে পড়ে গেল।

নন্দ ঘোষ একমনে ইষ্টদেব দামোদরের পূজা করছেন। কৃষ্ণ রত্নসিংহাসন থেকে বিগ্রহ সরিয়ে নিজেই তার ওপর বসে পড়লেন। নন্দঘোষ বললেন, আমার সর্বনাশ হল। যশোদার পরামর্শে নন্দ পুত্রেরই পূজা করলেন। 'আচম্বিতে চতুর্ভুজ হইল তখন'। নন্দ যশোদা দুজনেই পুত্রকে প্রণাম করলেন। এদিকে দামোদর পূর্ববৎ রত্নসিংহাসনে বিরাজিত! গোপদম্পতি যেন এক স্বপ্ন দেখে উঠলেন।

যশোদা কৃষ্ণকে ঘুম পাড়িয়ে যমুনায় জল আনতে গেলেন। নিদ্রাভঙ্গে কৃষ্ণ গোপীদের ভবনে গেল। গোপীরা হাততালি দিয়ে কৃষ্ণকে নাচাতে লাগল। জল নিয়ে ফেরার পথে গোপীদের কলরব শুনে যশোদা সেখানে গিয়ে দেখেন, তারা কৃষ্ণকে নাচাচ্ছে। যশোদা রাগত স্বরে বললেন, কৃষ্ণ ঘুমুচ্ছিল, তোরা তাকে তুলে আনলি? তারাও পালটা বলল, তোমার

ছেলে ঘুমুচ্ছে দেখ গে। যশোদা বাড়ি ফিরে দেখেন, সত্যিই তাঁর ছেলে 'ইন্দোলা'য় শুয়ে আছে। কলসি রেখে গোপীদের কাছে ছুটে এসে শুধালেন; এ ছেলে তোরা কোথায় পেলি ? এ ছেলেকে আমি ঘরে নিয়ে যাব। একসঙ্গে ওদের দুটিকে দেখার আমার বড়ই সাধ। এখান থেকে সেই ছেলে নিয়ে তিনি ঘরে গেলেন, ঘরের সেই ছেলেটি কিন্তু তখন আর নেই। এরপর কাহিনীর জন্য লাহা মহাশয়ের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। মাখনলাল মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কবিচন্দ্রের 'ভাগবতামৃতে' রাধিকার কলঙ্ক ভঞ্জন পালাটি সম্পূর্ণই মুদ্রিত হয়েছে (পৃ. ১৭০-৭৬)।

লাহা মহাশয় লিখেছেন—"রাধিকামঙ্গল এবং গোবিন্দমঙ্গল দুটি পৃথক কাব্য বলেই আমাদের ধারণা।" এর পক্ষে তাঁর যুক্তি "রাধিকামঙ্গল কাব্যের প্রাপ্ত পুঁথির চব্বিশটি পৃষ্ঠাতে কুত্রাপি গোবিন্দমঙ্গলের নাম উচ্চারণ করা হয়নি।" আমার সংগৃহীত উক্ত পুঁথি থেকে দুটিমাত্র ভণিতা উদ্ধৃত হল।

শুনরে ভকত ভাই করি নিবেদন।
ভাগবতামৃত দ্বিজ কবিচন্দ্র গান ॥ ৩ক পত্র
একমনে পরীক্ষিৎ করএ শ্রবণ।
গোবিন্দমঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্র গান ॥ ৪খ পত্র

গোবিন্দমঙ্গলে যেমন বহু পালার সমাবেশ দেখা যায়, রাধিকামঙ্গলে তেমনি কলঙ্ক ভঞ্জন ছাড়া আর কোন্ পালা পাওয়া যায় ?

লাহা মহাশয়ের উদ্ধৃত পাঠের সঙ্গে আমার পুঁথির দুএকটি পাঠের তুলনা করছি। প্রথম পাঠটি তাঁর পুঁথির, দ্বিতীয় পাঠটি আমার।

১ম—কালিন্দীর কূলে যেন সোসব কুম্ভ হেলে।
২য়—কালিন্দীর জলে যেন স্বর্ণ কুম্ভ দোলে। ৪খ
১ম—ভাবগ্রাহী জনার্দন বাধা কল্পতরু।
২য়—ভাবগ্রাহী জনার্দন বাঞ্ছাকল্পতরু। ৫খ
১ম—নন্দের সর্বস্ব পাই উঠ বাছা কানাঞি
বাধানিতে ডাকেন তুমার বাপ।
২য়—উঠ বাছা কানাঞি নন্দের নিকট যাই
বাথানেতে ডাকে তোর বাপ। ৭ক ইত্যাদি

'হাত' থেকে 'হাথ', না প্রাকৃত 'হত্থ' থেকে 'হাথ' সে-বিচার ভাষাতাত্ত্বিকরাই করুন।

লাহা মহাশয়ের মত পণ্ডিত ব্যক্তি প্রাচীন পুঁথির আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন, এটা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁকে আরো সজাগ দৃষ্টি রেখে পুঁথির গভীরে প্রবেশ করতে অনুরোধ করি।

পরিষৎ-সংবাদ

বিশেষ অধিবেশন :

(ক) বৈষ্ণবাচার্য রাধাগোবিন্দ নাথ স্মারক বক্তৃতা :

গত ২০ ও ২১ বৈশাখ, ১৩৮৭ (৩ ও ৪ মে, ১৯৮০) শনিবার ও রবিবার পরিষৎ ভবনে অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী দুই দিন ধরিয়া 'মধ্যযুগের আলোছায়ায় দেবমানব শ্রীচৈতন্য' শীর্ষক লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। দুই দিনই সভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য। প্রথম দিনে সভার প্রারম্ভে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী এবং দ্বিতীয় দিন সম্পাদক শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস, স্বাগত ভাষণ দেন।

সভাপতি দ্বিতীয় দিন বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মের মহিমা ব্যাখ্যানে বক্তার অনুভূতিলব্ধ সত্য প্রকাশকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন বক্তা আপন মনন ও অনুভূতির যে প্রকাশ তাহার প্রবন্ধে ঘটাইয়াছেন তাহা শ্রীচৈতন্যচর্চার ক্ষেত্রে অমূল্য সম্পদ হইয়া থাকিবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আসাম বঙ্গ যোগী সম্মেলন এই বক্তৃতামালার জন্য দশ হাজার টাকার একটী স্থায়ী তহবিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে গঠন করিয়াছেন।

(খ) রামকমল সিংহ স্মারক বক্তৃতা :

গত ১৭ এবং ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৭ (৩১ মে ও ১লা জুন, ১৯৮০) শনিবার ও রবিবার শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত "গিরীশোত্তর যুগে নাট্য প্রয়োগ" সম্পর্কে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। দুই দিনই সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য।

প্রথম দিনের সভার প্রারম্ভে সম্পাদক শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে স্বাগত সম্ভাষণ জানান। রামকমল সিংহ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জন্য কি পরিমাণ সহায়তা করিয়াছিলেন তাহা তিনি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন।

(গ) রামলাল হালদার ও হরিপ্রিয়া দেবী স্মারক বক্তৃতা :

গত ২৮ ও ২৯শে আষাঢ়, ১৩৮৭ (১২ ও ১৩ই জুলাই, ১৯৮০) শনিবার ও রবিবার পরিষদভবনে শ্রীজগদীশনারায়ণ সরকার "মধ্যযুগীয় বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্বন্ধ" শীর্ষক লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রথম দিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয় দিনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য।

সাহিত্যিক হরনাথ ঘোষ পদক প্রদান :

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আট হাজার টাকার একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করিয়াছেন। এই টাকার প্রাপ্ত সুদ হইতে প্রতি বৎসর যে কোন ভারতীয় ভাষার খ্যাতনামা সাহিত্যিককে স্বর্ণখচিত পদক দেওয়া হইবে। ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৭ তারিখে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে কার্যনির্বাহক সমিতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন বর্তমান বর্ষে বঙ্গসাহিত্যের প্রথিতযশা কবি ও সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রকে সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে সাহিত্যিক হরনাথ ঘোষ পদক প্রদান করা হইবে।

নির্মলকুমার বসুর চিত্র প্রতিষ্ঠা :

গত ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৭ (১৪ জুন, ১৯৮০) শনিবার পরিষদ ভবনে নির্মলকুমার বসুর চিত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য। সম্পাদক শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস সাহিত্য পরিষদের জন্য নির্মলকুমার বসুর আত্মোৎসর্গের কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন।

ভারত সরকারের শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টার পরিষৎ পরিদর্শন :

ভারত সরকারের শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা ডঃ কপিলা বাৎস্যায়ন ৫ই আষাঢ়, ১৩৮৭ (১৯ জুন, ১৯৮০) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পরিদর্শনে আসেন। তিনি পরিষদের সমস্ত বিভাগগুলি বিশেষ আগ্রহ সহকারে দেখেন। চিত্রশালা এবং পুঁথিশালার পুঁথিগুলি পরীক্ষার জন্য তিনি বিশেষজ্ঞ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। মিউজিয়াম সম্পর্কেও তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন বলিয়া জানান। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য তিনি আন্তরিক সহযোগিতা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন।

সাহিত্য পরিষদে দান :

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত বর্তমান বর্ষে রামকমল সিংহ স্মারক বক্তৃতা দিয়া সম্মানদক্ষিণা বাবদ যে পাঁচশত টাকা পাইয়াছিলেন তাহা তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন। কার্যনির্বাহক সমিতি ধন্যবাদের সঙ্গে তাঁহার দান গ্রহণ করিয়াছেন এবং উক্ত অর্থ দুঃস্থ সাহিত্যিক তহবিলে রাখিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন।

শাখা সংবাদ :

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বর্ধমান শাখা একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ঐ পত্রিকার ৪র্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা আষাঢ়, ১৩৮৭ পত্রিকা আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। পত্রিকাটিতে অনেক উল্লেখযোগ্য রচনা আছে।

পত্রিকা প্রসঙ্গ :

১৩৮৬ বঙ্গাব্দের ১ম সংখ্যা সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত 'দ্বিজ কবিচন্দ্রের রাধিকামঙ্গল' প্রসঙ্গে শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল পত্রিকাধ্যক্ষকে একটি পত্র দিয়াছেন। তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া পৃথক রচনা হিসাবে মুদ্রিত করা হইল।

★

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

১ম খণ্ড : টা. ২০'০০

২য় খণ্ড : টা. ৩০'০০

বাংলা সাময়িক পত্র

১ম খণ্ড : টা. ১১'০০

২য় খণ্ড : টা. ৯'০০

গিরিন্দ্রশেখর বসু প্রণীত

[শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে]

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস, সম্পাদক : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-কর্তৃক প্রকাশিত ও
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স, ৫৭এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা-৬ হইতে
শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

৮৭ বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা
শ্রাবণ-আশ্বিন
১৩৮৭

পত্রিকাধ্যক্ষ
শ্রীসরোজমোহন মিত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩/১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

৮৭ বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা
শ্রাবণ-আশ্বিন
১৩৮৭

পত্রিকাধ্যক্ষ
শ্রীসরোজমোহন মিত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩/১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

॥ সূচীপত্র ॥

গিরিশোত্তর যুগে নাট্য প্রয়োগ ॥	শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত	১
বিদ্যাপতির ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিনী ॥	শ্রীসুজিৎ চৌধুরী	২১
কয়েকটি স্বল্প প্রচলিত বাঙ্গালী পদবী ॥	শ্রীমৃত্যুঞ্জয় সুরাই	২৬
হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর জন্মতারিখ সম্বন্ধে ॥	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী	৩১
৮৬ বর্ষ কার্যনির্বাহক সমিতির সম্পাদকীয় বিবরণী ॥		৩৩
৮৬ বর্ষের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভার বিবরণী ॥		৩৯
পরিষৎ সংবাদ		৪২

সুসম্পাদিত ও প্রামাণ্য গ্রন্থাবলী

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস

সম্পাদিত

রামমোহন গ্রন্থাবলী

[এক খণ্ডে সুদৃশ্য রেক্সিনে বাঁধাই] ৩৫·০০

ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী

[এক খণ্ডে সুদৃশ্য রেক্সিনে বাঁধাই] ২২·০০

মধুসূদন গ্রন্থাবলী

[এক খণ্ডে সুদৃশ্য রেক্সিনে বাঁধাই] ৪০·০০

দীনবন্ধু গ্রন্থাবলী

[দুই খণ্ডে সুদৃশ্য রেক্সিনে বাঁধাই] ৩৫·০০

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (চণ্ডীদাস)

[বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত] ৩০·০০

রামেন্দ্র রচনাবলী

[ছয় খণ্ডে কাগজে বাঁধাই] ১২০·০০

রামেশ্বর রচনাবলী

ডক্টর পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত

[সুদৃশ্য রেক্সিনে বাঁধাই] ৩৫·০০

গিরিশোত্তর যুগে নাট্য-প্রয়োগ

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

প্রাচীন ভারতে নাট্যশাস্ত্র নিয়ে যে প্রচুর গবেষণা ও আলোচনা হয়েছে, তেমনতর গবেষণা পৃথিবীর আর কোথাও হয়েছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু কালের কবলে সেই প্রধান নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের কথা আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি। বর্তমানে অ্যারিস্টটলকে আমরা প্রধান নাট্যশাস্ত্র-কাররূপে স্থান দিয়ে থাকি। কিন্তু অ্যারিস্টটল নাট্যতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করলেও, নাট্য-প্রয়োগতত্ত্ব নিয়ে কোন আলোচনা করেননি। কিন্তু ভরত নাট্যতত্ত্ব ও নাট্য-প্রয়োগতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। "চক্রে যস্য প্রয়োগং মুনিরুপি-ভরতঃ"। তিনি নিজেই প্রয়োগ-প্রধান রূপে নিজের পরিচয় দিয়েছেন।

বর্তমানে অনেকের ধারণা, নাট্য-প্রয়োগ সম্পর্কে বরাবরই আমাদের সচেতনতার অভাব ছিল। কিন্তু এ ধারণা ভুল। ভরত প্রয়োগতত্ত্ব নিয়ে প্রচুর আলোচনা করেছেন। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাটকের রূপরীতির যেমন পরিবর্তন হয়, তেমনি নাট্য-প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তার পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ে। হিন্দুরাজত্বে নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে সুযোগ ছিল, মুসলমান রাজত্বে সে সুযোগ ছিল না। ফলে, সুদীর্ঘকাল প্রাচীন ভারতের নাট্যশাস্ত্র অবহেলিত ছিল। নাট্য-চর্চার কোন অবকাশ ছিল না। তথাপি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নাট্যাভিনয়ের সম্পর্কে যে সকল তথ্য পাওয়া যায়, তন্মধ্যে চৈতন্যভাগবতে উল্লিখিত শ্রীচৈতন্য-দেবের নাট্যাভিনয়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে লোকশিক্ষার আসর বসিয়েছিলেন। "রুক্মিণী হরণ সংবাদ পালা"-র অভিনয় সম্পর্কে যে বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে দেখা যায়—"

> "একদিন প্রভু বলিলেন সবা 'স্থানে।
> আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের বিধানে ॥
> সদাশিববুদ্ধিমন্ত খানেরে ডাকিয়া।
> বলিলেন প্রভু 'কাচ সজ্জ কর' গিয়া ॥
> শংখ, কাঁচুলী পাটসাড়ী অলঙ্কার।
> যোগ্য যোগ্য করি সজ্জ কর' সবাকার ॥
> গদাধর কাচিবেন—রুক্মিণীর কাচ।
> ব্রহ্মানন্দ তাঁরবুড়ি—সখী সুপ্রভাত ॥
> নিত্যানন্দ হইবেন বড়াই আমার।
> কোতোয়াল হরিদাস—জাগাইতে ভার ॥
> শ্রীবাস নারদ-কাচ স্নাতক শ্রীরাম।

"দাঁড়িয়া হাড়ি মুঞি" বোলয়ে শ্রীমান্ ॥
অদ্বৈত বোলয়ে "কে করিবে পাত্র-কাচ ?"
প্রভু বোলে "পাত্র সিংহাসনে গোপীনাথ ॥
সত্বরে চলহ বুদ্ধিমন্তখান ! তুমি ।
কাচ-সজ্জা কর গিয়া, নাচিবাঙ আমি ॥"
আজ্ঞা শিরে করি সদাশিব-বুদ্ধিমন্ত ।
গৃহে চলিলেন, আনন্দের নাহি অন্ত ॥
সেইক্ষণে কথিবার চান্দোয়া কাটিয়া ।
কাচ-সজ্জা করিলেন সুছন্দ করিয়া ॥
লইয়া যতেক কাচ বুদ্ধিমন্তখান ।
থুইলেন লইয়া ঠাকুর-বিদ্যমান ॥"*

এর দ্বারা বোঝা যায় যে মহাপ্রভু নাটকীয় চরিত্রলিপি এমনভাবে বণ্টন করেছিলেন, যে অভিনেতার চেহারার সঙ্গে চরিত্রগত সামঞ্জস্য ছিল। রূপসজ্জা ও সাজসজ্জা যথাযোগ্য ব্যবহার করা হয়েছিল। এমন কি স্ত্রীভূমিকা যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা কাঁচুলী ব্যবহার করেছিলেন। অনুমান করা যেতে পারে, সে-যুগে সাধ্যের মধ্যে যা ছিল, তা দিয়ে অভিনয়-শিল্পীদের যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবে সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। এমন কি শ্রীরামপণ্ডিতের অনুজ শ্রীমন্ পণ্ডিত, অভিনয় না করলেও আসরকে আলোকিত করার কাজে মশালচীরূপে, নিযুক্ত হয়েছিলেন। চৈতন্যদেবের আমলে এই আসর-অভিনয়ে কিছু কিছু প্রয়োগ কর্মের নিদর্শন মেলে।

আমাদের দেশে বহু প্রাচীনকাল থেকে অভিনয়শিল্পকে লোকশিল্পরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষ্ণযাত্রা, মনসার ভাসান প্রভৃতি সঙ্গীতবহুল লোক-নাট্যাভিনয়ে সাজসজ্জা ও রূপ-সজ্জা করা হোত।

১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে রাশিয়ান নাট্য-প্রেমিক লেভেডেব দুটি ইংরেজী নাটক গোলক দাসের সহায়তায় বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে, কলকাতার ডোমটুলীতে দুইরাত্রি অস্থায়ী মঞ্চ বেঁধে অভিনয় করান। এই নাটক দুইটিতে স্ত্রী-ভূমিকায় লেভেডেব মহিলাদের দ্বারাই অভিনয় করান। বলা যেতে পারে, লেভেডেবের এটি একটি বিপ্লবাত্মক ভূমিকা। যদিও মেয়েরা ঢপকীর্তন বা খেমটা গান বা বাঈ নাচের আসরে অবতীর্ণ হতেন, কিন্তু পুরুষদের সঙ্গে একত্রে অভিনয়শিল্পী-রূপে কেউই অভিনয় করেননি। মঞ্চে বাংলা নাটকের আবির্ভাব কাল থেকে মেয়েদের নিয়ে অভিনয় শুরু হয়েছিল একথা বললে ভুল বলা হবে না।

১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দের পর দীর্ঘকাল মঞ্চ বেঁধে বাংলা নাটকের আর অভিনয় হয়নি। এরপর উল্লেখযোগ্য নাট্যাভিনয় জয়রাম বসাকের বাড়ি রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটক।

১৮৫৭-১৮৭১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতার বিভিন্ন ধনীর গৃহে ইংরেজদের অনুকরণে অস্থায়ী মঞ্চ বেঁধে যে নাটকগুলির অভিনয় হয়, বলা যেতে পারে, সেগুলি বাংলা নাটককে মঞ্চে উপস্থাপিত করার প্রথম প্রয়াস।

ইংরেজ রাজত্বকালে নাট্যচর্চার যে সুযোগ পাওয়া যায়, তা ইংরেজদের নাট্যরীতির

*শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সং, ১৮শ অধ্যায়, পৃঃ ২৮২-৮৩।

অনুসরণ ও অনুকরণেই গড়ে ওঠে। আমাদের আজকের এই যে মঞ্চ, নাটক ও নাট্যাভিনয়, এর সবকিছুর মূলে ইংরেজী প্রভাব। ১৮৭২ সালে বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চ এই প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে জন্মলাভ করে। এমন কি নাটকের পাত্র পাত্রীগণের বেশভূষাতে তার প্রভাব পড়ে। এখন গিরিশোত্তর যুগে নাট্যপ্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে গিরিশযুগে অথবা নাট্যশালার গোড়ার যুগে নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোত, সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা দরকার। সে যুগে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের যিনি নাট্য শিক্ষা দিতেন, তাঁকে সাধারণতঃ নাট্যশিক্ষক বা motion-master বলা হোত। যিনি সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন, তিনি সঙ্গীতশিক্ষক বা opera master বলে অভিহিত হতেন। এ ছাড়া নৃত্য শিক্ষক, দৃশ্যপট রচনাকারী, বেশকার, রূপসজ্জাকর প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের কিছু কর্মী ছিলেন।

সে যুগে, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকই বেশি মঞ্চস্থ হোত। এছাড়া মধ্যে মধ্যে সামাজিক, নৃত্য-গীতধর্মী opera নাটক ও প্রহসন অভিনীত হোত। মূলতঃ সেদিন অভিনয়ের শিক্ষাদানের উপর যতটা যত্ন নেওয়া হোত, নাটকের সামগ্রিক পরিবেশ সৃষ্টির প্রতি ততটা যত্ন নেওয়া হোত না। অভিনয়টাই সেদিন ছিল মুখ্য। ঐকতান বাদনের দ্বারা দর্শককে নাট্যকর্মের ঐক্য সম্পর্কে সচেতন করার যে চেষ্টা করা হোত, সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যেত নাটকের বিভিন্ন বিভাগের কর্মের মধ্যে সে ঐক্য রক্ষিত হোত না। তার কারণ অবশ্য ছিল অনেক। আজকের মতন নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে সেদিন এত সুযোগ-সুবিধা ছিল না। Make-up materials অর্থাৎ রূপসজ্জা করার জন্য আজকের মত এত রং-তুলি ছিল না। পরচুলা বা wig আজকের মত এত স্বাভাবিকভাবে তৈরি করা যেত না। দৃশ্যপট সাধারণতঃ পর্দার গায়ে আঁকা থাকতো—সেগুলি এমনভাবে অঙ্কিত হোত যাতে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রে ঐ একই দৃশ্যপট ব্যবহার করা যেতে পারে। শিল্পি-গণের আগমন ও নির্গমনের পথ ছিল—দুপাশের wings। বেশভূষাও ভেলভেটের উপর সলমা-চুমকি দিয়ে জমকালো করা হোত। পোশাকের সঙ্গে নাটকীয় চরিত্রগত সামঞ্জস্য রক্ষিত হোত না। এ সম্পর্কে স্বর্গগত মনোমোহন গোস্বামী আলোচনা প্রসঙ্গে এক জায়গায় বলেছেন ঃ "সাধারণতঃ তিন প্রকারের পোষাক থিয়েটারে প্রচলিত, যথা, মিলিটারী, রয়েল মিলিটারী ও জোড়া, এবং সখীসাট, পেশোয়াজ স্যুট ও শাড়ি। শিরস্ত্রাণের মধ্যে পাগড়ি, মোড়েশা এবং কেশের মধ্যে বাবরি ও কার্লিং। আবার সে সব পোষাকের ছাট—না হিন্দু, না মুসলমান, না পাঠান, না খ্রীস্টান, না য়িহুদী, না কিছু। বাঙ্গালী হোক, বিহারী হোক, রাঠোর হোক, চৌহান হোক, জাঠ হোক, শিখ হোক, মারাঠা হোক, মাদ্রাজী হোক,—সব এক পোষাক। সেই ফুল স্টকিং, হ্যাফপ্যান্ট, মিলিটারী কোট, তায় চুমকির শ্রাদ্ধ। মাথায় বাবরি বা কার্লিং। তদুপরি পাগড়ি, গলায় মুক্তোর মালা, কটিতে তরবারি; বৃদ্ধ হইলে ফুলপ্যান্ট এবং জোড়া। আর মোগল হোক, পাঠান হোক, তুর্কি আরবী হোক, পারসী হোক, আফগান হোক—সবই সেই শুদ্ধ মস্তকে পাগড়ির বদলে একটি মোড়েশা।

মন্ত্রীরা উজীর হইলেই সাদা জোড়া ও সাদা ফুল প্যান্ট, সভাসদ হইলেই রঙ্গিন সাদা পোষাক এবং দূত বা সৈন্য হইলেই খাকি যেন মার্কা করা থাকে। তাহার কিছুতেই অন্যথা হইবার যো নেই। অভিনেত্রীর পক্ষে আরও চমৎকার। হিন্দু হোক, মুসলমান হোক সখী সাজিলেই তাহার পোষাক একপ্রকার, Heroine অন্যবিধ এবং বয়স্কা রাণী

হইলেই তিনি বেনারসী বা পার্শী কাপড় (অবশ্য বাঙ্গালীর ন্যায়) পরিতে বাধ্য। কাহারও সাধ্য কি যে হাতে প্রোগ্রাম না থাকিলে বলিতে পারি যে ইহারা কোন জাতি ?

আজ যে অভিনেতাকে যে পরিচ্ছদে শ্রীরামচন্দ্র দেখিলাম, কল্য তাঁহাকে সেই সজ্জায় জাহাঙ্গীর এবং পরশ্ব সেই মূর্তিকেই সেইভাবে যশোবন্ত সিং দেখিলাম। অভিনেতার তবু শিরস্ত্রাণ এবং কেশাদির একটু পার্থক্য থাকে, কিন্তু অভিনেত্রী একই ভাবে—একই সজ্জায় সীতা, নূরজাহান ও সংযুক্তার ভূমিকা অভিনয় করিয়া থাকেন। কিন্তু সকলকে টেক্কা দেন সখী সম্প্রদায়, সেই বুকের উপর কল্কা দেওয়া—না পেশোয়াজ না কিছু সেই অদ্ভুত সখীসুট নামধারী পোষাক কাহার অজ্ঞাত ? ঘটনাস্থল ভারতই হোক, পারস্যই হোক, তুরস্কই হোক, আর অধুনাতন নাট্যকারের গ্রীস-ইতালীই হোক—সেই এক পোষাক—মাথায় বিড, পশ্চাতে রাঙ্কিকা টেল এবং সেই (যে রঙেরই হোক না কেন) সখীসুট।

পোষাক-পরিচ্ছদের স্বাভাবিকত্ব আপনারা চান না—চান শুদ্ধ জাঁকজমক, শুদ্ধ সলমা-চুমকির শ্রাদ্ধ—আর চান বিলাতি ছাঁচে ঢালা পোষাকের design। Hero হইলেই তাহাকে ঝকমকে High lander সাজিতে হয় না, একথা কখনও একবারও ভাবিয়াছেন কি ? তা যদি ভাবিতেন, তাহা হইলে আমাদিগকে কখন একটা জমকাল গোছ সঙ্ সাজিয়া, আপনাদের করতালির চটপট্ ধ্বনি সহ্য করিতে হইত না। ···ক্লাসিক থিয়েটারে যখন প্রথম 'ভ্রান্তি' অভিনীত হয়, তখন নটগুরু গিরিশচন্দ্র অনেক অধ্যবসায়ে সপ্তদশ শতাব্দীর রাজসাহী জেলার পোষাক পরিচ্ছদে অভিনেতা অভিনেত্রীদের সজ্জিত করেন। এমনকি অভিনেত্রীগণের বেণীবন্ধনেও সেই বিশেষত্ব রক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু আপনাদের তো মনে ধরে নাই। আপনারা তখন সাজসজ্জার নিন্দা করিয়াছেন।

··· বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে কোন নূতন নাটকের পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিবার সময় ভূমিকার দিকে কর্তৃপক্ষের আদৌ লক্ষ্য থাকে না। তাঁহারা দেখেন, ভূমিকা গ্রহণ করিবেন কে ? সেই লোকের উপযুক্ত পোষাক-পরিচ্ছদ প্রস্তুত হয়।

··· রাজসভাতেই বসি বা বনেই থাকি, খাইতেই বসি আর শুইতেই যাই, যুদ্ধই করি বা প্রেমালাপই করি, সেই কটীতটে পীতধড়া, মস্তকে মোহনচূড়া সর্বদাই আপনাদের নয়নপথে উদিত হইবে। অনেক heroকে তলোয়ার এঁটে, টুপি পরে নিদ্রা যেতে দেখেছি। কিন্তু কখন কোন দর্শককে তদ্বিরুদ্ধে একটি কথা কহিতেও শুনি নাই।···

সভাসদ, দূত এবং সৈন্য সাজিতে হইলেই আমরা যত রদ্দি লোক এবং রদ্দি পোষাক বাহির করি। যেন তাহারা আমাদের বাটীর সাধারণ ভৃত্য অপেক্ষাও জঘন্য।

···অনেক ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, যাহা অতি সহজে নিবারিত হইতে পারে। যথা বাঙালীভাবে পারসী বা বেনারসী বস্ত্র পরিধান করিয়া রাজপুত রাণী বা তুরস্কের বেগম সাজা, কিংবা (সম্প্রতি কোন রঙ্গালয়ে দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়াছি) কালাপেড়ে ধুতি ও চুড়িদার আস্তিনে অঙ্গ শোভিত করিয়া আকবর সার দরবারে হাজির হওয়া বা ফেরিওয়ালীর বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া রাস্তার উপর নৃত্য করা। ··· কিন্তু অভিনেত্রীবর্গ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সফেদা সিন্দুরের খরচ যোগাইতে আমাদিগকে অস্থির হইতে হয়। দুই একটি অভিনেত্রী ব্যতীত কেহই স্বাভাবিক বর্ণের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিতে জানে না। প্রায় সকলেই কতকগুলো রঙ চাপড়ে বর্ণটাকে অস্বাভাবিক ও কদর্য করিয়া ফেলে। তাহার উপর জোড়া ভুরু, পাতাকাটা চুল

ও এক আঙ্গুল কপাল সকলকেই করিতে হইবে,—নহিলে সে মহাপাতক হইবে।" (কলাবিদ্যার বিপর্যয়—মনোমোহন গোস্বামী, নাট্যমন্দির, ১৩১৮-১৯)।

নট ও নাট্যকার মনোমোহন গোস্বামী মহাশয়ের নিবন্ধ থেকে জানা যায়, সে যুগের বেশভূষা, রূপসজ্জা এবং নাটকের সামগ্রিক পরিবেশ সৃষ্টির পক্ষে যথাযোগ্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার দিকে লক্ষ্য ছিল না। গোস্বামী মহাশয়ের মতে হয়তো অনেকেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও অস্বাভাবিক দৃশ্য ও রূপসজ্জার প্রতি ঔদাসীন্য দেখিয়েছেন, তার প্রথম এবং প্রধান কারণ সেদিনের দর্শকদের রুচি অনুযায়ী চাহিদা মেটানোর তাগিদে। শোনা যায় ইংরেজদের থিয়েটারের প্রথম যুগে এমনতর বহু ঘটনা ইচ্ছাকৃত ভাবেই ওঁদেরও ঘটাতে হয়েছে। যাই হোক বাংলা নাট্যশালার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, রূপসজ্জা, দৃশ্যসজ্জা, ও বেশভূষারও কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। ১৩০৮ সালের ২৬শে পৌষ, ১ম বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা 'সাপ্তাহিক রঙ্গালয়' পত্রিকায় 'বর্তমান রঙ্গভূমি' নামক প্রবন্ধের একজায়গায় লেখা হয়েছে—"যাহারা অভিনয় করিবে, তাহারা সে সব চরিত্র বোঝে না, বরের সজ্জা পরিয়া সমস্ত জগতের রাজা আবির্ভূত হন। রাজমুকুট, রাজঅলংকার কুমারটুলী হইতে আইসে। রাজার ন্যায় চলিতে জানে না, বলিতে জানে না। বিরক্তি প্রকাশ করিতে যাইলে, অভিনেতা গোঁয়ারের ন্যায় চিৎকার করে। বহুদিন হইতে এইরূপ চিৎকার শুনিয়া দর্শকও তাহা বীররস ভাবিয়া—'excellent' করিয়া ওঠেন। একখানি রাজসভা বহুদিন হইতে চিত্রিত হইয়া আছে। সমস্ত পৃথিবীর রাজা সেই সভায় আসিয়া উপস্থিত হন। পটো জানে না—রাজবাড়ী কিরূপ, পরচুলাওয়ালা কখনও রাজা দেখে নাই। কোনও অধ্যক্ষের উপদেশে, রাজা হইলেই বাবরী চুল হয়, ইহা জানিয়াছে। এক ব্যক্তি যদি নল ও ভীমসিংহ সাজেন, দর্শক পালার নাম শুনিয়া ইনি ভীমসিংহ কি নল সাজিয়াছেন বুঝিতে পারিবেন না।"

এই নিবন্ধের কিছুকাল পরে স্বর্গগত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়, শ্রীধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ছদ্মনামে, 'বঙ্গীয় নাট্যশালা' নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব রাখেন—

(১) পৌরাণিক যুগে কাহার কিরূপ পোষাক ছিল, তাহা আমরা কেহই জানি না। দেবীর প্রকৃত পোষাক যে কি হইবে, তাহাও আমরা বুঝি না। এরূপ স্থলে আমাদিগকে কল্পনা ও উদ্ভাবনা বলে এই সকল পোষাক পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে।

(২) ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিষয়ের অভিনয়ে পোষাক-পরিচ্ছদের জন্য, কাহাকেও কিছু কল্পনা করিতে হয় না। ইতিহাসাদি খুঁজিলেই সকল সময়ের, সকল দেশের, সকল জাতির পোষাক-পরিচ্ছদের বিবরণ পাওয়া যায়।

(৩) পোষাক ঠিক উপযুক্ত না হইলে, অভিনয়ে কোনও অভিনেতা যথার্থ ভাবোদ্রেক করিতে পারে না।

এই প্রস্তাবগুলি তুলে ধরে লেখক সাজ-সজ্জা ও রূপসজ্জা প্রসঙ্গে যে আলোচনা করেছেন, তা তুলে ধরার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। কেন না—সে যুগে দর্শকের মনোরঞ্জন করার জন্য অভিনয় ছাড়া আঙ্গিকের অন্য অন্য দিকগুলি হয়তো ইচ্ছাকৃত ভাবেই উপেক্ষিত হত। মুস্তফী মহাশয় নিবন্ধের এক জায়গায় বলেছেন "জমকালো পোষাক পরাইলে দর্শকেরা চমৎকৃত হইয়া প্রশংসা করেন। ভাল কথা, জমকালো পোষাক দিতে কেহ বারণ করিতেছে না। দেশ কাল পাত্রানুসারে পোষাক যত জমকালো করিতে পারা যায়, করা হোক, কোনও আপত্তি নাই।

কিন্তু তাহা না করিয়া, যাহার যাহা নহে, তাহাকে যদি তাহাই দিয়া জমকালো করিয়া সাজানো হয়; আমরা আপত্তি না করিব কেন? জমকালো হইবে বলিয়া ক্লাইভকে যদি মোগল বাদশাহের পোষাক দেওয়া যায়, তবে কেমন দেখিতে হয়? * * * * * তিনশত বৎসর পূর্বের সময়ের যশরের বাঙ্গাল রাজা প্রতাপাদিত্যের অন্তপুরে যদি বসন্ত রায়ের রাণীকে হাফহাতা ভিক্টোরিয়ান জ্যাকেট পরিয়া নথ নাড়িতে দেখা যায়, তাহা সোনার পাথর বাটীর মত উদ্ভট বোধ হয় না কি? * * * * * যুবতীর ঘন-মেঘ কৃষ্ণ কেশ কলাপে মুঠাখানেক খড়ির গুঁড়া ছড়াইয়া দিলেই কি আশীবর্ষের বুড়ীর সাজ হয়? * * * পোষাক-পরিচ্ছদ ও মেকআপ সম্বন্ধে আমরা যে সকল কথা বলিলাম, তাহা হইতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বুঝিতে পারিবেন যে এগুলির জন্য কেবল কল্পনা-সাহায্যে, বিপুল অর্থব্যয় করিয়া পোষাকের নামে কতকগুলো কাটা কাপড়ের স্তূপ সঞ্চয় করা অপেক্ষা ইতিহাস দেখিয়া, ছবি খুঁজিয়া, জানিয়া শুনিয়া, আবশ্যক মত পোষাক-পরিচ্ছদ প্রস্তুত করানোই একান্ত আবশ্যক।"

রবীন্দ্রনাথ জমকালো পোশাক ও দৃশ্যপটের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন—"যে দর্শক তোমার অভিনয় দেখিতে আসিয়াছে তাহার কি নিজের সম্বল কানাকড়িও নাই? যদি তাহা সত্য হয়, তবে ডবল দাম দিলেও এমন সকল লোককে টিকিট বেচিতে নাই।"

নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে দর্শক মনোরঞ্জনের জন্য নাট্যশালার কর্তৃপক্ষেরা যাই করে থাকুন না কেন, জেনেশুনে সে ভুলত্রুটি তাঁরা করতে বাধ্য হয়েছিলেন—নাট্যশালাকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদেই। দর্শক সংখ্যা সেদিন ছিল সীমিত, নাটকের পরমায়ুও ছিল সেদিন সীমাবদ্ধ। কোন নাটক হয়তো একবার অভিনয় হয়েই বন্ধ হয়ে যেত। দর্শকদের ভাল লাগলে কোনও নাটক চার-পাঁচ রাত্রিও হয়তো অভিনয় হত। নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যয়ভার বহন করা নাট্যশালার মালিকের পক্ষে ছিল দুঃসাধ্য; এর ফলে নাট্যশালাগুলির মালিকানা যেমন বার বার হস্তান্তরিত হয়েছে; তেমনি বার বার তাকে ঋণের জালে আবদ্ধ হতে হয়েছে। বঙ্গীয় নাট্যশালার বিগত ১০৭ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাব—প্রথম অর্ধশতাব্দীকাল তাকে এই ভাবেই চলতে হয়েছে। বঙ্গীয় নাট্যশালা স্বনির্ভর হয়েছে বলা যেতে পারে শতাব্দীকালের দ্বারপ্রান্তে এসে। এই সুদীর্ঘ কাল লড়াই করতে হয়েছে নাট্যশালাকে, বহু বিপক্ষ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং এরই মাঝে সে সচেষ্ট হয়েছে রূপসজ্জা, দৃশ্যসজ্জা এবং আঙ্গিকের উন্নতি সাধনে।

গিরিশযুগের অভিনীত নাটকগুলি প্রধানতঃ অভিনয়ের ওপর নির্ভরশীল ছিল। অভিনয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গীতের প্রাধান্য ছিল নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে মূল উপাদান। হয়তো অন্যান্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিদান করার মত তাঁদের সঙ্গতি অথবা উপায় কোনটাই ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা যে সে অভাব অনুভব করেন নি বা আদৌ কোনও চেষ্টা করেননি তা নয়। বঙ্গীয় নাট্যশালা প্রসঙ্গে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যে সব আলোচনা হয়েছে, সেইসব আলোচনাকারীদের অন্যতম স্বর্গগত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত 'ম্যাকবেথ' অভিনয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—"মিনার্ভা থিয়েটার সৃষ্টির সময়ে ম্যাকবেথ নাটকে যে ভোজনগৃহের দৃশ্য (Banquet Hall) আঁকা হইয়াছিল, তাহাতে চিত্রকর উইলার্ড ঘরের একটা কোণ এমন কৌশলে আঁকিয়া দেখাইয়াছিলেন—এবং তাহার পার্শ্বপট কয়খানি এমন কৌশলে মূল পটের সহিত মিলাইয়া আঁকিয়াছিলেন যে ভোজনের

টেবিল ও চেয়ারগুলির সহিত দৃশ্যটি যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। দীর্ঘ গৃহ অংকনে এইরূপ কৃতিত্ব আমরা বঙ্গীয় নাট্যশালার আর কোথাও দেখি নাই।" যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে আমাদের দেশেও মঞ্চরীতিরও কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। ১৮৯৭ সালে নট-নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ক্লাসিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করেন। বিশেষ করে এই সময় থেকে অভিনয় ছাড়া দৃশ্যসজ্জা, রূপসজ্জা, সাজসজ্জা প্রভৃতির কিছু কিছু পরিবর্তন শুরু হয়। এই সময় 'Indian Mirror' (১২ই অক্টোবর ১৮৯৮) পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা'র অভিনয় প্রসঙ্গে যে সমালোচনা করা হয়, তাতে অভিনয় ছাড়াও দৃশ্যসজ্জা সম্পর্কে লেখা হয়—"Some of the scenes painted for the representation, are excellent productions of art. Among these are the Chetla Bridge and the drawing room in the last scene, the decoration of the latter being such as only the most refined taste is capable of suggesting."

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে অমরেন্দ্রনাথ প্রথম ব্যক্তি যিনি অভিনয়ের সংগে আঙ্গিকের প্রতি দৃষ্টিদানের বিষয় বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। একটি নাটককে যথাযথ ভাবে মঞ্চস্থ করতে হলে নাটকটিকে সর্ব প্রথমে যেমন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনা করার দরকার এবং সেইসঙ্গে—

১. Acting বা অভিনয়।
২. দৃশ্যসজ্জা ও তার প্রয়োজনীয় আসবাব।
৩. রূপসজ্জা বা Make-up এবং Wig বা পরচুলা।
৪. সাজসজ্জা, costume বা পোশাক-পরিচ্ছদ।
৫. আলোকসম্পাত।
৬. আবহ-সঙ্গীত, Effect music, শব্দ প্রক্ষেপণ।
৭. নাটকীয় সঙ্গীত প্রয়োগ।

এই সমস্ত বিভাগের সুষ্ঠু কর্মের দ্বারায় একটি পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস করতে হয়। সে পরিবেশ নাট্য-বিষয়-বস্তুকে দর্শকদের সম্মুখে বাস্তবানুগ করে তোলে।

বর্তমান কালের মত সে-যুগে এ সব বিষয়ে বিশেষ যত্ন নেওয়া হত না। Effect music এবং আবহসঙ্গীত সে যুগে খুব কমই ব্যবহৃত হত। ঐতিহাসিক, পৌরাণিক নাটকে যুদ্ধের দৃশ্যে আবহসঙ্গীত ব্যবহার করা হত। ঐতিহাসিক নাটকে কামান দাগা বা গোলাগুলির শব্দ প্রয়োগের জন্য সাধারণতঃ কলেরা পটাশ ও মোমছালের দ্বারা আওয়াজ সৃষ্টি করা হত। একটি টিনের ওপর কতকগুলি লোহার অথবা গোল পাথরের নুড়ির সাহায্যে গড়িয়ে গড়িয়ে মেঘের ডাকের সৃষ্টি করা হত। তাছাড়া হরবোলার দ্বারা মুখে অনেক রকম পশু-পক্ষীর ডাক দেওয়া হত। যন্ত্রশিল্পীরা শব্দ প্রক্ষেপণের ব্যাপারে সাহায্য করতেন। আজকের মত Tape-recorder ব্যবহারের সেদিন সুযোগ ছিল না। আলোক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ দুটি Arc-lamp ব্যবহার করা হত এবং একটি গোল frame-এ নানা রঙের জিলেটিন্ Paper এঁটে সেটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিভিন্ন রঙে মঞ্চকে রঙ্গীন করে তোলা হত; বিশেষভাবে সখীদের নৃত্য-গীতের দৃশ্যে এর ব্যাপক ব্যবহার ছিল। দুইটি পোরসিলিন্ পাইপে সোডা সাজিমাটী ও সাবান গুলে নেগেটিভ্ পজেটিভ দুইটি তারের সাহায্যে ডিমার করা হত।

দৃশ্যপটের ব্যাপারেও Box scene বা আজকের মত জানালা-দরজা দেওয়া ঘর ব্যবহার

করা হত না। সাধারণতঃ পিছনের পর্দায় কোনওটি কুটির, কোনওটি দরদালান, শহরের পথ, বনপথ, বৈঠকখানা, শয়ন-ঘর, পুষ্করিণী, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি আঁকা থাকত। দৃশ্যপট অংকনের ব্যাপারে জাঁক-জমকপূর্ণ পোশাকের মতন জমকালো দৃশ্য আঁকতে শিল্পীরা অভ্যস্ত ছিলেন। এবং স্বাভাবিক করা অপেক্ষা তাঁরা দৃশ্যগুলিকে প্রায়ই অস্বাভাবিক করে তুলতেন। বৈঠকখানা ঘরে দৃশ্য পরিকল্পনাকারীর খেয়াল হল একটি wall clock বা দেওয়াল ঘড়ি আঁকার। ফলে, ঘড়ির কাঁটা দুটি যেখানে তিনি এঁকে রাখলেন, নাটকের সময়ের সঙ্গে সমতা রাখতে তা সক্ষম হল না। কিংবা বনপথের গাছের ওপর কয়েকটি পাখি এঁকে রাখলেন নাটকের সময়কে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সে পাখি যথারীতি গাছেই বসে রইল। কুটির এমনভাবে আঁকা হল যে, যে শিল্পী তার সামনে দাঁড়িয়ে অভিনয় করছেন—কুটিরটি তাঁর হাঁটুর নীচে পড়ে আছে। অঙ্কনশিল্পী একবারও ভাবলেন না—নাটকের পাত্র-পাত্রী কুটিরে প্রবেশ করবেন কি করে? আমি দেখেছি সে যুগের দুটো একটি দৃশ্যপট, যা combination night বা সম্মিলিত অভিনয়ে ব্যবহার করা হত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' নাটকে চন্দ্রশেখরকে এইরকম কুটিরের সামনে দাঁড়িয়ে খেদোক্তি করতে দেখেছি। আর মনে মনে প্রশ্ন করেছি, চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনী কি এই কুটিরে হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করেন? নাট্যপরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ সমস্ত দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সীমিত দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য নিত্যনতুন নাটক মঞ্চস্থ করতে তাঁরা যে বাধ্য হয়েছেন, একথা যেমন স্বীকার্য, তেমনি তার ফলে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ভাণ্ডার যে নানা স্বাদের ও নানা রসের নাট্য-সাহিত্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, সে কথাও অনস্বীকার্য।

America-র নাট্য-চিন্তা-নায়ক Elmer Rice তাঁর 'Living Theatre' গ্রন্থের (যার বঙ্গানুবাদ 'চিরজীবী রঙ্গালয়' নাট্যসৃষ্টি ও সংযোগ সম্পর্কে এক জায়গায় বলেছেন—"স্থপতি, গীতিকার এবং নাট্যকার সম্পর্কে বলা চলে—যখন তাঁরা পেনসিলটা নামিয়ে রাখলেন তখনই তাঁদের বক্তব্য পরিসমাপ্ত হল।" কিন্তু এইখানেই কবি ও চিত্রকরের সঙ্গে তাঁদের সাদৃশ্য গেল শেষ হয়ে। যেমন স্থপতি-সুলভ অঙ্কন হলেই অট্টালিকা হয় না, স্বরলিপি সঙ্গীত নয়, এবং নাটিকার পাণ্ডুলিপি নাট্যাভিনয় নয়। শিল্পীর বক্তব্যকে সুস্পষ্ট এবং বোধগম্য করে তোলার জন্য এসব ক্ষেত্রে দরকার হয় বিস্তৃততর ব্যাখ্যামূলক প্রয়োগবিদ্যা। এই প্রয়োগবিদ্যা সম্পর্কে নাট্যপরিচালককে বিশেষভাবে সচেতন হতে হয়। ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে প্রয়োগতত্ত্ব সম্পর্কে যদিও আলোচিত হয়েছে কিন্তু মঞ্চে নাটক উপস্থাপনার ব্যাপারে 'প্রয়োগ' শব্দটি আমরা বহুকাল ব্যবহার করিনি। রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে ঐ শব্দটি আমরা আবার নূতন করে ব্যবহার করতে শুরু করি।

বাংলা ১৩৩১ সালে ২রা ভাদ্র তারিখে নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ীর পরম সুহৃদ স্বর্গগত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি পত্রে শিশিরকুমার প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লেখেন—"শিশির ভাদুড়ীর প্রয়োগ নৈপুণ্য সম্বন্ধে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে।" রবীন্দ্রনাথের এই প্রয়োগ শব্দটি এরপর থেকেই নাট্যকর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ইতিপূর্বে 'প্রযোজক' বা 'Producer' শব্দটি যিনি নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে অর্থ বিনিয়োগ করতেন, তাঁর প্রতি ব্যবহার করা হত। শুধু যে আমাদের দেশেই ব্যবহার হয়েছে তা নয়, ওদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মঞ্চাভিনয় শুরু হলেও Producer শব্দটির প্রকৃত ব্যাখ্যা

হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এতৎ সম্পর্কে The Oxford Companion to the Theatre-এ (৩য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৭৬৬) যা লেখা হয়েছে—তার অনুবাদ করলে এই দাঁড়ায়, "আমেরিকাতে নাটক প্রয়োজনার আর্থিক দিকটার জন্যে যিনি দায়ী, যিনি নাটকের অভিনয় স্বত্ব কিনে নেন, থিয়েটার বাড়ী ভাড়া করেন, অভিনেতা ও অন্যান্য কর্মীদের নিযুক্ত করেন, এবং থিয়েটারের টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থ যার আয়ত্তাধীন, তিনিই Producer বা প্রযোজক বলে খ্যাত। আমেরিকার Producer ইংলণ্ডে Manager বা অধ্যক্ষরূপে পরিচিত।

ইংলণ্ডে সাধারণতঃ নাটক ব্যাখ্যার জন্যে দায়ী ব্যক্তিকে প্রযোজক বলা হয়। তিনি মহলা পরিচালনা করেন। সে সময়ে তিনি অভিনেতাদের সঠিক পথনির্দেশ করে ও সময়োচিত উপদেশ দিয়ে একটি সংবদ্ধ দলে পরিণত করেন। প্রযোজনার আর্থিক ও ব্যবসায়িক দিকে তাঁর কোনও দায়িত্ব নেই। কেবলমাত্র শিল্পগত ও নাটকীয় সংগতিই তাঁর লক্ষ্য। ইংলণ্ডের Producer আমেরিকাতে Director বা পরিচালক বলে খ্যাত। ইংলণ্ডে এই শব্দের প্রচলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। Continent-এ অর্থাৎ ইউরোপীয় ভূখণ্ডে এ'রা ('রেজিসিয়ে' Regisseur) বলে খ্যাত। প্রাথমিক যুগে নাট্যকারেরাই তাঁদের লেখা নাটক পরিচালনা করতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন প্রধান অভিনেতা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্টারের স্বলিখিত নাটক ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে অধ্যক্ষ অভিনেতারা নাটক Produce বা প্রযোজনা করতেন।***বিশেষজ্ঞদের মতে, আদর্শ প্রযোজককে, অভিনেতা, শিল্পী, স্থপতি, ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতিতে অভিজ্ঞ, ভূগোল, ইতিহাস, পোষাক-পরিচ্ছদ, সরঞ্জামাদি ও দৃশ্যপট বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী হতে হবে। সর্বোপরি মানবচরিত্র অধ্যয়নে তাঁকে অভিজ্ঞ হওয়ার দরকার। প্রযোজনার ক্ষেত্রে শেষের গুণটি সবচেয়ে বেশী দরকার।"

বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ে ৩৯ বছর একধারায় নাটক মঞ্চস্থ হয়ে এসেছে। ১৯১১ সালে অর্থাৎ নাট্যশালা স্থাপিত হওয়ার ৩৯ বছরে পদার্পণ করে দৃশ্যসজ্জা ও আঙ্গিকে কিছু উন্নতি সাধন করে। কিন্তু এরও এক যুগ পরে আর্ট-থিয়েটারে নট-নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচালনায় 'কর্ণার্জুন' নাটক অভিনীত হয় এবং তার এক বৎসর আগে শিশিরকুমার বেঙ্গলী থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানীর পক্ষে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের "আলমগীর" নাটকটী সম্পূর্ণ নতুনভাবে সম্পাদনা করে মঞ্চে উপস্থাপিত করেন। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে সাত্ত্বিক-বাচিক-আঙ্গিক ও আহার্য—এই চার প্রকার অভিনয় সম্পর্কে যে উল্লেখ আছে, তারই সঙ্গে মঞ্চ কৌশলের যে ধারা বিদেশী রঙ্গালয়ে প্রবর্তিত হয়েছিল, এই সময় থেকেই এই দুই-এর সংমিশ্রণে বাংলার সাধারণ রঙ্গালয় নতুনভাবে নাটক মঞ্চস্থ করার প্রয়াস পায়।

অপরেশচন্দ্র গিরিশযুগের অন্যতম নট ও নাট্যকার। গিরিশচন্দ্রের প্রভাব, মঞ্চরীতি, অভিনয় সম্পর্কে তাঁর মধ্যে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করলেও—কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় ও মঞ্চরীতির তিনি পরিবর্তন সাধন করেছেন। এ বিষয়ে, তাঁর কোনও গোঁড়ামী ছিল না এবং এই কারণেই তিনি সুদীর্ঘকাল যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে মঞ্চ পরিচালনা করে গেছেন। শিশিরকুমার নাটককে সংক্ষিপ্ত করে তিন ঘন্টার মধ্যে অভিনয় করার ব্যবস্থা করেন, অপরেশচন্দ্র কিন্তু নাট্যরচনার দিক থেকে গিরিশচন্দ্রের নাট্যরচনার ধারাকেই অনুসরণ করে এসেছেন। শিশিরকুমার গিরিশযুগের অভিনয় ধারার সম্পূর্ণ পরিবর্তন করেছেন সেই সংগে বাস্তবানুগ দৃশ্যপট, সাজসজ্জা, রূপসজ্জা ও আলোক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা এমনভাবে

প্রবর্তন করেন, যা শিল্প-সম্মত রূপে দর্শকদের কাছে অভিনন্দিত হয়। অপর পক্ষে অপরেশ-চন্দ্র নাটকের পুরাতন ধারাকে বজায় রেখে সাজসজ্জা, রূপসজ্জা, দৃশ্যপট প্রভৃতির প্রভূত পরিবর্তন সাধন করেছেন। 'কর্ণার্জুন' নাটকে শিল্পীদের সাজসজ্জা এবং অলংকার সম্পূর্ণ নতুনত্বের স্বাদ বহন করে এনেছিল। নগ্ন গাত্রে অলংকারে সজ্জিত এবং উত্তরীয় অথবা অর-গ্যাণ্ডি বা সাটিনের বেনিয়ান সেদিন দর্শকের কাছে নতুন রূপে প্রতিভাত হয়েছিল। ইতি-পূর্বে নট-নাট্যকার মনোমোহন গোস্বামী ও ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের সাজসজ্জা সম্পর্কে যে মন্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে, বলা যেতে পারে এই সময় থেকেই সেই সব জাঁকজমকপূর্ণ সাজসজ্জার বিলোপ সাধন ঘটে। এছাড়া নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে দৃশ্যপট অংকনে শিল্পসম্মত রুচির পরিচয় বহন করতে থাকে। পরচুলাগুলি যথাসম্ভব স্বাভাবিক করে তোলার চেষ্টা করা হয়। রূপসজ্জা বা মেক্-আপের ব্যাপারেও মার্জিত রুচির পরিচয় বহন করে। সর্বোপরি আলোক নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে বিশেষ সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। অপরদিকে শিশিরকুমার অভিনয়ের স্বাভাবিকত্ব, শিল্পসম্মত দৃশ্যপট ও আলোকের সুষম ব্যবহারের দ্বারা নাট্যজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। বলা যেতে পারে বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ের নবযুগের সূচনা এই সময় থেকেই শুরু হয়।

ইতিপূর্বে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বরচিত নাটকগুলি সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে মঞ্চস্থ করেন। কেউ কেউ বলেন, শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত মঞ্চ-আঙ্গিকের সঙ্গে নিজস্ব ভাবধারার সংমিশ্রণে নূতন শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় প্রদান করে গেছেন। শিশিরকুমার illusion-এর পক্ষপাতী ছিলেন না। Illusion-এর মাধ্যমে নাটকের দুর্বলতা ঢাকার অপচেষ্টা তিনি করেননি। নাটকে আঙ্গিকের প্রয়োজন আছে ঠিকই, কিন্তু আঙ্গিক সর্বস্বই নাটক নয়। আঙ্গিক নাটকের অনুষঙ্গ। এই অনুষঙ্গগুলিকে নাটকের বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যিনি উপস্থাপিত করতে পারেন তিনিই সার্থক নাট্যস্রষ্টা বা প্রয়োগকর্তা। শিশিরকুমার ছিলেন এই কয়টি গুণেরই অধিকারী। এই জন্যেই শিশিরকুমার বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে নবযুগের প্রবর্তক। এই প্রসঙ্গে শিশিরকুমারের সঙ্গে আমার এক দিনের ঘটনার উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 'বিন্দুর ছেলে' নাটক মঞ্চস্থ করার কয়েকদিন আগে শিশিরকুমার অসুস্থ হয়ে পড়েন। মহলায় যোগদান করাও তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয় না। তাঁর অনুপস্থিতিতে নট-নাট্যকার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয় নাট্য-পরিচালনা করতে থাকেন। নাটক নির্দিষ্ট দিনে মঞ্চস্থ হল। শিশিরকুমার তখনও অসুস্থ। এর তিন চার দিন পরে শিশিরকুমার সুস্থ হয়ে উঠলেন। — আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—অভিনয় কেমন হল ? - বললাম, অভিনয় তো মোটামুটি ভালই হয়েছে, তবে বিক্রি সুবিধের নয়। শুনে বললেন—কাল রবিবার—সেকেণ্ড শোতে অভিনয় দেখব। তুমি এসো—। পরের দিন স্টেজ বক্সে বসে দু'জনে অভিনয় দেখলাম। অভিনয় শেষ হলে বললেন—সবই ঠিক আছে, একটু Brush work-এর দরকার। Brush work কথাটা শুনে শিশিরকুমারের মুখের দিকে আমি চেয়ে রইলাম। বললেন— আমি কি বলতে চাইছি—বুঝতে পারছ না বোধ হয় ? আমি মাথা নেড়ে জানালাম না। বললেন—ব্যাপারটা কি জানো, প্রতিমা গড়ানো হয়েছে, সজ্জা অলংকারেও সজ্জিত করা হয়েছে কিন্তু গর্জন তেলটি মাখানো হয়নি। পরের দিন এই গর্জন তেল মাখানো শুরু হল সকাল আটটা থেকে, শেষ হল রাত্রি নটার পর। এক নাগাড়ে শিক্ষা দান শুরু হল

বিন্দুবাসিনীকে নিয়ে। বেলা চারটেয় মঞ্চে নামলেন নাট্যাচার্য, সঙ্গে প্রমথটার, বিন্দুবাসিনী আর আমি। মঞ্চে এসে দেখলাম নাট্যাচার্যের নির্দেশে যন্ত্রশিল্পীরা এসে হাজির হয়েছেন। মঞ্চকুশলীরা রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ঘরের সন্নিহিত উঠোনের দৃশ্যটি সজ্জিত করে রেখেছেন। আলোকশিল্পীরা বেলা দশটা সাড়ে দশটার আলোক নিয়ন্ত্রণে ব্যস্ত। ছোট অমূল্যও এসে বসে আছে। মঞ্চে এসে প্রথমেই যন্ত্র শিল্পীদের উদ্দেশ্য করে বললেন—'প্রথম অঙ্কের শেষে যেখানে বিন্দুবাসিনী অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়—আর অমূল্য তার বুকের ওপর আছড়ে পড়ে কাঁদিতে থাকে—'ছোট মা মরে গেল—ছোট মা মরে গেল' বলে—সেখানে তোমাদের বাজনার সঙ্গে অভিনয় অংশের কোনও সমতা থাকছে না। ওটা এমনভাবে বাজাতে হবে, যাতে বিন্দুবাসিনীর অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়া আর অমূল্যের ব্যাকুলতা প্রকাশের মাঝে—মনে হবে—বাড়ীঘর যেন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে পড়ে গেল। তারপর আলোক নিয়ন্ত্রণকারীদের উদ্দেশ্যে বললেন—বেলা দশটা সাড়ে দশটার যে আলো তোমরা করছ, তাতে মনে হচ্ছে যেন Top Sunlight, নাটকের সময়ের সঙ্গে সমতা রেখে তোমাদের আলো করতে হবে। এর পরই শুরু হল—যন্ত্রশিল্পী ও আলোকশিল্পীদের মহলা। আলো কমিয়ে এনে আলোক নিয়ন্ত্রণকারীরা যদিও নাট্যাচার্যের সন্তুষ্টি সাধন করতে সক্ষম হল, কিন্তু যন্ত্রশিল্পীরা নানান সুরে গৎপরিবর্তন করে নানা ভাবে বাজিয়েও নাট্যাচার্যকে সন্তুষ্ট করতে পারল না। অসন্তুষ্ট চিত্তে আমার দিকে চেয়ে বললেন—প্রতিটি বিভাগের কাজ, conception অনুযায়ী না হলে, যথাযথ নাট্যপ্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। সুরকারের উচিত সংলাপে কি সুর ধ্বনিত হচ্ছে, সেটি সর্বাগ্রে উপলব্ধি করা। সেটি ব্যথা-বেদনা-ভয়-বিস্ময় বা আনন্দ সর্বাগ্রে এইটি তাঁকে উপলব্ধি করতে হবে—অথবা ভয়-বিস্ময়-কিংবা আনন্দ বেদনার সংমিশ্রণে যে সংলাপ তার সঙ্গে সমতা রেখেই সুরকারের সুর সেই প্রতিপাদ্য বিষয়ের সংমিশ্রণেই গড়ে ওঠা উচিত। নাট্য-প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিশিরকুমারের সেই দিনের এই কথাগুলি আমার কাছে আজো অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে আছে।

নাটকের বক্তব্যকে দর্শকের সামনে তুলে ধরাই নাট্য-প্রযোজকের প্রধান কর্তব্য। অনেক সময়ে দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য নাটকের মূল বক্তব্য থেকে সরে গিয়ে অহৈতুক নৃত্য গীতের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া আলোক নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারেও— আলো জ্বলানো বা নেভানো, আলোকে কমানো বা বাড়ানো নাটকের প্রয়োজনের জন্য না হলে তা সুষ্ঠু প্রয়োগের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। আজকাল অনেক নাটকে দেখা যায়—নৃত্যনাটকে যে রকম আলোর প্রয়োজন হয়, সেই রকম আলোক প্রক্ষেপণ করতে। নৃত্য-নাট্যের আলো প্রক্ষেপণের যে রীতি, অভিনয় সর্বস্ব নাটকের রীতি তা নয়—এ কথাটি প্রযোজকদের বিশেষ ভাবে অনুধাবন করা দরকার। শব্দ প্রক্ষেপণের বিষয়েও প্রযোজকদের একান্তভাবে যত্নবান হওয়া উচিত। মঞ্চাভিনয়ে আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে Tape Recorder-এর মাধ্যমে শব্দ প্রক্ষেপণের কাজটি সমাধা করা হয়। এমন কি আবহসঙ্গীত, শিল্পীর কণ্ঠের সংগীতও Tape Recorder-এর মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। ফলে, বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় সংলাপের সঙ্গে শব্দ প্রক্ষেপণের সমতা থাকে না; গান শুনে শিল্পী যে ঠোঁট নাড়েন, সেটিও দর্শকের চোখে অনেক সময়ে ধরা পড়ে। বর্তমান কালে এই Tape Recorder-এর মাধ্যমে মঞ্চ-নাটকের কাজ সারা কতকটা দায়সারারই সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে শিল্পী গান গাইতে জানেন না, কোনও কণ্ঠশিল্পীর সাহায্যে গানটি তুলে নিয়ে সেই অভিনয়-শিল্পীর কণ্ঠে তা

লাগানো হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কণ্ঠশিল্পীর গলার স্বর যে সম্পূর্ণ পৃথক—তা স্পষ্টই বোঝা যায়। মনে করুন নায়িকার হাতে একটি চায়ের কাপ-ডিস আছে—কোনও কারণে তার হাত থেকে কাপ-ডিশটি পড়ে গেল। পড়ে যাওয়ার যে শব্দ সেটি Tape Recorder-এর মাধ্যমে ধরে রাখা হয়েছে। প্রায়শঃ দেখা যায় সে শব্দটি দু'এক সেকেণ্ড আগে বা পরে হয়ে যায়। নাট্য-অভিনয়ে Life-Music হওয়া উচিত—এবং শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও যন্ত্র-শিল্পী-দের দ্বারাই এ কাজ সমাধা করা উচিত। ধরা যাক—সন্ধ্যাবেলায় তুলসী তলায় প্রদীপ দিয়ে নায়িকা শঙ্খধ্বনি করবেন। নায়িকা শাঁখে ফুঁ দিয়ে হয়তো আওয়াজ বার করতে পারলেন না—অথবা তিনি মোটেই শাঁখ বাজাতে পারেন না। এ ক্ষেত্রে শাঁখের ফুঁ দেওয়ার আওয়াজ Tape Recorder-এর মাধ্যমে তুলে রেখে এবং ঠিক সময়ে যদি তা না বাজে, তাহলে হাস্যকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। নায়িকা শাঁখ বাজাতে জানুন অথবা নাই জানুন—নায়িকার মুখে শাঁখ তোলার সঙ্গে সঙ্গে ক্ল্যারিওনেটের মাধ্যমে যন্ত্রশিল্পী এ কাজটি অতি স্বাভাবিক ভাবেই সম্পন্ন করতে পারেন। কাজেই মঞ্চ-নাটকের-অভিনয়ে Life-Music একান্তভাবে প্রয়োজন। ব্যবসায়ী থিয়েটারগুলিতে বরাবরই Life-Music এর ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে খরচ বাঁচাবার জন্যে অধিকাংশ থিয়েটারেই Tape Recorder-এর মাধ্যমে এই কাজটি সম্পন্ন করা হচ্ছে। Tape Recorder-এর মধ্যে মধ্যে যান্ত্রিক গোলযোগের জন্যে অভিনয়ে বিপর্যয় ঘটায়। মঞ্চ-নাট্য, চিত্র-নাট্য, দূরদর্শন-নাট্য, বেতার-নাট্য বা যাত্রা-নাট্য প্রত্যেকেরই ধর্ম আলাদা, উপস্থাপনার রীতিও আলাদা। কাজেই চিত্র-নাট্যের অনুকরণে Lip-movement দিয়ে গান করানোও যেমন বাঞ্ছনীয় নয়, তেমনি যন্ত্রশিল্পীদের একদিনের দক্ষিণা দিয়ে, একাধিক দিন তাকে Tape Recorder এর মাধ্যমে বাজিয়ে মঞ্চের অনুসঙ্গ-শিল্পীদের রুজি রোজগারের পথে অন্তরায় হওয়াও উচিত নয়।

বর্তমানে নাট্য-প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমরা বহু বিষয়ে এগিয়ে চলেছি। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষাতেও কৃতকার্য হচ্ছি, মঞ্চে ম্যাজিকের খেলা বা Illuasion-এর দ্বারা চমক সৃষ্টিতে সক্ষম হচ্ছি কিন্তু নাট্য রচনার ক্ষেত্রে আমরা আশানুরূপ সাফল্য দেখাতে পারছি না। বর্তমানে মৌলিক নাটকের বাজারে আমরা প্রায় দেউলে হতে চলেছি। প্রয়োগের ক্ষেত্রে নাট্য রচনার উল্লেখ করার কারণ—মৌলিক নাটকে প্রায়শঃ যে নতুন চিন্তাধারা প্রকাশ পায় প্রয়োগের ক্ষেত্রে সেই নতুন নাটকে প্রয়োগনৈপুণ্যেও নূতনত্বের প্রয়োজন হয়। বর্তমানে অধিকাংশ নাটকই উপন্যাসের নাট্যরূপ, বিলাতী নাটকের অনুকরণ বা অনুসরণে অথবা ভাবালম্বনে রচিত হচ্ছে। ফলে, প্রয়োজক পূর্বেই প্রস্তুত হয়ে থাকেন, দেশী বা বিলাতী যে কোনও কাহিনীই হোক না কেন, প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর আয়ত্তের মধ্যে যা আছে, তার মধ্যে তিনি তাঁর প্রয়োগকর্মটি সমাধা করেন। নাট্য-প্রয়োগের ক্ষেত্রে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার আজও অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন এই জন্যে যে, সামাজিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক প্রভৃতি নানা রসের ও নানা স্বাদের নাটক প্রযোজনা করে তিনি একটি বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। 'The Bells' নাটকটি তিনি 'শঙ্খধ্বনি' নামে মঞ্চস্থ করেন। প্রথমে বিলাতী কাহিনীটিকে সম্পূর্ণ দেশীয় ভাবধারায় উপস্থাপিত করে, পরে নাটকের প্রয়োজন অনুসারে তাকে এমনভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন যে কে বলবে যে এ কাহিনীটি আমাদের দেশজ কাহিনী নয়। নাট্য-প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর সর্বাধিক কৃতিত্ব "দিগ্বিজয়ী" নাটকে। এ নাটকের প্রয়োগে তিনি অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়ে গেছেন, নিজে 'নাদির শাহের'

ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। নাদির শাহ অধিকাংশ সময়ে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে থাকতেন। এই রকম ঘোড়-সওয়ারদের চলা একটু অস্বাভাবিক হয়। তাঁরা পা দুটি ফাঁক করে চলতে অভ্যস্ত হন। শিশিরকুমার এই নাটকে নাদির শাহের ভূমিকায় অভিনয়ের কালে সর্বদা পা দুটি ফাঁক করে চলাফেরা করতেন। এছাড়া এই ঐতিহাসিক নাটকটিকে ইতিহাসের পটভূমিকায় বাস্তবানুগ করে উপস্থাপিত করেছিলেন। কি দৃশ্যপট পরিকল্পনায়, কি সাজসজ্জা অথবা রূপসজ্জায়, কি শব্দ প্রক্ষেপণে অথবা আবহসঙ্গীতে এবং আলোক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় নাটকের মূল বক্তব্যকে, তিনি এমনভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন যে সেদিনের দর্শকের চোখে অনেক নাটকের মধ্যেও 'দিগ্বিজয়ী' আজও অনন্য হয়ে আছে।

আমার কাছে তাঁর একটি ছোট্ট প্রয়োগ নৈপুণ্যের কথা আজও মনে গেঁথে আছে। সেটি প্রকাশের লোভ আমি সম্বরণ করতে পারছি না। তিনি যে কত বড় প্রযোজক ছিলেন, তা তাঁর এই সংলাপবিহীন অভিনয়ের মাধ্যমে বোঝা যায়। দিল্লী থেকে সিতারা বেগমকে নিয়ে এসেছেন নাদির শাহ। সিতারা বেগমের সঙ্গে নাদির শাহ প্রেমালাপে মগ্ন। সিতারা নাদির শাহকে শোনাচ্ছে তার পূর্ব প্রেমিককে তার কটিবন্ধে বাঁধা ছোরার সাহায্যে কিভাবে নিহত করে চলে এসেছে। সিতারার সংলাপগুলি শুনে, নাদির শাহ প্রেমাভিনয় করতে করতে তার কাছে আরও ঘনিষ্ঠ হলেন, এবং সিতারার কটিবন্ধ থেকে ছোরাটি তুলে নিয়ে নিজের কটিবন্ধে গুঁজে রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অভিব্যক্তিতে ফুটে উঠলো—তোমার সঙ্গে প্রেম করা নিরাপদ নয়—সুতরাং ছোরাটি সর্বাগ্রে নিজের কাছে রাখাই সমীচীন। যা সুদীর্ঘ সংলাপের মাধ্যমে সাধারণতঃ করা হয়ে থাকে, নাট্যাচার্য তাকে সামান্য নাটাকর্ম ও অভিব্যক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করে গেলেন। প্রয়োগকর্তার নৈপুণ্য এইখানেই।

এই প্রসঙ্গে বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রয়োগ প্রধানরূপে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর ভূমিকাও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের 'কর্ণার্জুন' নাটকে বেশ ভূষা ও দৃশ্যপট-পরিকল্পনার ব্যাপারে তাঁর অবদান বড় কম নয়। আর্ট থিয়েটারে থাকাকালীন 'চাঁদসদাগর', 'আরবী হূর' প্রভৃতি নাটকে তিনি সাজ-সজ্জা, রূপ-সজ্জা, দৃশ্যপট পরিকল্পনায় যথেষ্ট অভিনবত্ব দেখিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে রঙমহল থিয়েটারে তাঁর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের প্রয়োগরীতি ও নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর প্রয়োগরীতির মধ্যে পার্থক্য ছিল। শিশিরকুমার দৃশ্যপট ছাড়াই মহলা শুরু করতেন। পরে দৃশ্যপট নির্মিত হলে, শিল্পীদের প্রবেশ, প্রস্থান এবং Composition ঠিক করে নিয়ে পরে আলো, আবহসঙ্গীত প্রভৃতি সংযোজন করতেন। নটসূর্য Stage-reading অর্থাৎ নাটক পড়া হয়ে গেলে, সেই দিনই মোটামুটি ভূমিকালিপি যা তিনি পূর্বাহ্নে তৈরী করে রাখতেন তা শিল্পীদের মধ্যে তিনি বণ্টন করে দিতেন এবং এই Stage-readingএর কয়েকদিন পরে, শিল্পীদের মোটামুটি Part মুখস্থ হয়ে গেলে, মহলা শুরু করতেন। ইতিমধ্যে সেট অর্থাৎ দৃশ্যপট তৈরী হয়ে যেত তাতে কিন্তু তখনও রং লাগানো হত না। ফ্রেমগুলোতে সাদা কাপড় মারা থাকতো। দরজা জানালাগুলো খোলা থাকতো। এরই ওপর শুরু হত মহলা। যিনি দৃশ্যপট অঙ্কন করতেন তিনিও উপস্থিত থাকতেন এই মহলায়। মহলায় শিল্পীদের প্রবেশ প্রস্থানে কিছু অসুবিধা হচ্ছে কিনা, অনেকগুলি শিল্পীর পক্ষে এক সঙ্গে অভিনয় করার পক্ষে সেট্‌টি যথোপযুক্ত কিনা, তা তিনি দেখে নিতেন। যদি অসুবিধে হত, তাহলে ছুতোর মিস্ত্রীকে ডেকে সেট্‌-টিকে

এমনভাবে ঘুরিয়ে দিতেন যাতে সেট্‌টি অভিনয়ের পক্ষে প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ায়। কয়েকদিন এইভাবে সমগ্র নাটকটির মহলা দেবার পর, সেটে রং দেবার জন্যে অঙ্কন শিল্পীকে নির্দেশ দিতেন এবং বলে দিতেন, সেটে দিনের অথবা রাত্রিকালের অভিনয় হবে কিনা। যদি একই সেটে দিন এবং রাত্রিকালের অভিনয় থাকতো তাহলে অঙ্কন শিল্পীকে বলে দিতেন যে সেই সেটের রং কি হবে। সেট-কালারের ব্রাইটনেস্ দিনের আলোর পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক নয় কিন্তু সেই সেটে যদি রাত্রিকালের অভিনয় থাকে, তাহলে সেই সেটে রাত্রিকালের আলোক নিয়ন্ত্রণ করা কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। সেটের রং সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, অভিনয়ের শিক্ষাদানের সংগে আলোক নিয়ন্ত্রণ, আবহসঙ্গীত, শব্দ প্রক্ষেপণের কাজ এক সঙ্গে শুরু হতো। ফলে, যে শিল্পীরা অভিনয় করতেন, তাঁদের কাছে সেই সেটগুলি নিজের ঘর বাড়ীর মত সড়গড় হয়ে যেত। অভিনয়ের কয়েকদিন পূর্বে তিনি বেশ ভূষা ও রূপসজ্জার ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। রূপসজ্জা সম্পর্কে নটসূর্যের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। চরিত্র অনুযায়ী তিনি রূপসজ্জার ব্যবস্থা করে দিতেন এবং সেই সঙ্গে বেশভূষা যাতে চরিত্রানুযায়ী হয়, সেই দিকে প্রখর দৃষ্টি দিতেন। নটসূর্যের নাট্য প্রযোজনায় এই রীতি বহু ক্ষেত্রেই নাটকের সাফল্য এনে দিয়েছে। নাটকের বক্তব্য দর্শকদের কাছে অনেক সময়ে ভাল না লাগলেও তার আনুষঙ্গিক কাজগুলো এমন সূক্ষ্মভাবে করতেন যা কিছুদিন অন্ততঃ দর্শককে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হত। নটসূর্য নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিয়ম তান্ত্রিক ছিলেন। শিল্পীরা অভিনয়কালীন ভুলবশতঃ তাঁর নির্দিষ্ট পোজিসান্ থেকে যদি একটু এগিয়ে কিংবা পিছেয়ে যেতেন তাহলে তিনি তক্ষুনি খড়ির দাগ দিয়ে তাকে বলে দিতেন, ঠিক এই জায়গায় না দাঁড়িয়ে যদি তুমি একটু এগিয়ে বা পিছিয়ে যাও তাহলে আলোক নিয়ন্ত্রণের পক্ষে অসুবিধা হবে এবং তোমার ছায়া অপর শিল্পীর গায়ে পড়ে অসুবিধার সৃষ্টি করবে। নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর নাট্য প্রয়োগরীতি অত্যন্ত বিজ্ঞান-ভিত্তিক ছিল।

রঙ্‌মহলে "রিজিয়া", "বঙ্গেবর্গী", "মেবারপতন" প্রভৃতি পুরানো নাটকগুলিকে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে তিনি মঞ্চে এমনভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন, যা দেখে দর্শকেরা পুরাতনকে নতুনরূপে দেখার আনন্দে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন।

বর্তমানে কেবলমাত্র সামাজিক নাটক অভিনয়ের আধিক্যে প্রয়োগ কর্মের ব্যাপারে বিশেষ কোনোও বৈচিত্র্য প্রকাশ পাচ্ছে না। বিগত দিনে নাট্য-প্রয়োগ কর্মে আমাদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে—এ কথা আগেই বলেছি; কিন্তু বর্তমানে নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে সে সব অসুবিধা নেই বলা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও নাটকের বিভিন্ন বিভাগের কর্মের দ্বারা নাটকের সামগ্রিক ব্যঞ্জনার দ্বারা, মূলে বক্তব্যকে তুলে ধরতে আমরা প্রায়শঃই সক্ষম হচ্ছি না। এর কারণ, বিক্ষিপ্ত নাট্য চিন্তার দ্বারা রচিত নাটকগুলি সু-সংবদ্ধ নয়। নাটক সুসংবদ্ধ না হলে বিভিন্ন বিভাগের নাট্যকর্ম সুপ্রযুক্ত হতে পারে না।

সুদীর্ঘকাল আমেরিকায় নাট্য-প্রয়োগ পদ্ধতির ও মঞ্চ আলোকের কাজ হাতে-কলমে শিক্ষা লাভ করে ১৯৩১ সালে সতু সেন এদেশে ফিরে আসেন। আমেরিকায় অবস্থানকালে সতু সেন চল্লিশটির বেশী নাটক নক্সা-বিদ্‌রূপে, সহকারী প্রয়োগকর্তা রূপে কখনও পরিচালক বা প্রয়োগ-প্রধানরূপে কাজ করেছেন। তিনিই একমাত্র ভরিতীয়, যিনি সর্বপ্রথম

নাট্যকর্মে ওদেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। ওদেশে প্রয়োগ-প্রধানরূপে তিনি 'রেজারেকশান্', 'ওয়ার এ্যাণ্ড পীস', 'ব্লু-বার্ড', 'মিড-সামার নাইটস্ ড্রীম' প্রভৃতি নাটকে প্রয়োগ-প্রধানরূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এদেশে ফিরে এসে, তিনি সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রয়োগ পদ্ধতির উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেন। শিশিরকুমার পরিচালিত রঙমহলের 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নাটকে সর্বপ্রথম শিল্পনির্দেশক রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এই সর্বজন-পরিচিত শ্রীচৈতন্যদেবের কাহিনীকে অবলম্বন করে ইতিপূর্বে বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ে বহু নাটক অভিনীত হয়েছে। কিন্তু সে সব নাটকে গান এবং অভিনয় ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনও প্রয়োগকর্মের পরিচয় পাওয়া যায়নি। সতু সেন চৈতন্যদেবের আমলের পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস পান। সেই সঙ্গে আলোর সুষম ব্যবহার নাটকটিকে মাধুর্য-মণ্ডিত করে তোলে। এরপরে 'ঝড়ের-রাতে' নাটকে একটি মাত্র দৃশ্য সমগ্র নাটকটিকে তিনি যে ভাবে উপস্থাপিত করেন, তা বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এক বিস্ময়কর সূচনা বলে উল্লিখিত হয়ে আছে। এরপর তিনি ১৯৩৩ সালে রঙমহল মঞ্চটিকে সর্বপ্রথম ঘূর্ণায়মান মঞ্চে পরিণত করেন। এই দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করতে তাঁকে বহু প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই ঘূর্ণায়মান মঞ্চ নির্মাণের পর একটি দৃশ্য থেকে অপর একটি দৃশ্যে যাওয়ার জন্যে মঞ্চ সজ্জার পরিবর্তন ইত্যাদির ব্যাপারে ইতিপূর্বে যে সময়ের অপব্যবহার হত, তা যেমন কমে গেল, অপরদিকে তেমনি নাটকের গতিও বেড়ে গেল। ঘূর্ণায়মান মঞ্চ প্রবর্তিত হওয়ার ফলে, নাট্যকারেরা তাদের কল্পনানুযায়ী নাটক লেখবার সুযোগ পেলেন আর সেই সঙ্গে অকারণে নাটকে গান সংযোজনার আর প্রয়োজন হল না। স্বাভাবিক দৃশ্যপট অর্থাৎ ঘরের দরজা-জানালা স্বাভাবিকভাবে দেখাবার সুযোগ এলো। শিল্পীদের আগমন ও নির্গমণের পথ অতি স্বাভাবিকভাবে সেট্‌সিনের মধ্যে দিয়ে চলতে লাগল।

আলোর ব্যাপারে সতু সেনকে বহু বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। যথাযথ আলো প্রয়োগ করতে হলে যে সব বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও নানান ধরনের আলোর প্রয়োজন, তা কোন মঞ্চেই তখন ছিল না। সে সময় বিদেশ থেকে আলোর আমদানি করা ব্যয়-সাপেক্ষ ও সময়-সাপেক্ষ ছিল এবং বিদেশী সরকারের ওপর অনেকখানি নির্ভর করে থাকতে হত। সতু সেন নিজে কারখানায় বসে থেকে ডিজাইন করে, এই আলো ও যন্ত্রপাতি তৈরি করে নিয়েছিলেন, যার দ্বারা তিনি মঞ্চে প্রয়োগকর্মের নতুন নজীর সৃষ্টি করে গেছেন। পরবর্তী কালে বিদেশীয় নানান যন্ত্রপাতি বিভিন্ন মঞ্চে ব্যবহার করা হচ্ছে, যার দ্বারায় প্রয়োজন অনুযায়ী আলোর প্রয়োগে আমরা সমর্থ হচ্ছি। কিন্তু এ ব্যাপারে সতু সেনই প্রথম ব্যক্তি যিনি মঞ্চকারু, স্বাভাবিক দৃশ্যপট পরিকল্পনা, পোশাক পরিচ্ছদের স্বাভাবিকতা, রূপসজ্জার স্বাভাবিকতা ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে গেছেন। এ সম্পর্কে সতু সেনের বক্তব্য তুলে ধরছি—"মঞ্চকারু বা মঞ্চশিল্প বিষয়টা, ব্যাপক অর্থে কোন একটি নাটককে মঞ্চস্থ করার জন্য যাবতীয় কর্তব্যের সবটুকুই মঞ্চশিল্পগত, অন্যান্য আরও অনেকের মতই ডিজাইনার, ছুতোর, বিদ্যুৎবিদ্, প্রভৃতি সকলেই এই মঞ্চশিল্পের প্রক্রিয়ার ভুক্ত। বাস্তবিক, একটা নাট্য প্রযোজনার সার্থকতার জন্য অনেকখানি দায়ী হওয়া সত্বেও প্রায়শই এইসব শিল্প অবহেলা বা অপপ্রকাশের আঁধারে চাপা পড়ে থাকে। বহু সময়ে এ সবের অভাবে যথাকালে পুঙ্খানুপুঙ্খ আবশ্যকীয়ের ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটে, সু-অভিনয় ব্যাহত হয়।

থিয়েটার এমন একটা আর্ট যা বিভিন্ন শিল্পের যোগফল। এমন কি দৃশ্যাবলীর যথোপযুক্ত ব্যবহারও একটা শিল্প যার দ্বারা প্রেক্ষাগৃহ অবশ্যই প্রভাবিত হয়ে থাকে।

অসময়ে এবং ত্রুটিপূর্ণ-ব্যবহারে একটা দৃশ্যকে বানচাল করে দেওয়া যায় খুব সহজেই। ধরুন, একটা প্রায়ান্ধকার ঘরে ঢুকে অভিনেতা 'সুইচ' টিপলেন—কিন্তু অভীষ্ট জ্বললো না। আলো জ্বলল না। অথচ খানিক বাদে সেই অভিনেতা অন্য দিকে হেঁটে যেতেই হঠাৎ রহস্যজনক ভোজবাজীর মত কোথা থেকে আলো জ্বলে উঠলো। বহু সময় এমনও হয়েছে যে অভিনয়ে নাটকটির বিষয়ে প্রম্পটার বিন্দুবিসর্গ না জানায় প্রয়োজনীয় বিরতির মুহূর্তে গড়-গড় করে সংলাপ বলে যাচ্ছে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে মঞ্চকারু একঘেয়েমীতে ভরা। কিন্তু সাগ্রহে এবং আন্তরিক ভাবে বিষয়টিকে নিলে আর একঘেয়ে থাকে না। কাজটি আগ্রহোদ্দীপক, নতুন নতুন ভাবনার উদয়ে এবং নব নব আবিষ্কারের ফলে ক্রমেই সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে। এর ফলে এই শিল্পটি হয়ে উঠেছে অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তনশীল। মঞ্চকারু নামধারী এই শিল্প-বিজ্ঞানটির সমস্ত বিভাগ একমাত্র সূক্ষ্ম নির্দেশনার মাধ্যমেই—যথাযোগ্য আকর্ষণ বজায় রেখে একে সমস্ত প্রয়োজনার সাথে সমতাল করা সম্ভব।"

মঞ্চকারু শিল্প সম্পর্কে সতু সেন মহাশয়ের উক্তি প্রয়োগকর্মের প্রতি একান্ত প্রয়োজ্য। আমাদের দেশে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে মঞ্চের এই কারুকর্মটির প্রতি দৃষ্টিদান করা হত না। এতৎ সম্পর্কে আমাদের কোনো পরিষ্কার ধারণা ছিল না। ফলে, মোটামুটি একটা ধারণার অনুবর্তী হয়ে আমরা নাট্যশিল্প কর্মের বিভিন্ন দিকগুলি কোনরকমে দায়সারারূপে নিষ্পন্ন করতাম। অবশ্য একথাও স্বীকার্য, নিজবুদ্ধিবলে মঞ্চকারু ও আলোক প্রক্ষেপণের কাজটি কেউ কেউ কোনো কোনো সময়ে যে চমকপ্রদ করে তোলেননি তা নয়। কিন্তু বিজ্ঞানভিত্তিক-ভাবে যে কাজটি করা উচিত ছিল, তার ধারে কাছে দিয়েও তাঁরা যেতেন না। ফলে, নাট্য-পরিচালককে বহু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত। এ সম্পর্কে এখানে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করা বোধ হয় খুব অযৌক্তিক হবে না। কারণ এই অভিজ্ঞতার কথা থেকে জানতে পারা যাবে যে, মঞ্চকারুকৃৎ ও আলোক নিয়ন্ত্রণকারীর সঙ্গে মাঝে মধ্যে পরিচালককে কি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত।

১৯৬৬ সালে আমি স্টার থিয়েটারে শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব অবলম্বনে নাটক রচনা করি। এই নাটকের যিনি মঞ্চকারুকৃৎ ও আলোক-নিয়ন্ত্রণকারী ছিলেন, তিনি বাংলা নাট্যশালার চতুর্থ-দশকের এক প্রখ্যাত শিল্প-নির্দেশক ও আলোকনিয়ন্ত্রণ-কারীরূপে সর্বজনপরিচিত ব্যক্তি। ফুল-রিহার্সাল বা শেষ মহলার দিন তিনি দৃশ্যপটের সঙ্গে আলোক প্রক্ষেপণের মোটামুটি কতকগুলো কাজ করতেন কিন্তু আমার তাতে মন ভরতো না। তাই 'শ্রীকান্ত' নাটকের ফুল-রিহার্সালের দিন আমি তাঁকে বললাম, যেখানে শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ ডিঙ্গি নৌকা চেপে নদীর বক্ষে মাছ চুরি করতে বেরিয়েছে, সেখানে আলোক স্থির হয়ে থাকায় ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তের ভাবের অভিব্যক্তি চোখে মুখে পরিষ্কাররূপে ফুটে উঠছে না। কাজেই নৌকা চলার সঙ্গে সঙ্গে আলোকেরও পরিবর্তন হওয়ার প্রয়োজন। তিনি আমার কথায় অত্যন্ত রুষ্ট হলেন, বললেন, কাল অভিনয় কালে সে সব সূক্ষ্ম কাজ আপনি দেখে নেবেন। আজ আমি সারা রাত্রিব্যাপী আমার সহকর্মীদের নিয়ে আলোকের কাজ সম্পূর্ণ করব। কালকের অভিনয়ে আপনি সেটা মিলিয়ে নেবেন। আমি বললাম,

সে কি কথা; কালকে Public-show; আর আজ আমি সর্ব বিভাগের কাজে হিসাব-নিকাশ দেখে নিতে পারবো না? জবাবে তিনি বল্লেন, আপনি তো জানেন ইতিপূর্বে কোনো নাটকেরই ফুল-রিহার্সালে আমি আলোকের কাজ সম্পূর্ণরূপে দেখাই নি। কথাটা সত্য। এঁরা পরিচালককে বাদ দিয়ে, শিল্পীদের বাদ দিয়ে, আলোর উৎকর্ষ সাধনে তিনি এবং তাঁর পূর্ববর্তীরা ব্যস্ত হতেন একান্ত গোপনে। ফলে, ফুল-রিহার্সালে যে আলো আমরা পেতাম, তার চেয়েও আলোর উৎকর্ষতা Public showতে যে বেশী দেখা যেত সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার। আন্দাজে কাজ সারা। ফলে, প্রথম অভিনয়ের দিন আলোর কাজটি আলোক নিয়ন্ত্রণকারী পরীক্ষামূলক ভাবে করতেন। শিল্পীদের Individual light-এর যেখানে দরকার হত, সেখানে adjust করতে প্রথমদিন এঁরা হিমশিম খেয়ে যেতেন। ফলে প্রথম অভিনয়ের দিন আলোর কাজটি ছিল সম্পূর্ণ-পরীক্ষামূলক। আমার অভিজ্ঞতা থেকে, তাই সেই প্রবীণ শিল্প নির্দেশককে বলেছিলাম, ইতিপূর্বে কোনো নাটকে এইরকম দৃশ্য দেখিয়েছেন কি, যেখানে নদীতে ভাসমান জেলে ডিঙ্গি, স্থান হতে স্থানান্তরে ভেসে চলেছে? কাজেই এই দৃশ্যটির কাজ আজকে এই মহলায় সম্পূর্ণ করার জন্যে আপনাকে আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। কিন্তু আমার সে অনুরোধ তিনি রক্ষা করেন নি। এই সব কারণে অনেক সময় বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের পরিচালককে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হোত।

বর্তমান কালে মঞ্চ-আলোকের কাজে তাপস সেন বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। সারা ভারতবর্ষে একাজে তিনি এখন একক এবং অদ্বিতীয়। তাঁর কাজের পদ্ধতি পূর্বতন আলোক নিয়ন্ত্রণকারী বা Light Director দের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্। মহলার সময় তিনি একাধিক দিন প্রেক্ষাগৃহের মধ্যস্থলে একটি মাইক এবং speaker নিয়ে বসেন এবং মহলার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীদের বিভিন্নস্থানে চলাফেলার সঙ্গে সঙ্গে আলোকের গতিপথ পরিবর্তনের জন্য তাঁর সহকর্মীদের নির্দেশ দিয়ে থাকেন। কোনো গোপনীয়তা রক্ষা করায় তিনি ধার ধারেন না। ফলে, পরিচালককে যেমন আলোকের বিষয় তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল করে তোলেন অপরদিকে শিল্পীরা light zone-এর বাইরে চলে গেলে তার অসুবিধার কথা তিনি সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেন।

স্বর্গগত সতু সেন মহাশয়ের উত্তরসাধক তাপস সেন তাঁর নতুন কর্মপদ্ধতিতে বিস্ময়কর কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

ইতিপূর্বে প্রযোজনার ক্ষেত্রে বর্তমানে ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নাটক অভিনয় না হওয়ার কথা উল্লেখ করেছি। গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ; দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ খ্যাত নাট্যকারগণের নাটক, বর্তমানে কাল উপযোগী সম্পাদনা করে নিয়ে, আমরা যদি সেই নাটকগুলির পুনরভিনয় করার জন্য সচেষ্ট হই, তাহলে নাট্যপ্রয়োগকর্মে সেদিন যে নাটকগুলির উন্নতমান রক্ষা করা সম্ভব হয়নি সেগুলি বোধ হয় নতুনভাবে বর্তমানে প্রয়োগ করতে পারলে; নাট্যামোদীদের পরিতৃপ্ত করতে পারে। এ বিষয়ে নটসূর্য নজীর স্থাপন করে গেছেন।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের নাট্যমন্দির এবং ১৯২৩ সালে স্টার থিয়েটারে আর্ট থিয়েটার কর্তৃক পরিচালিত চারটি পৌরাণিক নাটক, যথা, নাট্য-মন্দিরের সীতা ও নরনারায়ণ এবং আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের কর্ণার্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গে স্বর্গগত নাট্যকার শ্রদ্ধেয় শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয় যে আলোচনা করেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। নাট্যাচার্যের আর্ট

থিয়েটারের আবির্ভাবের আগে বাংলা থিয়েটারকে সঞ্জীবিত রেখেছিলেন যাঁরা এবং পুরাতনে আর নূতনে সেতুবন্ধ রচনা করেছিলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে স্মরণীয় এবং বরণীয় হয়ে থাকবেন অপরেশচন্দ্র * * * * নাট্যাচার্যের প্রতিষ্ঠানের সংগে আর্ট থিয়েটারের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিল, তাই সৃষ্টিতেও কিছু পার্থক্য দেখা দিত। আর্ট থিয়েটারের কর্ণার্জুন ও নাট্যাচার্যের 'সীতা'য় আর নাট্যাচার্যের 'নরনারায়ণে' আর আর্ট থিয়েটারের শ্রীকৃষ্ণে এই পার্থক্যটা পরিষ্কার চোখে পড়েছে। নাট্যাচার্যের প্রতিষ্ঠানে, নাটকের ভেতর দিয়ে যে কাব্য সৃষ্টি হত, প্রযোজনায় যে যে শিল্প চেতনা প্রকাশ পেত, যে আবেগ অন্তরকে দোলা দিত, আর্ট থিয়েটারের সৃষ্টিতে তার অভাব দেখা যেত।

কর্ণার্জুনে যেমন বিরাট সেটিংস ব্যবহার হত, 'সীতা'তেও তার চেয়ে কিছু কম হত না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলতে পারি প্রথম দৃশ্যে যে বেদীর উপর সীতাকে নিদ্রিত দেখা যেত সেই বেদীটির গঠন প্রাচীন স্থাপত্যের কোনো ইঙ্গিতই দিত না। দ্বিতীয়তঃ রামায়ণের ঐ কাহিনী রূপায়িত করতে সাঁচীর স্তূপের বিখ্যাত তোরণটির অনরূপ একটি তোরণও দেখা যেত। * * * 'কর্ণার্জুনে যে স্থাপত্য দেখা যেত তা কোনো কালেরই পরিচয় বহন করত না। Anachronism সত্ত্বেও 'সীতার' সেটিংস নাটকীয় বিষয়বস্তুর সংগে অভিনয়ের সংগে যেমন অঙ্গাঙ্গি হয়ে দর্শক মনে একটা ছাপ রেখে দিত, 'কর্ণার্জুন' তা দিত না। 'কর্ণার্জুনে' প্রত্যেক বড় বড় সেট-সিনের অভিনয়ের অন্তে দীর্ঘকাল বিরতি দিতে হত পরবর্তী সেট তৈরীর সময় নেবার জন্য। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ দেখাবার জন্য আর্ট থিয়েটার নামক প্রতিষ্ঠানেও কাঠের রথ আর মাটির ঘোড়া মঞ্চে স্থান দেওয়া হত। দীর্ঘকাল ধরে কর্ণের আর অর্জুনের প্যাকাটির তীর বর্ষণ দেখিয়ে যুদ্ধের Illusion সৃষ্টির চেষ্টা করা হত। বৃষকেতুকে করাত দিয়ে কেটে দেখান হত যে, সে আসলে অক্ষত রয়েছে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের কোলে। কাগজের হাতীতে চড়ে ঔরঙ্গজীব যুদ্ধ করেছেন তাও দেখেছি গোলকুণ্ডা নাটকের অভিনয়ে। অবশ্য এসব ব্যাপার দর্শকদের পীড়া দিত না। যদি পীড়া দিত, তাহলে ও নাটক অমন চলত না।

কিন্তু 'কর্ণার্জুন' চলবার কারণ ওগুলি নয়। 'কর্ণার্জুনে' যে বাইরে সংঘাত আছে, যে গতি আছে এবং ভাষায় সেই সংঘাতকে এবং সেই গতিকে দর্শক মনে সংক্রামিত করবার যে শক্তি আছে, তাই শক্তিমান অভিনেতৃদের সহায়তায় দর্শকদের মায়ালোকে সরিয়ে নিতে পারতো। 'কর্ণার্জুন' রচয়িতা অপরেশচন্দ্র নিজেকে গিরিশের শিষ্য বলে পরিচিত করতেন। তাঁর গদ্য ও পদ্য দুইই মিষ্ট ছিল। কিন্তু গিরিশের প্রভাব তাঁর রচনার মধ্যে ছিল না— না পদ্যে, না গদ্যে। তাঁর ছন্দ গৈরিশ ছন্দ নয়, যদিচ অভিনয় উপযোগী বাঁধা; তবুও রবীন্দ্র প্রভাবের পরিচয় সুস্পষ্ট। দৃশ্যপটে এবং আবহে আধুনিকতার পরিচয় দেবার চেষ্টা না করে যদি ঐ নাটকখানিকে ভারতীয় রীতিতে অথবা এলিজাবেথিয় রীতিতে পরিবেশন করা হত, তাহলেও ঐ নাটকখানি দর্শক আকর্ষণ করতে পারতো। যেমন পারতো 'সীতা'। দুখানি নাটকেই আবৃত্তি এবং আঙ্গিক অভিনয় নতুনত্বের পরিচয় দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সে নতুনত্ব সর্বৈব সংগত হবার স্বীকৃতি দাবী করতে পারে কিনা, তা হচ্ছে স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়।

'শ্রীকৃষ্ণ' অপরেশচন্দ্রের রচনা। স্থানে স্থানে তাও সুরচিত। কিন্তু কর্ণার্জুনের মত তা তেমন সহজ ও সরল নয় * * ঐ 'শ্রীকৃষ্ণ' নাটকে দেখানো হত শ্রীকৃষ্ণের

হস্তচ্যুত সুদর্শন চক্র, অগ্নিবৃত্তের মত ঘুরতে ঘুরতে এসে মহাবীর শিশুপালের শির ছেদন করছে * * নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নরনারায়ণকে' জনপ্রিয় করেছিলেন এবং প্রয়োজনীয় অতি সহজ সংকেত দ্বারা বিরাটকে রূপ দিয়েছিলেন সার্থকভাবে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ তিনিও প্রতিফলিত করেছিলেন, কিন্তু তিনি তার জন্য কাঠের রথ বা মাটির ঘোড়া দেখাবার প্রয়োজন অনুভব করেননি। দুটো ভাঙ্গা রথের চাকা, কিছু দলিত-মথিত বৃক্ষশাখা, একটা থমথমে আবহ সৃষ্টি করে দর্শকদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে একটা দ্বৈরথ সংগ্রাম হয়ে গেছে।

বর্তমান কালে বহু সাংকেতিক বা প্রতীক ধর্মী নাটক অভিনীত হচ্ছে। প্রয়োগের দিক থেকে এই নাটকগুলি প্রায়শ উন্নতমানের বলে মনে হয়। এর কারণ বাহুল্যবর্জিত দৃশ্যপট দর্শককে ভাবিয়ে তোলার অবকাশ দেয়। নাট্য প্রয়োগে আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথকে এই ব্যাপারে পথিকৃৎ বলা চলে।

গত তিন দশকে সাধারণ রঙ্গালয়ে যে নাটকগুলি অভিনীত হয়েছে, তার মধ্যে বিশ্বরূপা থিয়েটার কয়েকটি নাটকে সূক্ষ্ম প্রয়োগ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমানে সাধারণ রঙ্গালয়গুলি নাটকের প্রয়োগকর্মে সজাগ হয়েছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে বর্তমানে বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে নাটকের প্রয়োগ-কর্মের বিভিন্ন বিভাগের প্রতি অধিকতর যত্নবান। বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁদের নতুন নাটক মঞ্চস্থ করতে হয়। আজ যে মঞ্চে নাটকটি অভিনীত হল, পরের সপ্তাহে হয়তো সেই নাটকটিকে অন্য মঞ্চে অভিনীত হতে দেখা যায়। প্রত্যেক মঞ্চের পরিধি এক নয়। ফলে, দৃশ্যপট ও আলোর ব্যাপারে প্রতিবার অভিনয়ের সময় তাঁদের বহু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

বর্তমান কালের নাট্যগোষ্ঠীগুলির মধ্যে বহুরূপীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা 'রক্তকরবী', 'রাজা ওয়াদিপাউস', 'পুতুল খেলা' এবং সম্প্রতিকালে 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের প্রয়োগ নৈপুণ্যে কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেছেন। পি-এল-টি 'টিনের তলোয়ার' নাটকটি সূক্ষ্ম প্রয়োগকর্মে দর্শকদের চমৎকৃত করেছেন। বিশেষভাবে এই নাটকে রবীন্দ্র সদনে মঞ্চের মধ্যস্থলে অপর একটি ছোট মঞ্চের ব্যবহার সত্যিই চমকপ্রদ। বর্তমানে প্রখ্যাত নাট্যগোষ্ঠীগুলি নাট্যপ্রয়োগকল্প তাঁদের নতুন নতুন ভাব ও ভাবনার দ্বারা সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় দিয়ে চলেছেন। এঁরা প্রত্যেকেই উন্নততর নাট্য প্রয়োগের ব্যাপারে সচেষ্ট। অনেকে illusion কে প্রয়োগকর্মের চরম নিদর্শন বলে মনে করেন, কিন্তু নাটকে illusion-ই বড় কথা নয়। নাটকের প্রয়োজনে illusion আসে আসুক কিন্তু অপ্রয়োজনে মায়াজাল সৃষ্টি করা উচিত নয়। এইসব illusion এর দ্বারা দর্শকমন নাটক থেকে সরে যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে একটি উদাহরণ তুলে ধরেছি। 'অঙ্গার' নাটকের শেষ দৃশ্যটি অত্যন্ত বিয়োগান্তক। কয়লাখনির খাদের মধ্যে কয়েকজন আটকে পড়া কুলি-মজুরকে হু হু করে খাদে-জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যাদের ডুবে প্রাণ বিসর্জন দিতে হল—বিয়োগান্ত নাটকের এই দৃশ্যটিতে তাপস সেন অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে খাদের ভেতরের দৃশ্যটির অবতারণা করেন এবং ধীরে ধীরে সমস্ত খাদটি কিভাবে জলে পরিপূর্ণ হয়ে অতগুলি জীবনকে গ্রাস করলো, আলোর সাহায্যে তা তিনি এমনভাবে দেখিয়েছিলেন যে যার দ্বারা দর্শকেরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেত। করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানাতো। কিন্তু এ অভিনন্দন নাট্যকারের প্রাপ্য ছিল না। প্রাপ্য হল Light ও Art Director-এর। যেখানে দুর্ভাগ্য মানুষগুলোর জন্য দর্শকদের বেদনা

অনুভব করার কথা, তার পরিবর্তে জুটলো পরম বিস্ময়ে করতালি। এখানে নাট্যকারের অপেক্ষা মঞ্চকারু সর্বাধিক কৃতিত্বের দাবী রাখলেন। বিশ্বরূপা মঞ্চে অভিনীত 'সেতু' নাটক সম্পর্কে একই কথা প্রযোজ্য। যেখানে নায়িকা রেলের তলায় আত্ম-বিসর্জন দিয়ে নিজেকে নিঃশেষ করে দিল, সেখানে নায়িকার জন্য দর্শকদের মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠার পরিবর্তে চমকপ্রদ ট্রেনের Head Light-এর আলো দর্শকদের করতালির ধ্বনিতে অভিনন্দিত হল। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার illusion-এর পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি প্রয়োগকর্মে নাটক এবং তার অভিনয়কে মধ্যমণি করে দৃশ্যপট আলোকনিয়ন্ত্রণ, আবহ সঙ্গীত, শব্দ প্রক্ষেপণ প্রভৃতি কাজগুলি প্রয়োজনমত কাজে লাগাতেন। প্রয়োগকর্মে সংযম এবং সুষম প্রয়োগের প্রতি তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। অনেকের ধারণা অভিনয়কালে তিনি অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতেন। এই প্রসঙ্গে এখানে তাঁর নিজের কথা তুলে ধরছি ঃ "অনেকে বলেন, আমার অভিনয় দেখিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হন এবং সময় সময় প্রশ্ন করেন—আপনি কি সত্যসত্যই সীতার বিরহে রামের ভাবে অভিভূত হইয়া পড়েন। আমি তাঁহাদের বলি, সত্যসত্যই ভাবে অভিভূত হইলে চারিদিকে বৈদ্যুতিক আলোর পরিবেষ্টনের সম্পূর্ণ সুযোগ পাওয়া অসম্ভব। যে মুহূর্তে লবের মুখ দেখিয়া আমি সীতার কল্পনায় আত্মহারা হইয়া যাই, সেই মুহূর্তেই লবকে আমার দক্ষিণ পার্শ্বে সরাইয়া নিজের মুখে ঐ ৫০০ ওয়াট্ ক্যান্ডাল পাওয়ারের সবটুকু আলোর সুযোগ সুবিধা সম্পূর্ণ নিজেকে গ্রহণ করিতে হয়। আত্মহারা হইলে কি এটা সম্ভব হয়? সু-অভিনয় মানেই দৃশ্যপট, স্বকীয় পরিচ্ছদ, পারিপার্শ্বিক আলোকসম্পদ সর্ববিষয়ে সজাগ থাকা। এ থাকিতে না পারিলে শুধু ভাবাহত হইলে সু অভিনয় করা চলে না।

Art শব্দের অর্থ হইতেছে—সৃষ্টি (creation)। স্রষ্টা যদি সজাগ না থাকেন তাহলে তিনি সৃষ্টি করিবেন কি প্রকারে? প্রত্যেক সু-অভিনেতা, প্রত্যেক Artist, শিল্পী নিজের মস্তিষ্কে দুইটি মানুষকে বহন করেন। একজন যিনি সৃষ্টি করেন, আর যিনি সৃষ্ট হন। একজন বিচারক—একজন কর্মী। এই দুই-এর সুষ্ঠু সমন্বয়ে সত্যকার Artist-এর জন্ম। একথা যিনি না বুঝিবেন তাঁর অভিনয় করা বৃথা। অভিনেতা শুধু পাঠক নহেন, নাট্যকারের ভাষায় পুত্তলিকা নহেন। প্রাণবন্ত সজীব সুন্দর দেহভঙ্গী ভাষার প্রত্যেক মোচড়ে ভাবকে জীবন্ত করিয়া তোলা এই হইতেছে অভিনয়ের অঙ্গ।"

নাট্যাচার্যের এই কথাগুলি অভিনয় প্রসঙ্গে হলেও প্রয়োগ প্রসঙ্গেও বিশেষভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কারণ, নাটককে বাদ দিয়ে প্রয়োগ নয়। আজকের দিনে প্রয়োগকর্মে সচেতনতা ও তার অভিনয়কে অনেক সময় গৌণ করে তুলছে। সুসংবদ্ধ নাটককে সুষ্ঠু প্রয়োগ কর্মের দ্বারা দর্শক সমীপে উপস্থাপিত করার প্রয়োজন। সঙ্গীত, আলো বা ইলিউসান প্রভৃতি নাটকের অনুষঙ্গগুলি একত্রভাবে অথবা এককভাবে যদি প্রাধান্য পায়, তাহলে নাটকের বক্তব্য গৌণ হয়ে পড়ে একথা ভাববার আজ বিশেষ করে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

বিদ্যাপতির ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিনী

শ্রীসুজিত চৌধুরী

মিথিলার কবি বিদ্যাপতি রচিত দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনীর নাম সবাই জানেন, কিন্তু তাঁরই নামে প্রচলিত আরেকখানি পুঁথি আছে, যার নাম 'ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিনী' শুধুমাত্র অনুসন্ধিৎসুরা এর খবর রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় রক্ষিত সংস্কৃত ভাষায় রচিত পুঁথিখানা সম্পর্কে সর্বপ্রথম আলোচনা করেন শ্রীগণেশ বসু।[১] পরে শ্রীসুকুমার সেন[২] এবং শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যের[৩] মত পণ্ডিতজনও স্বল্পালোচিত ঐ পুঁথিখানা সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন।

'ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিনী'তে আসলে মনসা পূজার প্রকরণবিধি বর্ণিত হয়েছে। যে ধরনের বিবরণ এতে আছে, সে ধরনের পূজা বাংলার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে সুপ্রচলিত নয়। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যের অনুবাদ থেকে প্রথম দিকের কিছু বর্ণনা তুলে দিচ্ছি ঃ [৪]

"লক্ষ্মীধর যেহেতু মধুকর নামে একটি নৌকা দিয়াছিল, সেইজন্য সুন্দর নৌকা নির্মাণ করিয়া তাহাতে পূজার ব্যবস্থা করিবে। সমস্ত দেবতা পরিবৃত মৃন্ময়ী প্রতিমা তৈরী করিয়া তাহাকে বিচিত্ররূপ দিয়া নৃত্যগীত সহকারে পূজা করিবে। 'দেবতাদ্যৈঃ'—এই বাক্যাংশের 'আদি' শব্দের দ্বারা এই বুঝিতে হইবে যে সিদ্ধ, নাগ, কিন্নর, গন্ধর্ব, যক্ষ এবং রাক্ষসদেরও গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহাদেরও পূজা করিতে হইবে। ২০ হাত নৌকা অধম, ৪০ হাত মধ্যম, ৬০ হাত নৌকা উত্তম, ১০০ হাত অতি উত্তম। নৌকা কমপক্ষে ১৪ হাত দীর্ঘ হইবে। ভূতনাথের সম্মুখে বিপুলার নৃত্যে উহা দেখিতে যাহারা সমবেত হইয়াছেন, তাহাদেরও সেখানে পূজা করিবে। ব্রহ্মা, মাধব, রুদ্র, সরস্বতী, লক্ষ্মী, পার্বতী, কার্তিক, গণেশ, কালীয়, অষ্টনাগ, জরৎকারু, আস্তিক, মর্ত্যে চন্দ্রধর, তৎপত্নী স্বর্ণরেখা, তৎপুত্র লক্ষ্মীধর, তৎপত্নী বিপুলা, দ্বিজ শ্রীধর, দৈবজ্ঞ যশোধর, দুর্লভ কর্ণধারকে পূজা করিতে হইবে। অগ্রে গণেশ এবং নৌকার অষ্ট নোহর পত্তিকে (মাল্লাকে) এবং অস্ত্রধর ভাণ্ডারীদের মধ্যে, অগ্রে এবং মুখে পূজা করিবে। লেখ্যা, রজকী, সুগন্ধা, সুরেশ্বরী, দুর্গা এবং চতুর্দিকস্থ দেবতাদের পূজা করিবে। আয়ুধ (অস্ত্র) এবং বাহনসহ ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালদিগকে পূজা এবং হোমদ্বারা দ্বিজগণ অর্চনা করিবে। বাসনা এবং শক্তি অনুযায়ী বিধিমতে বলিদানও করিতে হইবে। তারপর উত্তম ভেলায় দেবীকে স্থাপন করিবে এবং তারপর যথাবিধি দক্ষিণা প্রদান করিয়া গীতবাদ্য সহকারে পূজা সমাপন করিবে। সেই গৌহারী পৃথিবীতে নাগ নামে বিখ্যাত।"

বলা বাহুল্য, সাধারণভাবে বাংলার মূল ভূখণ্ডে মনসার যে পূজা পদ্ধতি প্রচলিত, তার সঙ্গে এ বর্ণনা মেলে না। নৌকোর উপর মনসাকে স্থাপন করে অন্যান্য দেবদেবীসহ তাঁর আরাধনার ব্যাপারটা সাধারণ বাঙ্গালীর কাছে খুবই অপরিচিত। তাই শ্রী গণেশ বসু ধারণা করেছেন যে সম্ভবতঃ মিথিলা অঞ্চলে এই ধরনের বিশিষ্ট পূজা পদ্ধতি এককালে প্রচলিত ছিল, যা থেকে বিদ্যাপতি এ আদর্শটি নিয়েছেন।[৫] শ্রীসুকুমার সেনও মোটামুটি একই

সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। পুঁথিখানি যে মিথিলার বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতিরই রচিত, সে কথা এঁরা দুজনেই মেনে নিয়েছেন। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যের বক্তব্যও অনুরূপ, তবে তিনি কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্তও। তিনি যদিও লিখেছেন, "নবদ্বীপে স্মৃতির টোল স্থাপিত হইবার পূর্বে বাঙ্গালী ছাত্রগণ স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করিবার জন্য মিথিলায় যাইত এবং সেইসূত্রে ইহা সেখান হইতে অনুলিপি করিয়া আনিয়া বাংলায় প্রচলিত করা কিছুই আশ্চর্য নহে।"[৬] কিন্তু তৎসঙ্গে সংশয়ও প্রকাশ করেছেন, "বরিশাল জেলার মনসাপূজার বিশেষ অনুষ্ঠানকে যে রয়ানি বলিয়া উল্লেখ করা হয়, ইহাতে তাহারও উল্লেখ রহিয়াছে। সুতরাং মনসা পূজার ঐ বিধি বাংলা দেশেই রচিত হইয়া ইহার উপর আভিজাত্য আরোপ করিবার জন্য তাহাতে বিদ্যাপতির নাম যোগ করা হইয়াছে কিনা, এমন সন্দেহ হইতে পারে।"[৭]

সরজমিন অনুসন্ধানের মাধ্যমে যে সমস্ত তথ্য আমরা সংগ্রহ করেছি, তা কিন্তু শ্রী ভট্টাচার্যের এ সংশয়কে আরেকটু সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত করে। বৃহত্তর বঙ্গের শ্রীহট্ট-কাছাড় অঞ্চলে নৌকোপুজো বলে একটি আড়ম্বরবহুল পুজোনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। নাম যদিও নৌকোপুজো কিন্তু নৌকো এখানে আরাধ্যা দেবীর আধার মাত্র, পুজো হয় আসলে দেবী মনসার। প্রধানতঃ তথাকথিত নিম্নবর্ণের লোকদের মধ্যে প্রচলিত এ পুজোর একটু বিস্তৃত বিবরণ দিলে আমাদের বক্তব্য বুঝতে সুবিধে হবে।

সাধারণতঃ মাঘী শুক্লাপঞ্চমীতে, অর্থাৎ সরস্বতী পুজোর তিথিতে নৌকোপুজো শুরু হয়। পুজো পাঁচদিন ধরে চলে। অন্য পঞ্চমী তিথিতেও পুজোর অনুষ্ঠান হতে পারে, তবে আবহাওয়া ভাল থাকে বলে এবং ফসল কাটার পর পর্যাপ্ত ফাঁকা জায়গা পাওয়া যায় বলে মাঘ মাসটাই সুবিধেজনক। মাঠ বা ফাঁকা কোনো চত্বরে বেশ বড় আকারের একটি নৌকো তৈরী করা হয়। নৌকোর আকার এবং আয়তন মুখ্যতঃ নির্ভর করে পুজোর্থীর আর্থিক সঙ্গতির উপর। তিনি যদি ধনী হন, তবে নৌকোর দৈর্ঘ্য দেড়শ' ফুট পর্যন্ত হতে পারে। নিদেন পক্ষে বিশ পঁচিশ ফুট না হলে অবশ্য এ পুজোর জন্যে ন্যূনতম যে সংখ্যক দেবদেবীর মূর্তি প্রয়োজন তাঁদের স্থান সঙ্কুলান হওয়াই দুষ্কর। নৌকোটি হয় সপ্ততল বিশিষ্ট, অর্থাৎ একের উপর আরেক, এভাবে সাতটি তাক বানানো হয় বাঁশ অথবা কাঠ দিয়ে। তাকের উপর থাকবে সারি সারি দেবদেবীর মূর্তি, স্থান সঙ্কুলান হলে জানা অজানা অপ্সরা কিন্নররাও বাদ যাবেন না। একেবারে নীচের তাকে অর্থাৎ নৌকোর পাটাতনে এবং তার আশেপাশে থাকবে মাঝিমাল্লারা এবং মনসামঙ্গলের সঙ্গে সম্পৃক্ত পার্থিব চরিত্ররা। দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা, গণেশ তো থাকবেনই, তার সঙ্গে দশমহাবিদ্যা ও দশাবতারও ন্যূনপক্ষে থাকবেন। মূর্তি সংখ্যা যত বেশী হবে, পুজোর মর্যাদাও ততই বাড়বে। যদিও এ নিয়ে ধরাবাঁধা কোনো বিধি নেই, কিন্তু একান্নটির মূর্তির কম কোথাও দেখিনি, সর্বোচ্চ একশ একান্নটি মূর্তিও দেখেছি। বিপুল এই দেবসমাবেশের ঠিক মধ্যিখানে সমাসীন থাকেন দেবী মনসা, অন্য মূর্তিদের তুলনায় তাঁর আকার হয় বৃহদাকার—দ্বিগুণ, তিনগুণ, কখনও বা আরো বড়।

পাঁচদিনের প্রত্যেকদিনই সমস্ত দেবদেবী স্বতন্ত্রভাবে পুজো পান, তবে সে-পুজো নামমাত্র, সমস্ত নিয়ম মেনে নিষ্ঠাভরে পুজো হয় মনসারই, উপচার এবং সময়ের সিংহভাগ তাঁরই জন্যে বরাদ্দ। পুজোর্থী যে সম্প্রদায়ভুক্ত, অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সে সম্প্রদায়েরই ব্রাহ্মণ—সাধারণভাবে তাঁরা তথাকথিত নিম্নবর্ণের লোক। তবে যেহেতু আড়ম্বরপূর্ণ এ

পূজানুষ্ঠান বিশেষ ক্ষেত্রে বর্ণহিন্দুদেরও আকৃষ্ট করেছে, তাই উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণরাও এখন আর নৌকোপূজার পৌরোহিত্যে আপত্তি করেন না। মনসামঙ্গলের স্থানীয় নাম পদ্মপুরাণ—প্রতিদিনই পদ্মপুরাণ গান হয় নাচ সহযোগে—এর নাম ওঝা নাচ। এ অঞ্চলে নৃত্যগীতের মাধ্যমে পদ্মপুরাণ পরিবেশনের একচ্ছত্র অধিকার নপুংসক বা হিজড়ে শিল্পীদের—স্থানীয় ভাষায় এদের নামে গুর্মী। এই গুর্মীরা নারীর মত সাজসজ্জা করে দুইহাতে দুটো চামর নিয়ে আসরে নামে—সঙ্গে থাকে বায়েন ও দোহার, এরা অবশ্য পুরুষই। সাম্প্রতিককালে পেশাদার গুর্মীদের সংখ্যা দ্রুত কমে যাচ্ছে, তাই এদের স্থান দখল করে নিচ্ছে এক ধরনের পুরুষ গাইয়ে—আসরে নামার আগে এরাও অবশ্য নারীসাজই গ্রহণ করে।

নৌকোপূজার অনুষ্ঠানকে আমরা যদি ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিনীর বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখি তবে উভয়ের মধ্যেকার বিস্ময়কর সাদৃশ্য চোখে পড়বেই। বৃহৎ আকারের নৌকো তৈরী করা, তার উপর সমস্ত ধরনের দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা, সেই সঙ্গে চাঁদ, সনকা, বেহুলা, লখিন্দর প্রভৃতি মানব চরিত্রকেও স্থান দেওয়া—নৌকোপূজোর এই সমস্ত ব্যবস্থাদিই বাড়ীভক্তিতরঙ্গিনীর বিবরণের অনুরূপ। এমন কি পুঁথিতে যে আছে "পূজয়েদ্ গীতনর্তনৈঃ (নৃত্যগীত সহকারে পূজা করিবে)" —গুর্মীনাচের প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সে শর্তও পূরণ করা হয়। পুঁথিতে এ ধরনের পূজার অপর নাম দেওয়া হয়েছে 'গোহারী'। বাংলায় এ শব্দটি প্রচলিত নয়, তাই শ্রী গণেশ বসু বিস্তর আলোচনার পরও শব্দটির উদ্ভব সম্পর্কে কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। শ্রীহট্ট কাছাড় অঞ্চলে নৌকোপূজারই অপর নাম কিন্তু 'গোয়ারী' পূজা এবং 'গোহারী' শব্দটি নিঃসন্দেহে তারই সংস্কৃত প্রতিরূপ। এ সমস্ত তথ্যের আলোকে এ কথা বোধ হয় নিঃসংশয়েই বলা যায় যে বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত ঐ পুঁথিতে মিথিলা অঞ্চলের অধুনালুপ্ত কোনো পূজোর বিবরণ দেওয়া হয় নি—শ্রীহট্টে ও কাছাড় জেলায় এখন পর্যন্ত প্রচলিত জনপ্রিয় একটি বিশেষ ধরনের মনসাপূজার বর্ণনাই তাতে বিধৃত। আসলে নৌকোপূজা সংক্রান্ত তথ্যাদি হাতে না থাকার দরুণই পণ্ডিতজনেরাও এ সম্পর্কে বিচার বিভ্রাটে পড়েছেন।

নৌকোপূজার উৎস ও বিবর্তন সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হলে বিস্তৃত অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সাধারণভাবে এটুকু বোধ হয় বলা যায় যে নিম্নবর্ণের সমাজের যে সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার সঙ্গে নৌকার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য, এ পূজার প্রচলন সম্ভবতঃ তারাই করেছিলেন। এখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ই নৌকোপূজার প্রধান উদ্যোক্তা। সরস্বতী পূজার দিন এ অঞ্চলে কিছুদিন আগেও জীবিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত বস্তুসমূহের পূজার প্রচলন ছিল। পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য (বিদ্যাবিনোদ) সাক্ষ্য দিচ্ছেন, "On the Sripanchami day, husbandmen worship their corn-trieves ploughshare, winnowing baskets; carpenters worship their saws, files chisels; weavers their looms and shuttles."

মনে হয় একইভাবে সুপ্রাচীন মৎস্যজীবীরা নৌকোর পূজো করেছেন। পরে যখন তারা মনসা দেবীকে গ্রহণ করলেন (মনসামঙ্গলের জালো-মালো নামক দুই ধীবরের কাহিনী তারই দ্যোতক), তখন ঐ নৌকোর উপর দেবীকে প্রতিষ্ঠা করে পূজোর প্রচলন হয়।

নৌকোপূজা, তার বর্তমানরূপে, প্রচণ্ড ব্যয়সাধ্য অনুষ্ঠান। পণ্ডিত বিদ্যাবিনোদ ১৯৩১ সালেই লিখেছেন যে এ পূজোর ন্যূনতম ব্যয় দু'হাজার টাকা, আর তখনই অর্ধলক্ষ

টাকা ব্যয় করে এর অনুষ্ঠান করতেও দেখা যেত।[৯] বলা বাহুল্য, এ অঙ্ক মোটেই অতিরঞ্জিত নয়, কারণ এতগুলি মূর্তি নির্মাণ এবং পাঁচদিনব্যাপী প্রত্যেকের স্বতন্ত্রভাবে পুজো চালিয়ে যাওয়া, অন্যান্য অনুষঙ্গসহ আর্থিক বিচারে ব্যাপারটা সহজ নয়। আজকের মাগ্‌গীগন্ডার দিনে এ পুজোর ন্যূনতম ব্যয় অন্ততঃ সাত-আট হাজার টাকা। উল্লেখযোগ্য, যে সমাজে এ পুজো জনপ্রিয়, তাদের মধ্যে এতটা সঙ্গতিসম্পন্ন লোকের সংখ্যা খুব বেশী নয়। তবু প্রতি বৎসর পনেরো-বিশখানা গ্রামের অন্তরই নৌকোপুজোর অনুষ্ঠান দেখা যায়। সাধারণতঃ মোটামুটি সঙ্গতিসম্পন্ন একজন গৃহস্থ সঙ্কল্প নিয়ে পুজোর উদ্যোগ করেন, প্রাথমিক প্রস্তুতি-টুকু হয়ে গেলে আশে পাশের দশ বিশটা গ্রামের সঙ্গতিপন্নরা এগিয়ে এসে ব্যাপারটা সঙ্কুলান করে দেন। ঠিক বারোয়ারী নয়, কিন্তু এক ধরনের সমবায়ের সহজাত মানসিকতা এর পেছনে কাজ করে, নইলে শুধুমাত্র আর্থিক কারণেই এ পুজোর চলমান ধারাটি কবেই শুকিয়ে যেত।

নৌকোপুজোর বিপুল আড়ম্বরের পেছনে সামাজিক দ্বন্দ্বের একটি পটভূমি অন্তর্লীন আছে বলে মনে হয়। এ অঞ্চলে মনসা প্রচন্ড জনপ্রিয় দেবী—নিম্নবর্ণের সমাজে তাঁর প্রতিষ্ঠা দুর্গার চাইতেও বেশী। উচ্চবর্ণের সমাজেও তিনি পূজিতা, যদিও স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা দেবী দুর্গাকেই অধিকতর সম্মান এবং মর্যাদা দিয়ে থাকেন। উচ্চবর্ণের একজন মানুষ অর্থবান হলে প্রথমেই দুর্গাপুজোর অনুষ্ঠান করেন; পক্ষান্তরে নিম্নবর্ণের মানুষের সম্পদ-প্রাপ্তির পর প্রাথমিক ধর্মীয় কর্তব্য হল মনসাকে নৌকোয় অধিষ্ঠিত করানো। দৃষ্টিভঙ্গির এই ভিন্নতা সামাজিক ইতিহাসের একটি অতীত পর্যায়ে নিশ্চিতই দ্বন্দ্ব বিবাদ এবং রেষারেষির ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। সেই সময়ে দুর্গার চাইতে মনসার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার মানসেই সম্ভবতঃ নৌকোপুজোর সঙ্গে পর্যাপ্ত আড়ম্বর যুক্ত করা হয়েছিল। হিন্দু পুরাণের বড় বড় স্বীকৃত সব দেবদেবীরা চতুর্দিকে ক্ষুদ্রাকারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবেন, মধ্যিখানে বিপুল গৌরবে বিশাল আকারের মনসামূর্তি থাকবেন সমাসীন—এ ধরনের পরিকল্পনার মধ্যে মনসার মর্যাদাবৃদ্ধির মনোভাব যে নিহিত ছিলই, এমন অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত বিবেচিত হবে না।

এই সামাজিক দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় 'ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিনী' রচিত হয়েছিল উচ্চবর্ণের সমাজে নৌকোপুজো তথা মনসাদেবীকে প্রতিষ্ঠিত করার মানসে। বিদ্যাপতি ছিলেন রাজসভার সঙ্গে সম্পৃক্ত স্মৃতি পন্ডিত—লৌকিক কোনো দেবীর সামাজিক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ থাকার সঙ্গত কোনো কারণ ছিল না। সে আগ্রহ সমধিক তাদেরই থাকার কথা, যাদের চতুঃপার্শ্বে বর্ণিত ধরনের পুজানুষ্ঠান নিয়ত আচরিত হচ্ছিল। 'ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিনী'র একমাত্র পুঁথিটি পাওয়া গেছে মৈমনসিংহ জেলায়, তাতে বিশদ বর্ণনা আছে শ্রীহট্ট অঞ্চলের বিশিষ্ট একটি লৌকিক পুজানুষ্ঠানের আর উল্লেখ রয়েছে বরিশালের রইয়ানি পুজোর। এতে মনে হয়, শ্রীহট্ট অথবা পূর্ববঙ্গে সন্নিহিত অঞ্চলের কোনো সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পন্ডিত পুঁথিখানি রচনা করেছিলেন সামাজিক সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে আর পুঁথিখানির মর্যাদা এবং কার্যকারিতা-বৃদ্ধির জন্যেই 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী'র সুপ্রসিদ্ধ রচয়িতার নাম তাতে ব্যবহার করা হয়েছিল।[১০] মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের দৃষ্টান্ত অজস্র আছে। আমাদের বক্তব্য যদি গ্রাহ্য হয় তবে সাহিত্যের ইতিহাসে পুঁথিখানার মর্যাদা লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পাবে সত্যি, কিন্তু, একটি লৌকিক আচারের উপর শাস্ত্রীয়

অনুমোদন আরোপের বিশিষ্ট প্রয়াস হিসেবে সামাজিক ইতিহাসে এর গুরুত্ব বোধ হয় সমপরিমাণেই বৃদ্ধি পাবে।

পাদটীকা ঃ—

১। G. C. Basu, "Vyadi-bhakti-Tarangini," New Indian Antiquary, Vol-VII,No. 3 & 4, PP 49-57

২। শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (পূর্বার্ধ), পৃঃ ২১৬-২১৮

৩। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ২৮৯-২৯৪।

৪। ঐ, পৃঃ ২৮৯-২৯০। মূল সংস্কৃত পাঠ উক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্ট (পঃ ৯৪৩-৯৪৯) অংশে দ্রষ্টব্য।

৫। G.C.Basu, op. cit. P 541 শ্রীসুকুমার সেন পূর্ব উল্লেখিত গ্রন্থে (বাঃ সাঃ ইঃ) বলেছেন, "পুঁথিটি বিদ্যাপতির রচনা বলিয়াই মনে হয়।" অতঃপর প্রশ্ন করেছেন; "তাঁহার সময়ে কি মিথিলায় (এবং উত্তরবঙ্গ-এ) মহরমের ঢাল ঘুরানোর মত সমারোহে বিচিত্রা ঘুরানো হইত।" শ্রী সেন পুঁথিখানির প্রাপ্তিস্থান উত্তরবঙ্গে বলে লিখেছেন, আসলে কিন্তু পাওয়া গেছে মৈমনসিংহে।

৬। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, বাং মঃ কাঃ ইঃ, পৃঃ ২৯৪

৭। ঐ, পৃঃ ২৯৩

৮। P. N. Bhattacharjee; "Folk customs and Folklore of the Sylhet District in India," Man in India, Vol-X,P 259

৯। Ibid, P 255.

১০। শ্রীহট্ট অঞ্চলে বলা হয়, "ডালের মধ্যে মুসুরী
দেবতার মধ্যে বিসরী।"

অর্থাৎ ডালের মধ্যে মুসুরী যে রকম শ্রেষ্ঠ, দেবতার মধ্যে বিষহরিও তদ্রূপ।

১১। শ্রীহট্টের সঙ্গে মিথিলার ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল। শ্রীহট্টীয় ব্রাহ্মণদের একটা বড় অংশ মিথিলাগত বলে দাবী করা হয়ে থাকে। শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্যে শ্রীহট্ট থেকে নিয়মিতভাবে ছাত্ররা মিথিলায় যেতেন। তাই বাংলার সর্বত্র যেখানে রঘুনন্দন স্মৃতি অনুসারে ক্রিয়া কাণ্ডের অনুষ্ঠান হয়, শ্রীহট্টের অধিকাংশ অঞ্চলে সে ক্ষেত্রে মিথিলার বাচস্পতি মিশ্রের স্মৃতি অনুসৃত হয়। ফলে মৈথিলী "দুর্গাভক্তিতরঙ্গনী"র আদর্শে পুঁথি রচনা করা এবং তার সঙ্গে বিদ্যাপতির নাম যুক্ত করার মত সাংস্কৃতিক পটভূমি এখানে বর্তমান ছিল।

কয়েকটি স্বল্প প্রচলিত বাঙালী পদবী

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় স্বরাই

বাঙালী জাতির পদবী অসংখ্য ও বিচিত্র। এই পদবীগুলির অর্থবিচার, ভাষা বিশ্লেষণ ও তাৎপর্য নির্ণয় দুরূহ কার্য। ইহাদের প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতার সোপান বাহিয়া স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কষ্টকল্প। তবে ইহাদের গতিপ্রকৃতির সম্ভাব্যকারণ দর্শন বৃন্তহীন কুসুম কল্পনা নয়; বরং সমাজ-ইতিহাস প্রসিদ্ধ। আলোচনাটি সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসিদ্ধ না হইলেও বস্তুনিষ্ঠ অর্থাৎ স্বচ্ছন্দবিহারী নয়, মৃত্তিকাচারী।

আটা। মুসলমান নবাব কর্তৃক দেয় পদবী। যাহার অর্থ দান-ধ্যান, gift, favour। হয়তো ইহাঁরা বিত্তবান্ ও হৃদয়বান্ ছিলেন। দান-ধ্যান ও বদান্যতায় বেশ সুনাম ও সুখ্যাতি ছিল। তাই নবাব হিন্দুদের 'আটা' পদবী দান করেন। চলতি বাংলায় একটা কথা আছে—'এত আটা কিসের?' Dictionary of Foreign words in Bengali (By G. Banonergi & Banonerji. P. P. 325) মতে Ata n. A hereditary title. (p) Ata' t from (A) Atabakhsh one endowed with good parts, a gifted man, (Ata giving, gift, bounty, favour, grant).

কড়কড়ি। পশ্চিমবঙ্গে গোয়ালাদের মধ্যে এই পদবীটি দৃষ্ট হয়। ইহা বংশগত নয়, বৃত্তিমূলক। এঁদের পূর্বপুরুষরা লোহা-পিতলের কড়াই তৈরি করিতেন তাই তৈরির সময় 'কড়কড়' শব্দের উৎপত্তি হেতু স্থানীয়লোকেরা ইহাদের 'কড়কড়ি' বলিয়া ডাকিতেন। সেইহেতু পদবীর স্থান লোকের কথায় বা মুখে 'কড়কড়ি,-তে রূপ পাইয়াছে। শব্দটি ধ্বন্যাত্মক। অর্থাৎ আলঙ্কারিক ভাষায় Onomatopocia: Sound makes the meaning. তুলনীয়: গড়গড়ি, চড়চড়ি, ফড়ফড়ি।

কণ্ঠ। বাঙালীজাতির পদবীতে দেহের বিভিন্ন অংশের উল্লেখ আছে। যেমন, গণ্ড, ধড়, গাল, চরণ ইত্যাদি। 'কণ্ঠ' অর্থ বৃক্ষের নাম মদনবৃক্ষ বা ময়নাগাছ। পদবীটির পূর্ববঙ্গে সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই পদবীধারী ব্যক্তিগণ অধিকাংশই সুকণ্ঠের অধিকারী। অর্থাৎ সঙ্গীতপ্রিয়। এই প্রসঙ্গে ঢপ্‌কীর্তন মধুকানের নাম উল্লেখ্য। 'কান' শব্দটি কিন্নর শব্দজ (=সঙ্গীতশিল্পী)।

কদম। পদবীটি বাঁকুড়া জেলার প্রত্যন্ত সীমান্তে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। সম্ভবতঃ ইঁহারা আদিবাসী ও অনুন্নত সম্প্রদায়। চেহারা ও চালচলনে তাই মনে হয়। আদিবাসীদের পদবী অধিকাংশই গাছগাছড়া ও জীবজন্তু হইতে গৃহীত। 'কদম' বৃক্ষের নাম। কদমফুল আদিবাসী (সাঁওতাল) উৎসব-প্রিয়। বর্ষার সমাগমে কদম পাতা ও কদমফুলে মাথা সজ্জিত করিয়া সাঁওতাল যুবকযুবতীরা নৃত্যগীত করেন এবং পরস্পরের মধ্যে প্রাক্-বিবাহ ব্যবস্থা পাশ করিয়া থাকেন। এককথায় পাকাদেখা পর্বটি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। 'কদম' শব্দের ভিন্ন অর্থ 'পা' অর্থাৎ জোর কদম। যাঁহারা জোর কদমে যাতায়াতে পটু। হয়তো কোন জমিদার বা ভুস্বামী ইঁহাদের 'কদম' উপাধি দেন। অর্থবিশ্লেষণে রূপ

পায় যাহারা সরকারের খবরাখবর একস্থান হইতে অন্যস্থানে দ্রুতপায়ে পেঁছানোর কাজে নিযুক্ত থাকিতেন। তখন দ্রুতগামী যানবাহনের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না বলিলেই চলে। অগত্যা 'পায়ে হেঁটে' সংবাদ আদানপ্রদান হইত। পদাতিকদূত (সংবাদ-সরবরাহক)।

কপাট। কবাট। পক্ষে প=ব, "কপাটস্ত কবাটকমিতি দ্বিরূপ কোষঃ।"

বৈষ্ণবপদে :—'মন্দির বাহির কঠিন কপাট' লক্ষণীয়। একটি গানে :—

'ভিতর দুয়ারে লেগেছে কপাট বাহির দুয়ার খোলা ......

'কপাট' পদবীধারী ব্যক্তিরা কি সমাজে খুব রক্ষণশীল পরিবার? অবশ্য আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বলা হইয়াছে 'কপাট' অর্থ শিরোহস্থি। মস্তকের অস্থি অর্থাৎ দেহের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ। এই অর্থে বোধ হয় ইহারা সমাজে মাথার মণি। অন্য অর্থে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে দীক্ষিত পুরুষ।

গেঁটে। বর্ধমান অঞ্চলে বাগদীদের মধ্যে এই পদবীটি পাওয়া যায়। গেঁটে অর্থ গাটযুক্ত (লাঠি)। বেশ দীর্ঘ ও ঋজু। ইঁহাদের দৈহিক গড়ন বেশ পেটানো লোহার মতো শক্ত ও মজবুত। গেঁটে লাঠি ইহাদের জীবিকার প্রধান অঙ্গ। জমিদার প্রভৃতির নিকট ইহারা লাঠিয়াল নামে পরিচিত। লাঠি খেলায় ইহারা ওস্তাদ। ইহারা জমিদার কর্তৃক নিযুক্ত। চরদখল, দাঙ্গাহাঙ্গামা ও লুটপাটে ইহারা জমিদারের দক্ষিণহস্তস্বরূপ। এই প্রসঙ্গে 'গেঁটে' কড়িও উল্লেখ্য। অর্থাৎ যে কড়ির পেটটা গর্ত ও খুব শক্ত।

গৌড়। দেশের নাম (Place-name), বাংলার নবাব হুসেন শাহের রাজধানী গৌড়। মালদা জেলায় অবস্থিত। কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় গ্রন্থে বাঙালীকবি গৌড় অভিনন্দ নাম পাওয়া যায়। শেরশাহের একজন হিন্দু সেনাপতি ছিলেন, নাম ব্রহ্মজিৎ গৌড়। বর্তমানে কর্ণাটক রাজ্যের একজন কংগ্রেসকর্মী এইচ. বি. গৌড়। সম্ভবতঃ ইহাদের পূর্বপুরুষ নবাবীআমলে দক্ষিণ ভারতে কার্যব্যপদেশে বসবাস করিতে থাকেন। দেশের নাম পদবীতে ঠাঁই পাইয়াছে। ইহার কাছাকাছি শব্দ 'গৌড়ী' পদবীও দেখিতে পাওয়া যায়।

ঘুরপাক। ২৪ পরগণা জেলায় গঙ্গানদীর তীরের বাসিন্দা। জাতিতে মালা (কৈবর্ত)। ইহাঁদের জীবিকা নদীতে নৌকা লইয়া 'ঘুরে ঘুরে পাক' খাইয়া স্রোতের প্রতিকূলে বা অনুকূলে মাছ-ধরা। ইহাদের কাজের ধরন 'ঘুরে ঘুরে পাক' খাওয়া হইতে লোকের মুখে মুখে 'ঘুরপাক' শব্দটি প্রচার হয়। পরে পদবীতে আশ্রয় পায়।

চেয়াড় / চিয়াড়। চিয়াড় [চি=চৌ=চতুর্—আড়=আর (হি— বেধনাস্ত্র), চেয়াড়ও হর] চতুর্মুখ বাণ বিশেষ। "দোয়াড় চিয়াড় বাণ করবাল খরশান"— কবিক। "মহাবীর চিয়াড় চাপড়ে করে রণ"কবিক—"মিথ্যা হইলে চেয়াড়ে কাটিব তোর নসা"—কবিকঙ্কণ যাহারা বাঁশের চেঁচাড়ি (চেয়াড়/চিয়াড়) তৈরি করিতে অভ্যস্ত এবং ব্যবহারে পটু। ইহাঁরা আদিবাসীভুক্ত। পেশায় দক্ষ। এই অর্থে 'চেয়াড়' শব্দটি পদবীতে স্থান লইয়াছে।

ছড়ি। বেতের অনুরূপ। শিবের গাজনে সন্ন্যাসীরা (ভক্ত্যারা) বেতের ছড়ি ব্যবহার করিয়া থাকেন। উদ্দেশ্য অশুভশক্তি বিতাড়ন। অনুরূপ ক্রিয়াকলাপ "হো জাতিরা গ্রাম্য দেবতার বার্ষিক পূজানুষ্ঠানের সময় গৃহশান্তি, উত্তমবৃষ্টি, উত্তম ফসল এবং শিশুদের মঙ্গলের জন্য ভূত তাড়ানোর উদ্দেশ্যে ধর্মের গাজনের মতোই শোভাযাত্রা বের

করে। সেই সময় তাদের হাতে থাকে একগাছা ছড়ি।" (রাঢ়ে ধর্মপূজা, অমলেন্দু-মিত্র—রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, বর্ষ ৬, সংখ্যা ১, পৃ ৮৫)।

ইহাও হইতে পারে যে নবাব ইহাদের হাতে 'ছড়ি' তুলিয়া দেন অপরাধীকে শাস্তি দিবার জন্য। সেই থেকে শব্দটি পদবীতে দাঁড়াইয়াছে। তুলনীয় ঃ চুলী, সানা (corselet)

ঢোল। চলতি বাংলায় একটা কথা আছে 'ঢ্যাড়া দেওয়া' অর্থাৎ রাজার বা জমিদারের কোন আদেশ ঢোল বাজিয়ে জনসমক্ষে প্রচার করা। ই'হারা কি প্রচারবিভাগের অধিকর্তা? আবার ইহাও হইতে পারে ই'হারা ধনাঢ্য ও বিত্তশালী ব্যক্তি। তাই 'ঢোল' উপাধি ই'হাদের উপর বর্তাইয়াছে। কেননা 'ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়েছে' (অর্থ= কৌলিন্যে) প্রবাদটির চল আছে। শব্দটি বাদ্যযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। তুলনীয়—ঢাক, বংশী। অবাঙালীদের মধ্যে 'পাখোয়াজ' পদবী দৃষ্ট হয়।

তা। 'তাপ' শব্দের অপভ্রংশ রূপ 'তা'। বর্ধমান জেলায় উগ্রক্ষত্রিয়ের মধ্যে এই পদবীটি দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহাদের চলতি কথায় আগুরি/আগরি=সংস্কৃতে 'অগ্রহারিক' নামে পরিচয়। পদবীটির বিশেষত্ব যে ঐ জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অন্য জেলায় ইহা দেখা যায় না। প্রাচীনকালে ই'হারা সামরিক বিভাগে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন, পরে সৈনিকবৃত্তিতে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। নিজেদের মধ্যে 'তা' (=তাপ) জিয়াইয়া রাখিয়া অন্যের তাপকে দমন করিতেন। অর্থাৎ কোন রাজা বা জমিদারের অধীনস্থ প্রজারা বিদ্রোহও অস্থিরচঞ্চল হইলে ই'হারা তাহাদের সমুচিত শাস্তি দিতেন। উগ্রক্ষত্রিয়ত্ব শব্দটির মধ্যে রণনীতি ও যুদ্ধকুশলতার আঁচ পাওয়া যায়। সমাজে উত্তাপ সৃষ্টি করা এবং তাহা বজায় রাখা ই'হাদের বংশগত বৃত্তি ছিল।

দই। "শ্রীরামপুর কোর্টের এফিডেফিট বলে আমি মদনমোহন দই-এর পরিবর্তে মোদক হইলাম।" (যুগান্তর; আগষ্ট—সেপ্টেম্বর ঃ '৭৬)।

উপরিউক্ত এফিডেফিট সূত্রে স্পষ্টই বোঝা যায় যে 'দই' পদবীধারী ব্যক্তিটি মিষ্ট দ্রব্যাদির দোকান করিতেন এবং ই'হাদের দোকানে দই-এর খুব নামডাক ছিল, এবং দোকানী দই-পাতায় বেশ নাম করিয়াছিলেন। ফলে বংশগত পদবীর স্থান অধিকার করে বৃত্তিগত পদবী। লোকের মুখে মুখে 'দই' কথাটি ছড়িয়ে পড়ায় উহারা 'দই' পদবী ব্যবহার করিতে থাকেন। পরে অধস্তন পুরুষের নিকট ঐ পদবীটি শুনিতে খারাপ লাগায় বা জাত ব্যবসার পরিবর্তন হওয়ায় 'মোদক' পদবীতে ভূষিত হন। এইভাবে সমাজে পদবীর পালাবদল হইতে দেখা যায়।

বহুগুণা। বহুগুণসম্পন্ন ব্যক্তি। হেমবতীনন্দন বহুগুণা জানাইয়াছেন যে তাঁহারা বাংলাদেশ হইতে উত্তর প্রদেশে কয়েক পুরুষ আগে আসেন, এবং ঊর্ধ্বতন পুরুষরা কবিরাজী চিকিৎসা করিতেন। কবিরাজী চিকিৎসার মধ্যে বহুগুণের আকর দেখা যায় অর্থাৎ নানান বিষয়ে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান থাকা দরকার।

একজনের মধ্যে বহুগুণের সমাবেশ দেখিয়া সাধারণ মানুষ স্তম্ভিত ও বিস্ময় বোধ করিতেন। আশ্চর্যবোধের কারণ এক ব্যক্তির মধ্যে কত (=বহু) গুণ! বহবঃ গুণাঃ বর্ত্তন্তে যস্মিন=বহুগুণাঃ।

বালা। ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বালা ∠বল্লহ∠বল্লভ। 'বালা' শব্দটি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলায় পুং এবং স্ত্রীরূপ প্রয়োগ পাওয়া যায়। চর্যাপদে—

উ'চা উ'চা পাবত তহি' বসই সবরী বালী।

মোরঙ্গি পিচ্ছ পরহিন সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী ॥
(উঁচা পাহাড়াতে　　বসতি করিছে
শবরী নামেতে বালা।
ময়ূরের পাখ　　করি পরিধান
গলেতে গুঞ্জার মালা ॥) —মণীন্দ্রমোহন বসু কৃত রূপান্তর।

মধ্যযুগের বৈষ্ণবশাখায় বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যে সংবাদ পাই যে রাহীর বয়ঃক্রম 'আঠ-চারি বরিষের বালা'।

মনসামঙ্গল কাব্য—শ্রীমন্ত সদাগর অংশ (কবিকঙ্কণ)
'বালিঘাটা এড়াইল বেনিয়ার বালা।
কালীঘাটে গেল ডিঙ্গা অবসান বেলা ॥
মহাকালীর চরণ পূজেন সদাগর।
তাহার মেলান বেয়ে যায় মাইনগর ॥'

গ্রাম-বাংলায় একটা চলতি কথা চলে—'বালা বাড়ে দুঃখ খণ্ডে'। এই প্রসঙ্গে 'বল্লভ' পদবীও আলোচনার যোগ্য। 'বল্লভ'—Etymologically, means a husband, master, lord etc. In certain inscriptions found in the Ganjam District of Orrisa this expression (i. e. বলভ) and expressions like বল্লভ-দুর্ল্লভ have been found. From the context of such records it appears that term বল্লভ represented a high rank among the court-officials. It probably denoted the rank of a noble, a baron, or superintendent. (T. Burrow.—A Translation of the Kharasthi Documents from Chinese Turkestan.)

বারিক। মালা (কৈবর্ত) পদবী। বারি সম্বন্ধীয় অর্থাৎ জলেতে যাঁহাদের জীবন-জীবিকা; বারি শব্দের উত্তর স্বার্থে 'ক' প্রত্যয়যোগে সিদ্ধ বারিক। তুলনীয় 'মারিক' পদবী (প্রত্যয়-এর দিক থেকে)। পদবীটি স্যাকরা অর্থাৎ স্বর্ণকারদের। যাঁহারা ছোট্ট হাতুড়ি দিয়া ঠুক্‌ঠুক করিযা ঘা মারিয়া স্বর্ণালঙ্কারাদি নির্মাণ করিয়া থাকেন। ঠুক্‌ঠুক 'মার' ধ্বনি হইতে বৃত্তি অনুযায়ী 'মারিক' পদবী ধার্য হইয়াছে।

মন্দুনে। গ্রাম বাংলার স্বল্পদৃষ্ট পদবী। পদবীর অর্থবিশ্লেষণ খুবই দুরূহ। পদবীধারী ব্যক্তির জাত্‌ (caste) জানিতে পারিলে সহজেই পদবীর অর্থ উদ্ধার করা যাইতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের রীতিনীতিই এই যে, জাত-জিজ্ঞাসা করা অশালীন ও অভব্য আচরণ। ভদ্রলোকের সহৃদয়তার কল্যাণে আমরা জানিতে পারি যে ওঁনারা জাতিতে নাপিত। এই জাতের বংশগত বৃত্তি আলোচনা করিলে 'মন্দুনে'-শব্দটির অর্থ পরিষ্কার হয়। ভাষাতাত্ত্বিক ব্যবচ্ছেদের ফলে মন্দুনে শব্দটি আসিয়াছে মূলশব্দ 'মুণ্ড'-ক্ষৌরীক' হইতে। মন্দুনে $\angle$ মণ্ডুনে $\angle$ মুণ্ডন (=মস্তক কেশশূন্যকরণ।)

মল্ল। সংস্কৃত 'মল্ল' শব্দের অর্থ ক্রীড়ানৈপুণ্য, যোদ্ধা। মহাভারতে ভীমের সঙ্গে দুঃশাসনের মল্লযুদ্ধের সংবাদ পাই। বাঙালীদের মধ্যে 'মল্ল' পদবী দৃষ্ট হয়। বাঁকুড়ার রাজারা 'মল্ল' পদবীধারী। হিন্দী ভাষায় 'পহেলোয়ান' অর্থে-প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের রচনায় বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। ইহারই অনুরূপ শব্দ

'জাত্তি'। কানাড়ি ভাষায় কুস্তিগির অর্থে ব্যবহৃত। আমাদের প্রাক্তন উচ্চ-রাষ্ট্রপতি বি. ডি. জাত্তি মহাশয়।

মিল। 'মিল' পদবীটি আমাদের দৃষ্টিগোচরে অল্পই আসে। তুলনীয় পদবী 'প্রামাণিক'। যাহার অর্থ হইতেছে যিনি জমিদার বা নবাব কর্তৃক স্বীকৃত ব্যক্তি এবং সামান্য ভাতা পাইয়া জমিদারের কর্মচারীদের কাজের সহায়তা করেন এবং ছোটখাট মামলা-মকদ্দমা ও জমিসংক্রান্ত বিরোধ মিটমাট করিবার ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে 'মণ্ডল' বা 'মোড়ল' পদবীটিও আলোচনায় আসিয়া পড়ে। 'মোড়ল' গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তি— বিশেষ গ্রামমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। যাঁহার প্রখর-ব্যক্তিত্বে ও নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারে গ্রামবাসী (বিভিন্ন জাতের) উক্ত মোড়লের নির্দেশ স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহারই-সামীপ্য শব্দ 'মিল'। যিনি একই জাতের মধ্যে বিবাহাদির নির্দেশ দেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শলাপরামর্শ দিয়া থাকেন। সাংসারিক ভাগ-বাঁটোয়ারা ও পারিবারিক ঝগড়াঝাটি যাঁহার মধ্যস্থতায় স্থির হয়। এককথায় যিনি নিজেদের জাতের মধ্যে মিল ঘটাইয়া দিয়া থাকেন। ইঁহার বিধান সকলে সাদরে গ্রহণ করেন। ইনি স্ব-জাতের মধ্যে পূজনীয় ও শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি।

শাটিয়ার / সাটিয়ার / পদবীটি উত্তরবঙ্গে প্রচলিত। পশ্চিমদিনাজপুরে তন্তুবায় অধিকার ভুক্ত। বস্ত্রবয়ন বা বস্ত্রবিক্রয় অপেক্ষা মহাজনী কারবারই ইঁহাদের পৈতৃক বৃত্তি। ইঁহারা তেজারতি ব্যবসা করেন এবং ইঁহাদের গ্রাম্য ব্যাঙ্কার বলা চলে। মালদা জেলাতেও ঐ পদবীধারী ব্যক্তি দেখা যায় তবে তাঁহারা বিহারী। মনে হয়, বহু বৎসর পূর্বে ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজে বাংলাদেশে আসেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। ইঁহারা এখন সম্পূর্ণ বাঙালী ভাবাপন্ন এবং বাঙালী। তবে দৈহিক উচ্চতা ও গায়ের রং এবং নাকের সুদৃশ্য গড়ন দেখিলে বাঙালী বলিয়া মনে হয় না। এখন অবশ্য বাঙালীদের সঙ্গে বৈবাহিক আদান-প্রদান চলিতেছে। অ-বাঙালীত্বের কোন চিহ্ন নাই। কেবল পদবীটি পূর্ব-পুরুষের খোলস বহন করিয়া চলিয়া আসিতেছে। এখন ইঁহারা আচার-আচরণে, সামাজিক কাজকর্মে পুরা বাঙালী। শব্দটির ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ : শাটিয়ার / সাটিয়ার < শাটিয়ার বা শাটিয়াল ∠ শ্রেষ্ঠিপাল ∠ শ্রেষ্ঠিন্ ।

সভাসুন্দর। পদবীটির দেহসৌষ্ঠব ও সৌন্দর্যপ্রিয়তা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শব্দটি তৎসম এবং নবীন। পদবীর অর্থ, যাঁহারা সভামণ্ডপ সুন্দর ও শোভন মণ্ডিত করিয়া থাকেন। অর্থাৎ রজক / ধোপা সম্প্রদায়। লক্ষণীয় নরসুন্দর (নাপিত) শব্দের সামীপ্যে ও ধ্বনিসাম্যে সভাসুন্দর শব্দটির জন্ম। ইহার সঙ্গে সহজেই তুল্য পদবী খরসুন্দর (= ? মাঝি)।

—o—

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর জন্ম-তারিখ সম্বন্ধে

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

"হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও" শীর্ষক আমার একটি প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩৮৩ সনের প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধে আমি লিখেছিলাম যে ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল ডিরোজিওর জন্ম হয়েছিল। এই তারিখ গ্রহণ করার সমর্থনে আমি প্রধানতঃ ম্যাজের তথ্যযুক্ত একটি লেখার ওপর নির্ভর করেছিলাম। কারণ তাঁর ঐ রচনায় ডিরোজিওর জন্ম-তারিখ ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল উল্লেখ করার নীচে একটি বিশেষ মূল্যবান পাদটীকায় লেখা আছে—"Vide Bengal Directory for 1810 (list of births during previous year.)"। ম্যাজ ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন। তিনি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে বেঙ্গল ডাইরেক্টরি দেখে যে ঐরূপ উক্তি করেছিলেন, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কাজেই ঐ পাদটীকায় লেখা অংশটি খুবই মূল্যবান।

১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর, অর্থাৎ ডিরোজিওর মৃত্যুর পরে, ঐ দিনই, কলকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল নিম্নরূপ—

"Deaths"

* * * * *

"At Calcutta, on the 26th December, Henry Louis Vivian Derozio, Esq., aged 23 years 8 months and 8 days."

আমার আরও যুক্তি ছিল যে, ডিরোজিওর মৃত্যু সম্বন্ধে কলিকাতা গেজেটের এই লেখা সব চেয়ে প্রামাণিকরূপে গ্রহণীয়। কিন্তু মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ২৩ বছর ৮ মাস ৮ দিন হলে তাঁর জন্ম-তারিখ হয় ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল। কিন্তু ডিরোজিওর জন্ম-বছর সম্বন্ধে তাঁর জন্মের পরের বছরই বেঙ্গল ডাইরেক্টরিতে প্রদত্ত তারিখটি অধিকতর প্রামাণিক এবং সেটি গ্রহণ না করার কোন কারণ থাকতে পারেনা। কলিকাতা গেজেটে তাঁর জন্ম-বছর ও তারিখের কোন উল্লেখ নেই। কাজেই কিভাবে ঠিক করা হয় মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ২৩ বছর ৮ মাস ৮ দিন, তাও বোঝা যায় না। সুতরাং আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল।

কিন্তু প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড: রমেশচন্দ্র মজুমদার ভিন্নমত পোষণ করে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩৮৩ সনের তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যায় "হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর জন্ম-তারিখ" শীর্ষক যে প্রবন্ধটি লেখেন তাতে তিনি কলিকাতা গেজেটের ওপরে নির্ভর করে মন্তব্য করেছেন যে ডিরোজিওর জন্ম হয়েছিল ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল। তিনি

আরও লিখেছিলেন যে, কলিকাতা গেজেটে "মাস ও দিন তারিখের উল্লেখ দেখিয়া স্পষ্টই বোঝা যায় যে ডিরোজিওর পরিবারের নিকট হইতেই [গেজেটের] লেখক সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

খ্রীস্টানদের পরিবারে জন্ম মাস ও তারিখের সঠিক বিবরণ থাকে ও তাহা অনেক স্থলে সমাধির উপর প্রস্তর ফলকে লিখিত হয়। সুতরাং মৃত্যুর অব্যবহিত পরে লিপিবদ্ধ এই তারিখটি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। ....

... ইহা সহজেই বোঝা যায় যে যাঁহাদের কথার উপর নির্ভর করিয়া কলিকাতা গেজেটে ডিরোজিওর সম্বন্ধে লেখা হইয়াছিল যে মৃত্যুকালে ডিরোজিওর বয়স ছিল ২৩ বৎসর ৮ মাস ৮ দিন তাঁহারা যে নিশ্চয়ই ডিরোজিওর জন্ম-তারিখ প্রথমে জানিয়া পরে হিসাব করিয়া তাঁহার বয়স মৃত্যুকালে বছর—মাস—দিন নির্ণয় করিয়াছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। উন্মাদ ভিন্ন আর কেহ জন্ম তারিখ না জানিয়া কাহারও মৃত্যুকালে তাহার বয়স কত বছর মাস কত দিন ছিল ইহা অনুমান করিতে পারে না।"

ডঃ মজুমদারের এই লেখার পরে আমি ডিরোজিও সম্বন্ধে আরও তথ্যের অনুসন্ধান করি এবং কিছু দিন আগে ডিরোজিওর জীবৎকালে—১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত—তাঁর রচিত "Poems" প্রথম সংস্করণের দুষ্প্রাপ্য পুস্তকটি দেখবার সুযোগ পাই। এখানে তাঁর নিজের লেখা থেকে আমরা তাঁর তখনকার বয়স সম্বন্ধে যা জানতে পারি, তা থেকে তাঁর জন্ম-বছর অতি সহজেই পেতে পারি। এই কবিতাপুস্তকের "Preface"-এ (VIII পৃষ্ঠায়) তিনি লিখেছেন, "Born, and educated in India, and at the age of eighteen, he ventures to present himself as a candidate for poetic fame ; and begs leave to premise, that only a few hours gained from laborious daily occupations have been devoted to these poetical efforts..................."

Calcutta May, 1827.

ডিরোজিওর নিজের এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে তাঁর বয়স ছিল আঠার বছর। তাঁর এই বয়সের উল্লেখের কথা ঐ বছরের ১৪ই জুন তারিখের "Bengal Chronicle"-এ একজন লেখকের লেখাতেও পাওয়া যায়। এই নির্ভুল ও সবচেয়ে প্রামাণ্য তথ্যের ওপরে নির্ভর করে সহজে ও বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, ডিরোজিওর জন্ম হয়েছিল ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর বয়স সম্বন্ধে তাঁর নিজের উক্তিই যে সব চেয়ে বড় প্রমাণ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমিও কিছু প্রমাণ উদ্ধৃত করে আমার ১৩৮৩ সনের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার প্রবন্ধে দেখিয়েছিলাম ডিরোজিওর জন্ম হয়েছিল ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে। ডিরোজিওর লেখা থেকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল আমার পূর্বের সিদ্ধান্ত নির্ভুল। ১৮ই এপ্রিল তাঁর জন্ম তারিখের বিষয়ে ডঃ মজুমদারের মতের সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে। সুতরাং আমরা সঠিক জানতে পারি যে ডিরোজিওর জন্ম হয়েছিল ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল, ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল নয়। তিনি মারা যান ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর, যখন তাঁর বয়স হয়েছিল ২২ বছর, ৮ মাস, ৮ দিন, ২৩ বছর, ৮ মাস, ৮ দিন নয়।

—o—

সাতাশীতম বর্ষের সম্পাদকীয় বিবরণী

(১লা বৈশাখ ১৩৮৬ হইতে ৩১শে চৈত্র ১৩৮৬)

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সাতাশীতম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে সমাগত সদস্যগণকে যথোচিত শ্রদ্ধা, প্রীতি ও সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৮৭তম বার্ষিক কর্মবিবরণ সদস্যগণের অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপিত করিতেছি।

প্রথমেই শোকার্তচিত্তে আলোচ্য কালসীমার মধ্যে লোকান্তরিত বাণী সাধকগণের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি : যোগানন্দ দাস, ইন্দ্রভূষণ বিদ্ (আজীবন সদস্য), সুধাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, শিল্পী সুনীলমাধব সেন, শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, ধ্যানচাঁদ, রামকুমার ভূয়ালকা (আজীবন সদস্য), দিলীপকুমার রায় (বিশিষ্ট সদস্য), মনীশ ঘটক, অজিত দত্ত, সুব্রত চক্রবর্তী, অরুণচন্দ্র দত্ত (প্রবর্তক সংঘ), রমেশচন্দ্র মজুমদার।

বিভিন্ন সভার অধিবেশন

স্মারক বক্তৃতামালা

(ক) রামলাল হালদার-হরিপ্রিয়া দেবী স্মারক বক্তৃতা

১৩৮৪ ও ১৩৮৫ সালের রামলাল হালদার-হরিপ্রিয়া দেবী স্মারক বক্তৃতা দেন শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য। তিনি ২৯।১।৮৬, ৫।২।৮৬ এবং ১২।২।৮৬ তারিখে 'বাঙলা সাহিত্যতত্ত্ব' বিষয়ে মোট তিনটি বক্তৃতা দেন।

২৯।১।৮৬ তারিখের বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'কবিমানস'। সভায় সভাপতিত্ব করেন—অধ্যক্ষ শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য।

৫।২।৮৬ তারিখের বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'কলাবৃত্ত'। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য (ডঃ সুরেশ মৈত্র)।

১২।২।৮৬ তারিখের বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'রসিকসমাজ'। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য।

(খ) নির্মলকুমার বসু স্মারক বক্তৃতা

১১ ফাল্গুন, ১৩৮৬ (২৪।২।৮০) তারিখে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সুরজিৎচন্দ্র সিংহ ১৩৮৬ বঙ্গাব্দের 'নির্মলকুমার বসু স্মারক বক্তৃতা' দেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল "নৃতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারতের সভ্যতার গঠন ও বিবর্তন।" সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য।

(গ) রামপ্রাণ গুপ্ত স্মারক বক্তৃতা

২৪ ফাল্গুন ১৩৮৬ (৮।৩।১৯৮০) তারিখে 'রামপ্রাণ গুপ্ত স্মারক বক্তৃতা' দেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ডঃ ভবতোষ দত্ত। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল "আধুনিক যুগে বাঙলার অর্থ-নীতি চিন্তার ও বঙ্গ ভাষায় অর্থনীতি চর্চার ইতিহাস"। সভায় সভাপতিত্ব করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন।

শত বার্ষিকী উদ্‌যাপন

(ক) কৃষিবিজ্ঞানী রাজেশ্বর দাশগুপ্ত শতবার্ষিকী

৩০ ভাদ্র, ১৩৮৬ (১৬।৯।৭৯) রাজেশ্বর দাশগুপ্ত স্মৃতিরক্ষাকমিটি ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যৌথ উদ্‌যোগে যথাযথ শ্রদ্ধার সঙ্গে রাজেশ্বর দাশগুপ্তের জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব পরিষৎ ভবনে উদ্‌যাপিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বসুবিজ্ঞান মন্দিরের অধ্যক্ষ ডঃ শশাঙ্ক ভট্টাচার্য। ডঃ ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী, ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, ডঃ তারকমোহন দাস স্বর্গত রাজেশ্বর দাশগুপ্তের জীবন ও কীর্তি সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

(খ) বৈষ্ণবাচার্য রাধাগোবিন্দ নাথ জন্ম শতবার্ষিকী

৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৮৬ (২৫।১১।৭৯) তারিখে বৈষ্ণবাচার্য ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ-স্মৃতি-সংরক্ষণ সমিতি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের যৌথ উদ্যোগে বৈষ্ণবাচার্য রাধাগোবিন্দ নাথের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব পরিষৎ-মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে স্বর্গত বৈষ্ণবাচার্যের একটি চিত্র পরিষদ ভবনে উন্মোচন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য। প্রভুপাদ প্রাণ কিশোর গোস্বামী প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী, শ্রীক্ষিতীশ দেবনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণ দাশ শাস্ত্রী, শ্রীবিনোদকিশোর গোস্বামী, শ্রীকামিনী কুমার নাথ, শ্রীমনোরঞ্জন রায়, শ্রীব্রজেন্দ্র কুমার নাথ স্বর্গত বৈষ্ণবাচার্যের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও সহশিল্পিবৃন্দ কীর্তন পরিবেশন করেন।

(গ) অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ জন্ম-শতবর্ষ পালন

২২শে অগ্রহায়ণ ১৩৮৬ (৯।১২।১৯৭৯) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ভবনে পণ্ডিত-প্রবর অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য। পণ্ডিত বিধুভূষণ তর্কতীর্থ মঙ্গলাচরণ করেন। ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন অমূল্যচরণের একটি প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করেন। ডঃ রমা চৌধুরী, শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী, শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, ডঃ কেশব চক্রবর্তী, শ্রীমনুজচন্দ্র সর্বাধিকারী অমূল্যচরণের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সভায় অমূল্যচরণের রচনাবলী প্রকাশ সংক্রান্ত ও তেলিপাড়া লেনের নাম পরিবর্তন করিয়া অমূল্যচরণ বিদ্যা-ভূষণ সরণী রাখার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

জন্ম দিবস পালন

ভগিনী নিবেদিতার জন্মবার্ষিকী পালন

(ক) ১০ই কার্তিক, ১৩৮৬ (২৬।১০।৭৯) পরিষদ ভবনে বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সমিতি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের যৌথ উদ্যোগে ভগিনী নিবেদিতার ১১৮তম জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম বঙ্গের প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীমতী পদ্মা খাস্তগীর, শ্রীধীরাজ বসু ভগিনী নিবেদিতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

শ্রীমতী কল্যাণী কাজী ও শ্রীসবিতাব্রত দত্ত এবং সহশিল্পিবৃন্দ স্বদেশী সংগীত ও ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন।

(খ) **স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম দিবস পালন**

২৭শে পৌষ, ১৩৮৬ (১২ই জানুয়ারী ১৯৮০) বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সমিতি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের যৌথ উদ্যোগে পরিষদ ভবনে স্বামী বিবেকানন্দের ১১৮তম জন্ম দিবস উদ্‌যাপিত হয়। কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র সভায় সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রীঅশোক কুমার সরকার। ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়, ডঃ রমা চৌধুরী, শ্রীমতী পদ্মা খাস্তগীর স্বামী বিবেকানন্দ বিষয়ে ভাষণ দেন।

স্মরণ সভা

অধ্যাপক রঙ্গীণ হালদারের স্মরণ-সভা

(ক) ৭ই পৌষ ১৩৮৬ (২৩ ১২।৭৯) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও ইন্ডিয়ান একাডেমী অব সাইকোঅ্যানালিসিসের যৌথ উদ্যোগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভবনে প্রখ্যাত অধ্যাপক রঙ্গীণ হালদারের স্মরণে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিষৎ সভাপতি শ্রীসুকুমার সেন সভায় সভাপতিত্ব করেন। শ্রীগোপাল হালদার, জনাব মনসুর হবিবুল্লাহ্, ডঃ রমেশচন্দ্র দাস, শ্রীহৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায় পরলোকগত অধ্যাপক হালদারের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

(খ) **ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের স্মরণ সভা**

১৮ই ফাল্গুন, ১৩৮৬ (২।৩।১৯৮০) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি, সহকারী সভাপতি ও আজীবন সদস্য প্রখ্যাত ঐতিহাসিক প্রয়াত রমেশচন্দ্র মজুমদারের স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার। ডঃ জগদীশ নারায়ণ সরকার, ডঃ কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, শ্রীজীবনতারা হালদার, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীসুকুমার চট্টোপ্যাধ্যায় ও শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস প্রয়াত ঐতিহাসিকের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

সম্বর্ধনা সভা

পরিষৎ সভাপতি শ্রীসুকুমার সেনের সম্বর্ধনা-সভা

৫ই মাঘ, ১৩৮৬ (২০।১।৮০) তারিখে অপরাহ্নে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বর্তমান আচার্য সভাপতি ডঃ সুকুমার সেনের আশীবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে তাঁহাকে সম্বর্ধিত করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য। শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস পরিষদের পক্ষ হইতে মানপত্র (রচনা শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী, অনুলেখন পরিষদ্‌কর্মী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়) পাঠ করেন। তিনি পরিষদের পক্ষ হইতে পণ্ড ফল ও মিষ্টান্ন উপহার দিয়া অধ্যাপক সেনকে সম্বর্ধিত করেন। ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, ডঃ নরেশচন্দ্র জানা, ডঃ শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, ডঃ নির্মলচন্দ্র দাস, ডঃ সরোজমোহন মিত্র, ডঃ সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, শ্রীপুলকেশ দে সরকার, শ্রীশিবদাস চৌধুরী, শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী মিমি ক্লেমন অধ্যাপক সেনের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ পূর্বক তাহার দীর্ঘ জীবন কামনা করেন। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

আলোচনা সভা

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় ১লা চৈত্র, ১৩৮৬ (১৫।৩।৮০) "বৃন্দাবনে নবাবিষ্কৃত বৈষ্ণব পুঁথিসম্ভার" বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ সুকুমার সেন।

আলোচ্য বর্ষে কার্যনির্বাহক সমিতির মোট ১১টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে, মাসিক অধিবেশন হইয়াছে মোট ৪টি। আয়ব্যয় উপসমিতির অধিবেশন প্রতি মাসে যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। গ্রন্থাগার উপসমিতির একটি অধিবেশন হইয়াছে। ইহা ব্যতীত গ্রন্থশালাধ্যক্ষ, সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক একদিন সাধারণ সদস্যগণের সহিত তাঁহাদের সুবিধা অসুবিধা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করিয়া যথাযোগ্য প্রতিকার ব্যবস্থা করেন। ছাপাখানা উপসমিতির দুইটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। চিত্রশালা উপসমিতির একটি অধিবেশন হইয়াছে। পুস্তক প্রকাশন উপসমিতির দুইটি অধিবেশন হইয়াছে। ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে গঠিত প্রাক্তন সম্পাদক মদনমোহন কুমার সম্পর্কে দুর্নীতি তদন্ত কমিটি তাঁহাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শেষ করিয়া রিপোর্ট দিয়াছেন। কমিটি কর্তৃক রিপোর্টটি গৃহীত হয়। গৃহসংস্কার উন্নয়ন সমিতির মোট তিনটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া ৮ই শ্রাবণ ১৩৮৬ (২৫।৭।৭৯) পরিষদের সাতাশীতম প্রতিষ্ঠা দিবস ডঃ সুকুমার সেনের সভাপতিত্বে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়। ডঃ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য 'বঙ্কিমচন্দ্র ও সাংখ্যদর্শন' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত 'পরিষৎ স্থাপনের গোড়ার কথা' প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সময়োপযোগী ভাষণ দেন।

২৬শে শ্রাবণ ১৩৮৬ (১২।৮।৭৯) পরিষৎ সভাপতি ডঃ সুকুমার সেনের সভাপতিত্বে বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। নিয়মাবলী সংশোধন সমিতির কোন অধিবেশন বর্তমান বৎসরে অনুষ্ঠিত হয় নাই।

১৩৮৬ বঙ্গাব্দের উল্লেখযোগ্য কৃত্য ঃ

কেন্দ্রীয় সরকার ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে যে দুই লক্ষ টাকা অনুদান হিসাবে পরিষৎ মন্দির সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে দিয়াছেন তাহার কাজ সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে। পরিষদ-মন্দির সংস্কার, বৈদ্যুতিকীকরণের কাজে উক্ত টাকা ব্যয় করা হইতেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশেষ অনুদান হিসাবে দশ হাজার পাঁচশত টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। উক্ত অনুদানের অর্থ তাঁহারা গ্রন্থাগারের পুস্তক খরিদ ও পুস্তক সংরক্ষণের কাজে ব্যয় করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। উক্ত অনুদানের অর্থে ৫৭৪৫'০০ টাকার পুস্তক এবং ৭০০৮ টাকার স্টীল র‍্যাক কেনা হইয়াছে।

পরিষদের সার্বিক উন্নয়ন, বিশেষভাবে চিত্রশালার উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগকে অনুরোধ জানাইয়া একাধিকবার চিঠি দেওয়া হইয়াছে। আমরা আশা রাখি অদূর ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় সরকারের মনোযোগ আকর্ষণে আমরা সমর্থ হইব।

বর্তমান বর্ষে পরিষৎ তাহার লুপ্তপ্রায় স্মারক বক্তৃতাগুলি পুনরুজ্জীবিত করিয়া সমস্ত স্মারক বক্তৃতাগুলি প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছে। পরিষদের দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারটিকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করা হইতেছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে পরিষদের অন্যতম

সহকারী সভাপতি শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য 'রামলাল হালদার হরিপ্রিয়া দেবী'র স্মারক বক্তৃতা বাবদ প্রাপ্ত সম্মান দক্ষিণার পাঁচশত টাকা পরিষদের দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন। পরিষৎ দীর্ঘদিন পরে সাহিত্য সাধক চরিতমালা নতুন করিয়া লিখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রায় একশতজন সাহিত্য সাধকের চরিতমালা রচনার দায়িত্ব বিভিন্ন উপযুক্ত ব্যক্তির উপর অর্পিত হইয়াছে' কালিদাস মল্লিক ট্রাস্টের অনুদানে এই চরিতমালার গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইবে। এ পর্যন্ত আটখানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের নাম-সরলা দেবী, ইন্দিরা দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, যোগেশচন্দ্র বাগল, মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শশাঙ্কমোহন সেন, মহম্মদ শহীদুল্লাহ। গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'স্বপ্ন' গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইতেছে। শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত 'বৌদ্ধগান ও দোহা'র পুনর্মুদ্রণের কার্য চলিতেছে। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস ও সাহিত্যসাধক চরিতমালার কয়েকখানি পুরাতন সংখ্যা—১৬ রামমোহন রায়, ৩৪ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪২ গোবিন্দ চন্দ্র রায় ও দীনেশ চরণ বসু এবং মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

কাগজের এবং মুদ্রণের ব্যয়ভার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিষৎ প্রকাশিত গ্রন্থের মূল্য ২৫% বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে। বর্তমান বর্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার দুইটি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

১৩৮৬ বঙ্গাব্দে গোবিন্দ গৌরী পদক শ্রীঅনাথবন্ধু দত্তকে প্রদান করা হইয়াছে।

আর্থিক সহায়তা

বর্তমান বর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দান ঃ—কর্মচারী নিয়োগ খাতে—৫১৮৪'৪৫, পুস্তক প্রকাশ খাতে—১২০০'০০, পৌনঃপুনিক অনুদান (আংশিক ঘাটতি বাজেট খাতে)—১১০০০'০০, পত্রিকা প্রকাশ খাতে—৪০০০'০০, বিশেষ অনুদান—পূজাপার্বণী খাতে—৫০০'০০, গ্রন্থাগার উন্নয়ন খাতে—১০৫০০'০০ টাকা।

স্বর্গত কথাসাহিত্যিক বনফুলের স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁহার পুত্রগণ ছয় হাজার টাকার একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করিয়া সাহিত্য প্রেমী মানুষের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

আসাম বঙ্গ যোগিসম্মেলন বৈষ্ণবাচার্য রাধাগোবিন্দনাথের স্মারক বক্তৃতার জন্য দশ হাজার টাকার একটি স্থায়ী তহবিল সৃষ্টি করিয়া বঙ্গসাহিত্য প্রেমিক সমাজকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

গত বৎসরের বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রেজিস্টার অব্ পাব্লিকেশনসকে এক কপি করিয়া বই পরিষৎ গ্রন্থাগারে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হইয়াছিল। এই বিষয়ে সরকার তাঁহাদের অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

বার্ষিক উৎসবে বিভিন্ন প্রকাশকগণ তাঁহাদের প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ পরিষদ গ্রন্থাগারে উপহার দিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

১৩৮৬ বঙ্গাব্দে পরিষদ গ্রন্থাগারের কার্যক্রম

১। পরিষদ্ খোলা ছিল—২৭৪ দিন।

২। মোট পাঠক-পাঠিকা গ্রন্থাগার ব্যবহার করিয়াছেন—১৭,৮১০ জন। অর্থাৎ গড়ে দৈনিক—৬৫ জন।

৩। লেনদেন বিভাগ—

ক. মোট পাঠক-পাঠিকার উপস্থিতির সংখ্যা—৮২২০ জন। অর্থাৎ গড়ে দৈনিক—৩০ জন।

খ. পাঠকক্ষে মোট পাঠক-পাঠিকার উপস্থিতি—৯৫৯০ জন। অর্থাৎ গড়ে দৈনিক—৩৫ জন।

৪। পাঠকক্ষ ও লেনদেন বিভাগে সর্বোচ্চ উপস্থিতির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪০ জন (১ শ্রাবণ ১৩৮৬) এবং ৪১ জন (৬ কার্তিক, ১৩৮৬)

৫। বর্তমান বর্ষে পরিষদের নূতন সদস্য সংখ্যা—৩০০ জন, বিশিষ্ট সদস্য—১৩ জন, আজীবন সদস্য—৮২ জন, সাধারণ সদস্য—৯৮১ জন, মফঃস্বল সদস্য—২৬ জন।

পরিশিষ্ট-ক

পুস্তক আদান-প্রদান : ১৩৮৬

বিষয়ানুযায়ী

		লেন-দেন	পাঠকক্ষ	মোট
দর্শন	১০০	৯১	৮৯	১৮০
ধর্ম	২০০	৩১৭	৪০৫	৭২২
সমাজবিজ্ঞান	৩০০	৮৬	২৫৮	৩৪৪
শিক্ষা	৩৭০	২২	৬৬	৮৮
ভাষা	৪০০	১১৫	৯২	২০৭
বিজ্ঞান	৫০০	৮	৪৬	৫৪
ফলিত বিজ্ঞান	৬০০	১৫	২৮	৪৩
শিল্পকলা	৭০০	২০	১৭	৩৭
সংগীত	৭৮০	১১৫	১০৭	২২২
সাহিত্য	৮০০	৮,২১০	৮,১৪৯	১৬,৩৫
ভূগোল, ভ্রমণ	৯১০	১৮৮	৯২	২৮৯
জীবনী	৯২০	৫২৪	৭০১	১,২২৫
ইতিহাস	৯৩০-৯৯০	১৬৩	৩৭৯	৫৪২০
সহায়ক গ্রন্থ	০০০	৩১	৩১৬	৩৪৭
পত্রপত্রিকা		×	৬৯৭৮	৬৯৭৮
		৯৯০৫	১৭৭২৩	২৬৬২৪

পরিশিষ্ট-খ

পঞ্জীকৃত পুস্তক : ১৩৮৬

বাংলা	৬০৪
ইংরেজী	২৪০
পত্রপত্রিকা	১৭৫
	১০০১

৮৭তম বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণী

গত ২৫শে শ্রাবণ, ১৩৮৭ (১০ আগষ্ট, ১৯৮০) রবিবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায় পরিষদ ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৩৮৬ বঙ্গাব্দের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

পরিষদ সভাপতি ডঃ সুকুমার সেন শারীরিক কারণে অনুপস্থিত থাকায় অদ্যকার সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্যের নাম প্রস্তাব করেন শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস। তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করেন শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী। অতঃপর শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভার প্রারম্ভে সম্পাদক সভায় ঘোষণা করেন যে বিজ্ঞাপিত কার্যসূচীতে "বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচন বিজ্ঞাপন" সূচীটি প্রমাদ বশত দেওয়া হয় নাই। সভাপতি অনুমোদন করিলে উহা বার্ষিক অধিবেশনের কার্যসূচীতে সংযোজিত হইতে পারে। সভাপতি তাঁহাকে এই বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে উহা কার্যসূচীর ৮নং ধারা হিসাবে সংযোজিত হয় এবং পরবর্তী কার্যসূচী দুইটির ধারার ক্রম বদলাইয়া ৯ ও ১০ করা হয়।

ইহার পর সভাপতি ডঃ রমা চৌধুরীকে সভায় মঙ্গলাচরণ করিবার জন্য আহ্বান করিলে তিনি সভায় মঙ্গলাচরণ করেন।

কার্যসূচী :

১। সভাপতির অভিভাষণ দিতে গিয়া সভাপতি বলেন; অদ্যকার ভাষণ দেওয়ার কথা পরিষৎ সভাপতি অধ্যাপক শ্রীসুকুমার সেন মহাশয়ের, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি আসিতে না পারায় তাঁহাকেই এই কার্য করিতে হইতেছে। তিনি সকলকে স্বাগত জানান এবং বলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বহুদিন পর সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। বর্তমান বর্ষে কিভাবে সাহিত্য পরিষদের কাজকর্ম হইতেছে তাহার বর্ণনা দিয়া তিনি আশা প্রকাশ করেন যে সাহিত্য পরিষৎ পুনরায় তাহার স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

২। সম্পাদক গত বৎসরের লিখিত কার্য বিবরণ সভায় উপস্থাপন করেন। উক্ত কার্য বিবরণ সমর্থন করেন শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন। উক্ত কার্য বিবরণ গৃহীত হয়।

৩। কোষাধ্যক্ষ ডঃ কানাইচন্দ্র পাল ১৩৮৬ বঙ্গাব্দের পরীক্ষিত আয় ব্যয় সভায় উপস্থাপিত করেন। উহা সমর্থন করেন শ্রী শঙ্করপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। উক্ত পরীক্ষিত আয় ব্যয় বিবরণ গৃহীত হয়।

৪। কোষাধ্যক্ষ ডঃ কানাইচন্দ্র পাল ১৩৮৭ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয় ব্যয় বিবরণ

সভায় উপস্থাপিত করেন। উহা সমর্থন করেন শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন। সভায় উক্ত আনুমানিক আয়-ব্যয় বিবরণ অনুমোদিত হয়।

৫। পরবর্তী বৎসরের ১৭ জন কর্মাধ্যক্ষের নাম প্রস্তাব করেন সম্পাদক শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস। সভায় তাহা অনুমোদিত হয়।

সভাপতি—শ্রীসুকুমার সেন।

সহ-সভাপতি—(১) শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য (২) ডাঃ বিমলেন্দুনারায়ণ রায় (৩) ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (৪) ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য (৫) ডঃ মহাদেবপ্রসাদ সাহা (৬) ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য (৭) ডঃ রমা চৌধুরী (৮) শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র।

সম্পাদক—শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

সহ-সম্পাদক—(১) শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী (২) ডঃ রবীন্দ্র গুপ্ত

কোষাধ্যক্ষ—ডঃ কানাইচন্দ্র পাল

পত্রিকাধ্যক্ষ – ডঃ সরোজমোহন মিত্র

গ্রন্থশালাধ্যক্ষ—শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীদেবকুমার বসু

পুঁথিশালাধ্যক্ষ—ডঃ শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

৬। পরবর্তী বর্ষের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য নির্বাচন সংবাদ বিজ্ঞাপিত করেন শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস।

বর্তমান বর্ষের কার্যনির্বাহক সমিতির নির্বাচিত সদস্যগণ ঃ

১। শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত ২। শ্রীকুমারেশ ঘোষ ৩। শ্রীউষা সেন ৪। শ্রীঅসীমকুমার দত্ত ৫। শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় (৬) শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী (৭) ডঃ হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ৮। শ্রীধীরাজ বসু ৯। শ্রীজ্ঞানশঙ্কর সিংহ ১০। শ্রীহারাধন দত্ত ১১। শ্রীশঙ্করপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২। শ্রীদুলালপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩। শ্রীউত্তমকুমার দাস ১৪। শ্রীশঙ্করপ্রসাদ নস্কর ১৫। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৬। শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ ১৭। শ্রীরাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮। শ্রীহৃষীকেশ ঘোষ ১৯। শ্রীতরুণদেব ভট্টাচার্য ২০। শ্রীরঘুনাথ ভট্টাচার্য।

৭। শাখা পরিষদের সদস্য নির্বাচন সংবাদ বিজ্ঞাপিত করেন সম্পাদক শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস।

শাখা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ ঃ

১। শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন ২। ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী

৩। শ্রীসদানন্দ দাস ৪। শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়

৮। বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচন সংবাদ বিজ্ঞাপিত করেন সম্পাদক শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস।

বর্তমান বর্ষে নির্বাচিত বিশিষ্ট সদস্যবৃন্দ ঃ

১। শ্রীপুলিনবিহারী সেন। ২। শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ ৩। শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। ৪। শ্রীআবু সইদ আইয়ুব ৫। শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায় ৬। শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

৯। ১৩৮৭ বঙ্গাব্দের আয়-ব্যয় পরীক্ষক নির্বাচনের জন্য সম্পাদক শ্রীমলয়কুমার দেব ও বি. সি. কুন্ডু এ্যান্ড কোং-এর নাম প্রস্তাব করেন। কোষাধ্যক্ষ ডাঃ কানাইচন্দ্র পাল

তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করেন। অতঃপর উক্ত দুইজন ১৩৮৭ বঙ্গাব্দের জন্য আয় ব্যয় পরীক্ষক নির্বাচিত হন।

১০। সভাপতি উপস্থিত সদস্যগণকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করিলে ডঃ সরোজমোহন মিত্র বলেন যে পরিষদের গ্রন্থাগার বিভাগের কাজকর্ম আরও দ্রুততর হওয়া উচিত। শ্রী মহেশকুমার চট্টোপাধ্যায় কয়েকটি প্রস্তাব রাখেন— ১) আমানত জমার গচ্ছিত টাকা এক হাজার টাকার বেশী হইলে তাহা স্থায়ী আমানত হিসাবে জমা রাখিলে ভালো হয়। (২) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে শিশুদের জন্য একটি বিভাগ করা যায় কিনা পরিষৎ তাহা ভাবিয়া দেখুন (৩) যে সমস্ত পুস্তক অদ্যাবধি পঞ্জীকৃত হয় নাই তাহাদের দ্রুত পঞ্জীকরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সভাপতি সমাপ্তি ভাষণে বলেন যে, সাধারণ সভায় কোনো নূতন প্রস্তাব দেওয়ার রীতি নাই। প্রস্তাব সমূহ কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় পূর্বে উপস্থাপিত করিতে হইবে। তিনি সমবেত সকলকে পরিষদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

সম্পাদক সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পরিষৎ সংবাদ

অনিবারণীয় নানা কারণে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮৭ বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা পত্রিকা প্রকাশে বহু বিলম্ব হইল। আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ইহাকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব হয় নাই। সেজন্য প্রথমেই ত্রুটি স্বীকার করিতে হইতেছে। ইতিপূর্বে পত্রিকার প্রকাশ অনেকটা নিয়মিত করা সম্ভব হইয়াছিল। আশা করি, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই তাহাকে আবার নিয়মিত করা সম্ভব হইবে।

শোক প্রকাশ :

১৩৮৭ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ হইতে আশ্বিন মাসের মধ্যে বহু প্রথিতযশা শিল্পী সাহিত্যিকের প্রয়াণ ঘটিয়াছে। তাহার ফলে বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি সাধন হইয়াছে। সেজন্য অন্যান্য দেশবাসীগণের সঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতিও গভীর শোকাহত। উক্ত তিন মাসের মধ্যে বিভিন্ন অধিবেশনে কার্যনির্বাহক সমিতি প্রয়াত বিনয় ঘোষ, উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়, অমিয়কুমার সেন, গোপাল ঘোষ, মহম্মদ রফি, শৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়, দেবব্রত বিশ্বাস এবং শিবরাম চক্রবর্তীর প্রতি গভীর শোকনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

প্রতিষ্ঠা দিবস :

৮ই শ্রাবণ, ১৩৮৭ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ পাঁচটায় পরিষদ ভবনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৮৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত হয়। পরিষদ সভাপতি ডঃ সুকুমার সেন শারীরিক কারণে উপস্থিত হইতে না পারায় এই অনুষ্ঠানে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি ডঃ রমা চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে ৮৮ টি প্রদীপ জ্বালাইয়া সভাপতি অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। শ্রীমতী সর্বানী বসু উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

সভার প্রারম্ভে পরিষৎ সম্পাদক শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস এই পবিত্র ও স্মরনীয় দিনটির স্বাগত জানান তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং সমবেত সকলকে স্বাগত জানান। তিনি অত্যন্ত দুঃখের সংগে সভায় জানান যে ঐদিন ভোরে প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ বিনয় ঘোষ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। সভায় প্রয়াত ঘোষের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া একটি শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রকে প্রথম বৎসরের জন্য সাহিত্যিক হরনাথ ঘোষ পদক (স্বর্ণ খচিত রৌপ্য পদক) প্রদান করা হয়। কথা সাহিত্যিক ও কবি শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁহার ভাষণে বলেন যে, তিনি জীবনে অনেক পুরস্কার লাভ করিয়াছেন কিন্তু জীবনের শেষ পর্যায়ে আসিয়া বাঙলা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সারস্বত প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এই উপহারকে তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার বলিয়া তিনি মনে করেন। তিনি ইহার জন্য গর্বিত বোধ করিতেছেন।

শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য ও শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন।

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা হইতে নানা অংশ পাঠ করিয়া তাঁহার সাহিত্য সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেন।

সভায় শ্রীমতী কল্যাণী কাজী এবং শ্রীমতী গীতশ্রী রাহা সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

বনফুল স্মারক বক্তৃতা ঃ

গত ৪ঠা এবং ১১ই শ্রাবণ পরিষদ ভবনে শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য বনফুল স্মারক বক্তৃতা দেন। প্রথম দিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত। সভার সূচনায় পরিষদের সম্পাদক মহাশয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং কথাসাহিত্যিক বনফুলের সাহিত্য কীর্তি ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে বনফুলের নিবিড় সম্পর্কের কথা আলোচনা করেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এক চরম দুর্দিনে বনফুল কিভাবে পরিষদের হাল ধরিয়াছিলেন তাহা তিনি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন। বনফুল স্মারক বক্তৃতার জন্য বনফুলের পুত্রগণ ও রবিবাসর ছয় হাজার টাকার যে স্থায়ী তহবিল সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

এইদিন বনফুলের একটি তৈলচিত্রও পরিষদ ভবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর সভাপতির অনুরোধে শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য 'কবি বনফুল' সম্পর্কে তাঁহার লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন।

দ্বিতীয় দিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য। এইদিন শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য "নাট্যকার বনফুল" সম্পর্কে প্রায় দুই ঘন্টা ধরিয়া তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন।

সভাপতি বক্তার পাণ্ডিত্যের এবং বক্তব্য বিষয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বার্ষিক অধিবেশন ঃ

গত ২৫ শে শ্রাবণ, ১৩৮৭ (১০ আগষ্ট, ১৯৮০) রবিবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৮৭তম বর্ষের বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার বিবরণী 'পরিষৎ পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় পৃথকভাবে প্রকাশিত হইল।

বিভিন্ন শাখা সমিতি গঠন ঃ

পরিষৎ নিয়মাবলীর ৫ নং এবং ২৬ নং ধারানুযায়ী ৮৮ তম বর্ষের প্রথম অধিবেশনে (১১ ভাদ্র, ১৩৮৭) নিম্নলিখিত পাঁচটি উপসমিতি এবং পাঁচটি শাখা সমিতি গঠিত হয় ঃ

আয়-ব্যয় উপসমিতি ঃ

(১) শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য (সভাপতি) (২) ডঃ কানাইচন্দ্র পাল (৩) শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী (৪) শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস (৫) শ্রীরঘুনাথ ভট্টাচার্য (৬) শ্রীদুলপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (৭) শ্রীসুদাম রায় (৮) শ্রীবীরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় (৯) শ্রীঅলোক রায় (১০) শ্রীগৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত (১১) শ্রীসত্যপ্রিয় ঘোষ (১২) শ্রীপ্রণব ঘোষ।

ছাপাখানা উপসমিতি ঃ

(১) ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সভাপতি) (২) শ্রীকুমারেশ ঘোষ (৩) ডঃ সরোজমোহন মিত্র (৪) শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (৫) শ্রীহারাধন দত্ত (৬) শ্রীদিলীপকুমার

বিশ্বাস (৭) শ্রীগোলোকেন্দু ঘোষ (৮) শ্রীগোপীমোহন সিংহ রায় (৯) শ্রীঅশোক কুণ্ডু (১০) শ্রীসনৎকুমার মিত্র ১১) শ্রীপবিত্র সরকার (১২) শ্রীমনোজ বসু।

পুস্তক প্রকাশ উপসমিতি ঃ

( ) শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য (সভাপতি) (২) শ্রীরবীন্দু গুপ্ত (৩) শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী (৪) শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় (৫) শ্রীউত্তমকুমার দাস (৬ শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস (৭) ডঃ সুরেশ মৈত্র (৮ শ্রীসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় (৯) ডঃ অজিতকুমার ঘোষ (১০) ডঃ নরেশ জানা (১১) শ্রীবামাপদ দাস (১২) ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী।

গ্রন্থাগার উপসমিতি ঃ

(১) শ্রীঅসীমকুমার দত্ত (সভাপতি) (২) শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী (৩) শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ (৪) শ্রীশঙ্করপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (৫) শ্রীতরুণদেব ভট্টাচার্য (৬) শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস (৭) শ্রীশিবদাস চৌধুরী (৮) শ্রীরমাকান্ত চক্রবর্তী (৯) ডঃ প্রভাত গোস্বামী (১০) শ্রীগীতা চট্টোপাধ্যায় (১১) শ্রীস্বপন বসু (১২) শ্রীরমেন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত।

চিত্রশালা উপসমিতি ঃ

(১) শ্রীধীরাজ বসু (সভাপতি) (২) শ্রীদেবকুমার বসু (৩) ডঃ কানাইচন্দ্র পাল (৪) ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী (৫) শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন (৬) শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস (৭) ডঃ কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত (৮) শ্রীরত্না চৌধুরী (৯) শ্রীহরিপদ ভৌমিক ১০) শ্রীরামেন্দ্র দেশমুখ্য (১১) শ্রীশিব মুখোপাধ্যায় (১২) শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

শাখা সমিতি ঃ

সাহিত্য ঃ (১) ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য (২) শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত (৩) শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় (৪) শ্রীকুমারেশ ঘোষ (৫) শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র (৬) সম্পাদক।

দর্শন ঃ (১) ডঃ রমা চৌধুরী (২) শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য (৩) ডঃ হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (৪) ডঃ শিবদাস চক্রবর্তী ৫) শ্রীহৃষীকেশ ঘোষ (৬) সম্পাদক।

বিজ্ঞান ঃ (১) ডাঃ বিমলেন্দুনারায়ণ রায় (২) শ্রীরাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (৩) শ্রীজ্ঞানশঙ্কর সিংহ ৪) শ্রীউষা সেন (৫) শ্রীদুলালপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (৬ সম্পাদক।

ইতিহাস ঃ (১) শ্রীঅসীমকুমার দত্ত (২) শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ (৩) শ্রীউষা সেন (৪) শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় (৫) শ্রীশঙ্করপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (৬) সম্পাদক।

অর্থনীতি ঃ (১) ডঃ কানাইচন্দ্র পাল (২) শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (৩) শ্রীরঘুনাথ ভট্টাচার্য (৪) শ্রীতরুণদেব ভট্টাচার্য (৫) শ্রীদেবকুমার বসু (৬) সম্পাদক।

সরকারী প্রতিশ্রুতি ঃ

কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাবিষয় উপদেষ্টা ডঃ কপিলা বাৎস্যায়নের নির্দেশে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের ডিরেক্টর শ্রীসুনীল রায়, রেস্টোরার অব এ্যানসিয়েন্ট কালচারাল অবজেক্টস, লক্ষ্ণৌ পরিষদের চিত্রশালা ও পুঁথিশালা পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন এবং পরিষদের পুঁথিসমূহের রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা জীর্ণ গ্রন্থসমূহের কিছু আলোকচিত্র লইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা পরিষদের উন্নয়নের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

সুদৃশ্য বাঁধাই

১ম খণ্ড : টা. ২০'০০

২য় খণ্ড : টা. ৩০'০০

স্বল্প সংখ্যক পুস্তক অবশিষ্ট আছে

বাংলা সাময়িক পত্র

১ম খণ্ড : টা. ১১'০০

২য় খণ্ড : টা. ৯'০০

গিরিন্দ্রশেখর বসু প্রণীত

স্বপ্ন

প্রায় এক যুগ পরে পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। সুদৃশ্য বাঁধাই।

মূল্য : পনের টাকা

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস, সম্পাদক : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-কর্তৃক
প্রকাশিত ও বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স, ৫৭এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন
কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।
মূল্য : তিন টাকা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

৮৭ বর্ষ ॥ তৃতীয় সংখ্যা
কার্তিক-পৌষ
১৩৮৭

পত্রিকাধ্যক্ষ
শ্রীসরোজমোহন মিত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

৮৭ বর্ষ ॥ তৃতীয় সংখ্যা
কার্তিক-পৌষ
১৩৮৭

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসরোজমোহন মিত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর ১৩৮৭ বঙ্গাব্দের কার্যনির্বাহক সমিতি

সভাপতি ঃ ডঃ সুকুমার সেন

সহ-সভাপতি

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য — ডঃ মহাদেবপ্রসাদ সাহা
ডাঃ বিমলেন্দুনারায়ণ রায় — ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য
ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — ডঃ রমা চৌধুরী
ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য — শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

সম্পাদক—শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

সহকারী সম্পাদক

শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী ঃ ডঃ রবীন্দ্র গুপ্ত

কোষাধ্যক্ষ
ডঃ কানাইচন্দ্র পাল

গ্রন্থশালাধ্যক্ষ
শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী

চিত্রশালাধ্যক্ষ
শ্রীদেবকুমার বসু

পুথিশালাধ্যক্ষ
ডঃ শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

পত্রিকাধ্যক্ষ—ডঃ সরোজমোহন মিত্র

সদস্যবৃন্দ

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত
শ্রীকুমারেশ ঘোষ
শ্রীউষা সেন
শ্রীঅসীমকুমার দত্ত
শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়
ডঃ শিবদাস চক্রবর্তী
ডঃ হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
শ্রীধীরাজ বসু
শ্রীতরুণদেব ভট্টাচার্য
শ্রীরঘুনাথ ভট্টাচার্য
শ্রীজ্ঞানশঙ্কর সিংহ
শ্রীহারাধন দত্ত
শ্রীশঙ্করপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়
শ্রীদুলালপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীউত্তমকুমার দাস
শ্রীশঙ্করপ্রসাদ নস্কর
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ
শ্রীরাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীহৃষীকেশ ঘোষ

শাখা-পরিষৎ প্রতিনিধি

নৈহাটি শাখা—শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন
মেদিনীপুর শাখা—ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী
বর্ধমান শাখা—শ্রীসদানন্দ দাস
কৃষ্ণনগর শাখা—শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়

॥ সূচীপত্র ॥

কবি বনফুল	॥ শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য	১
বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ্য, বীর হাম্বিরবৃত্ত	॥ শ্রীতরুণদেব ভট্টাচার্য	২৮
বিপ্র পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল	॥ শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল	৪১
পরিষৎ-সংবাদ		৪৫
আলোচনা—রামপ্রসাদ কি শুধুই আঠারো শতকের কবি ?	॥ শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল	৪৭

সুসম্পাদিত ও প্রামাণ্য গ্রন্থাবলী

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস

সম্পাদিত

রামমোহন গ্রন্থাবলী
[এক খণ্ডে সুদৃশ্য রেক্সিনে বাঁধাই] ৩৫·০০

ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী
[এক খণ্ডে সুদৃশ্য রেক্সিনে বাঁধাই] ২২·০০

মধুসূদন গ্রন্থাবলী
[এক খণ্ডে সুদৃশ্য রেক্সিনে বাঁধাই] ৪০·০০

দীনবন্ধু গ্রন্থাবলী
[দুই খণ্ডে সুদৃশ্য রেক্সিনে বাঁধাই] ৩৫·০০

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (চণ্ডীদাস)
[বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত] ৩০·০০

রামেন্দ্র রচনাবলী
[ছয় খণ্ডে কাগজে বাঁধাই] ১২০·০০

রামেশ্বর রচনাবলী
ডক্টর পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত
[সুদৃশ্য রেক্সিনে বাঁধাই] ৩৫·০০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

কবি বনফুল

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

১

'বনফুল' নামে খ্যাত বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন মূলত কবি। কাব্য যদি হয় সরস কল্পনাত্মক বাক্যমাল্য, তাহলে বনফুলের অধিকাংশ রচনাকেই কাব্য আখ্যা দেওয়া চলে। এমন কি, 'বনফুল' ছদ্মনাম নির্বাচনেও তিনি কবি-মানসের পরিচয় রেখেছেন, যদিও অন্যদের দেওয়া 'জংলীবাবু' ডাকনাম থেকে তিনি ওই নাম নির্বাচনের প্রেরণা পেয়েছিলেন। বলাইচাঁদ ভাগলপুরের বাগানে ও লেকটাউনের বাড়ীর ছাতে গোলাপের চাষ করতেন। কিন্তু তাঁর কবিতা উদ্যানের লালনললিত প্রসূন নয়,—অরণ্যের কেতকী কুসুম; কাঁটার বনে তাদের জন্ম এবং অযত্নে বর্ধিত, তবু তাদের মদির সৌরভ সহজ সৌন্দর্যকে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে। প্রকৃতপক্ষে, শিল্পপ্রয়াস গোপনের ওপর প্রায়ই শিল্পের সার্থকতা নির্ভর করে; আমরা এখানে ভাষাশৈলীর কথা ভাবছি, রচনার গঠনবিন্যাস নয়। বনফুলের কাব্যকে এই নিকষে যাচাই করলে তার বিশুদ্ধি কনকরেখা ফুটিয়ে তোলে।

বনফুলের সমস্ত সাহিত্যকৃতি বর্তমান আলোচনার বিষয় নয়। তবে একথা স্বীকার্য যে তাঁর অনেক বড়ো গল্প আসলে উপন্যাস নয়; কল্পনার উদ্দাম গতির জন্য তাদের কল্পন্যাস আখ্যা দেওয়াই সমীচীন, যাতে তাদের কাব্যধর্মিতা প্রস্ফুট হবে। তাঁর ছোটগল্প এবং অনুগল্পও গীতি কবিতার ধর্ম পেয়েছে, অন্তিম চমক যাদের বৈশিষ্ট্য। জীবনের নানা সময়ে রচিত এবং বিভিন্ন পত্রিকায় ও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত তাঁর কবিতাবলি ১৩৭৭ সনে 'সুরসপ্তক' নামে পুস্তকাকার লাভ করে। আমি এখানে মুখ্যত সুরসপ্তকের কবিতাগুলিরই সমীক্ষা করবো। অবশ্য সাতটির বেশী সুর এই কাব্যবীণায় রয়েছে, তবে বর্ণালীদীপ্ত কবিতাগুলি কবি স্বয়ং সাতটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন। আমার আলোচনা এই শ্রেণীবিভাগ অক্ষুণ্ণ রেখেই অগ্রসর হবে।

২

ব্যক্তিগত জীবনে বলাইচাঁদ ছিলেন ভক্তিমান পুত্র, স্নেহশীল ভ্রাতা, প্রেমময় স্বামী, সন্তানবৎসল পিতা, প্রীতিবর্ষী বন্ধু ও শুভার্থী প্রতিবেশী। তাঁর রুচি ছিল নিন্দার অতীত এবং সংস্কৃতি কুসংস্কারের মায়াজাল থেকে মুক্ত; এখানে তিনি পিতামাতার দায়ভাগের অধিকারী ছিলেন। নানা বিষয়ে পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও তিনি ছিলেন শিশুসুলভ সারল্য ও বিনয়ের মূর্ত অবতার। তাঁর আত্মজীবনীর 'পশ্চাৎপট' নামকরণে তাঁর সলজ্জ বিনয় সূচিত হয়েছে। তাঁর দেশপ্রেমে ভেজাল ছিল না এবং সমাজের ব্রাত্য ও দরিদ্র মানুষের প্রতি তাঁর আন্তরিক দরদ ছিল। তাঁর আত্মকথা থেকে আমরা জানতে পারি যে ছাত্রজীবনেই তাঁর সাহিত্যরচনায় হাতেখড়ি হয়। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মধ্যগগনে,

কিন্তু একমাত্র ভাষায় ছাড়া তাঁর রচনায় কবিগুরুর প্রভাব বিশেষ লক্ষিত হয় না। আর ভাষায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তো স্বয়ংসিদ্ধ বিদ্রোহীরাও অতিক্রম করতে পারেন নি। তবে বনফুলের রূপকল্প নিজস্ব ছিল। তিনি পেশায় ছিলেন ডাক্তার, এবং সাহিত্য ছাড়াও পক্ষীপর্যবেক্ষণ ইত্যাদি অনেক সৎ নেশা তাঁর ছিল ; তাই তাঁর বাক্‌প্রতিমা বিজ্ঞানের অবদানে পরিপুষ্ট ছিল। তাছাড়া, নিসর্গের বিচিত্র রূপ নিরীক্ষণ ও লোকচরিত্র অধ্যয়ন তাঁর অস্থিমজ্জাগত ছিল ; তাই কাব্যালঙ্কারের জন্য তাঁকে অন্য সৃজনশীল লেখকদের বা তাত্ত্বিকদের দ্বারস্থ হতে হয়নি। তাঁর বাক্‌শৈলীর একটা উদগ্র রূঢ়তা এবং অনেক উপমার ঋজু পৌরুষ তাঁকে গতানুগতিকতার তুচ্ছতায় বিড়ম্বিত করেনি। তাঁর ক্ষেত্রেও বাগ্‌রীতি ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষরে চিহ্নিত।

আরেকটি বিষয় গোড়াতেই উল্লেখ করা প্রয়োজন। অনেকের ধারণা—বনফুল শুধু ব্যঙ্গ কবিতাই লিখেছেন, কিন্তু সে ধারণা ভুল। রবীন্দ্রানুসারী কবিপঞ্চক ব্যঙ্গকবিতা লেখেননি, যদিও কালিদাস রায় হাস্যরসের তরল কবিতা পরিবেশন করেছেন। ব্যঙ্গকবিতাও হাস্যরসের কবিতা, তবে তাতে হাসির মধুর সঙ্গে হুলের বিষও থাকে। সাবিত্রীপ্রসন্ন মুখ্যত রবীন্দ্রানুসারী হয়েও ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছেন, তবে তাঁর ওরূপ কবিতা অনেকট নৈর্ব্যক্তিক, অর্থাৎ তাতে সমাজ মানসের প্রতিবাদ রয়েছে ভণ্ডতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে ; কিন্তু বনফুলের ব্যঙ্গ কবিতায় ব্যক্তিমনের ছাপ আছে ব'লে তা গীতিকাব্যধর্মী। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে বনফুলের সমস্ত ব্যঙ্গ কবিতা তাঁর কাব্যসম্ভারের বড়ো জোর এক-তৃতীয়াংশ। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও হাস্যরসের কবিতা লিখেছেন এবং বলেছেন ঃ "এত বুড়ো কোনোকালে হব নাকো আমি/হাসিতামাসারে যবে কব ছ্যাবলামি।" বাংলা ভাষায় ব্যঙ্গ কবিতার অপ্রাচুর্য বঙ্গসাহিত্যের খানিকটা দৈন্যই সূচিত করে। বনফুল এদিকে দৃষ্টি দিয়েছেন ব'লে, তিনি সাহিত্য-রসিক মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ,—উন্নাসিকের নিন্দার্হ ন'ন।

৩

সুরসপ্তকের প্রথম সুর 'আরোহণী'-তে বিয়াল্লিশটি কবিতা আছে। এই কবিতাগুলি বনফুলের অল্পবয়সের রচনা, এবং রসোত্তীর্ণ হ'লেও স্মরণীয় নয়। ভাষা সরল এবং ছন্দ সাবলীল, কিন্তু অনেক সময় রবীন্দ্রানুসারী কবিদের মতো। তবে একদিক্ থেকে এদের বৈশিষ্ট্য আছে ; অন্যান্য সুরের আগমনী এতে পূর্ব-ধ্বনিত হয়েছে এবং বৈচিত্র্যও প্রশংসনীয়। তাছাড়া, তথাকথিত তুচ্ছ বিষয়কেও কবি অবহেলা করেন নি, যেমন করেন না সাম্প্রতিক চিত্রশিল্পীরা। কবিতাগুলির নাম থেকেই তা বুঝতে পারা যায়—যথা, 'আলোর পোকা,' 'আস্তাকুঁড়ের ফুল,' 'কাক,' 'গোরু,' 'মশার মতামত,' 'ছারপোকা', 'আদার ব্যাপারী,' 'দূর্বা,' 'কাঁটাগাছ,' কাঁচি, প্রভৃতি। কিছু নমুনা দেওয়া প্রয়োজন ঃ

"আস্তাকুঁড়েতে ফেলে চলে গেছে
আধফোটা ওই গোলাপ ফুল ;
কোন অকরুণ অকবি জনের
জানিনা এ হায় মনের ভুল !',

ফুলের অবহেলা বনফুলের কাছে অমার্জনীয় অপরাধ। প্রকৃতপক্ষে, জগতে ফুলই

একমাত্র বস্তু যা কখনো অসুন্দর হয় না। মরুভূমিতে পালিত হজরত মহম্মদ ফুলকে মর্তের সুধা আখ্যা দিয়েছেন। কবিতাটির শেষ চার পংক্তি ঃ

"এ যেন রে হায় রমণী জাতির
কোন একজন রূপসী আহা,
পথ ভুল করে পতিতা হয়েছে
কিন্তু এখনো বোঝেনি তাহা !"

বনফুলের অনুগল্পের অন্তিম চমকের ঝলকানি এই কবিতাটিতে স্ফূর্ত হয়েছে ব্যঞ্জনার মহিমায়। 'কাক'-নামক কবিতার প্রথম স্তবক উদ্ধৃতির যোগ্য ঃ

"প্রকৃতি মায়ের আদুরে দুলাল
একেবারে বয়ে-যাওয়া,
ভোর হতে উঠে নাই কোন কাজ
খালি খাওয়া আর খাওয়া !"

'গোরু' কবিতায় গোরুর প্রতি যে সমবেদনা ব্যক্ত হয়েছে, তা শোষিত মানুষের প্রতিও ইঙ্গিত করছে ঃ

"তোমার'পরেই এ অত্যাচার,
হে মানুষের কল্পতরু ;
কারণ ? নহ সিংহ কি বাঘ,
কারণ তুমি নেহাৎ গোরু !"

'মশার মতামত' কবিতাটিও উপভোগ্য। মশা বলছে ঃ

'অনেক লোকের অনেক রকম
অনেক রক্ত করেছি হজম ;·········
খেয়ে খেয়ে শেষে পেয়েছি প্রমাণ—
সব রক্তই মিষ্টি সমান !"

মশা যেন সাম্যবাদী—লাল নীল রক্তের তফাৎ করে না। বার্ন্সের উক্তি মনে পড়বে—আভিজাত্য মোহরের ছাপ মাত্র, তা সত্ত্বেও সব মানুষই সোনা। 'ছারপোকা' কবিতাটিও রসে টইটম্বুর ; একটি স্তবক উদ্ধৃত করছি ঃ

"তব দংশন, ওগো, ঘুম ঘোর গভীরে
—সমালোচনার খোঁচা ভাবে ভোর কবিরে !
রূপসীর দেহে যেন পাঁচড়ার ক্ষত গো,
পোলাওয়ের মাঝে ঠিক কাঁকরের মতো গো !
গোলাপেতে কাঁটা যেন, বউ যেন মুখরা,
লেপের মাঝারে যেন বরফের টুকরা !"

কয়েকটি উপমা আমাদের উচ্চকিত করে, কারণ তাতে চর্বিতচর্বণের গন্ধ নেই, যদিও এক জায়গায় বীভৎস রসের ন্যক্কার রয়েছে। 'মন্থরা' কবিতায় আছে ঃ

"আঁধার না হলে ফোটে কি জোছনা
শারদ শশীর অন্তরে ?

তাইত তো তোমারে ধন্যবাদটা
না দিয়ে পারি না, মন্থরে !"

তত্ত্বের দিক্ থেকে এটা ভল্‌তেয়ারের ডঃ প্যান্‌গ্লসের যুক্তির মতো। তবে ভল্‌তেয়ার তীব্র বিদ্রূপের কশাঘাত করেছেন, কিন্তু বনফুলের কবিতায় (যাতে কালিদাসের পরোক্ষ প্রভাব আছে) ওরূপ ব্যঞ্জনা নেই, কারণ এটি ব্যঙ্গকবিতা নয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বনফুল একটি নাটিকায় মন্থরা ও কৈকেয়ীর নৈতিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন মানবিকতার দৃষ্টিভঙ্গীতে, যেমন করেছিলেন মুরারি অনর্ঘরাঘবম্ নাটকে মায়ার আশ্রয় নিয়ে। —'আদার ব্যাপারী' একটি রসোত্তীর্ণ কবিতা :

"দেশ জুড়ে যত আদার ব্যাপারী আদা নিয়ে আছে সুখী ;
জাহাজের কথা ভুলেও তাদের মনেতে মারে না উঁকি।
কত পাল তুলে কত না জাহাজ আসে যায় অপরূপ,
পৌরাণিক সে ধমকের চোটে ব্যাপারীরা সব চুপ !"

পৌরাণিক ধমকটি হল— 'কিম্ আর্দ্রকবণিজো বহিত্রচিন্তয়া !" ঐতিহ্যের সাংস্কৃতিক মূল্য থাকলেও এদেশের অনেক শিক্ষিত লোকেরও কূপমণ্ডুকতার অন্ত নেই—বিজ্ঞানী বনফুল সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ব্যঙ্গের মাধ্যমে। —সত্যেন দত্ত সবুজপরী নীলপরী প্রভৃতির প্রশস্তি গেয়েছেন ; বনফুলের আছে রাঙাপরী, কিন্তু সে ছন্দের পাখনায় ভর ক'রে আকাশে মিলিয়ে যায়নি (—শেলির ভরত পাখীর মতো) :

"সবুজ রঙের রঙীন মহলে রাঙাপরী এক গান করে ;
উষার অরুণ কিরণ মাখান শিশিরের জলে স্নান করে।……
ওই যে আড়ালে সবুজ পাতার
রাঙা গোলাপটি কেমন্ বাহার !"

বনফুল প্রবীণ পাঠকের প্রতি কটাক্ষ করে বলেছেন—তিনি হয়ত রূপকথার আবির্ভাব আশঙ্কা করে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু সৌন্দর্য-পিপাসুর দৃষ্টি থাকলে আমরা মর্ত্যকাননেই বাস্তব পরীকে দেখতে পাই। বলা বাহুল্য, এটি পুষ্পপ্রেমিক কবির কল্পনার রম্য উপহার। —'ফরমায়েসি প্রিয়া' কবিতাটি ব্যঙ্গরসের ঝর্ণা ; 'আসল প্রিয়া' ও 'বিবাহের ব্যাকরণ' কবিতাদ্বয় থেকেও অনুরূপ রস নিঃসৃত হচ্ছে। তৃতীয় কবিতার শেষ স্তবকটি ভোক্তাদের উপহার দিচ্ছি :

"এমনি করে সুখে দুঃখে গেল কয়েক বর্ষ,
স্বামীর হল ম্যালেরিয়া যক্ষ্মাকাশ ও অর্শ ;
ক্রমাগত প্রসব করে বধূ হলেন রুগ্ণ ;
দেহলতা হয়ে গেল কাঠির মতন শুকনো,
হঠাৎ একদিন মরেও গেলেন ছেড়ে এ ঘর কন্না,
ঘটক মশাই নতুন করে দিলেন দোরে ধর্ণা।
ব্যাকরণের চাঁছা গলায় বাজল ঠনন্ ঠঞ্—
'বি' পূর্বক 'বহ্' ধাতু—তার উত্তর ঘঞ্ !"

করুণ ও ব্যঙ্গ রসের এরূপ সংমিশ্রণ বনফুলের কাব্যেও বিরল। —'সত্য ও মিথ্যা' কবিতাটির শেষ স্তবক উদ্ধৃতির যোগ্য :

"ঈশ্বর দয়াময়, করি তাঁর নাম গান,
　　তাঁরি কথা অহরহ জাগে মোর চিত্তে ;
মাঝে মাঝে ভয় হয়, দেখো যেন ভগবান্,
　　তুমিও না শেষকালে হয়ে যাও মিথ্যে !"

বনফ‍ুল ছিলেন সেশ্বরবাদী, এমন কি ম‍ূর্তি'প‍ূজোও তিনি করতেন। কিন্তু ক্বচিৎ কোনো অন্তরঙ্গ ম‍ুহ‍ূর্তে তাঁর ম‍ুখ থেকে আমি সংশয়বাদের গোপন কথাও শ‍ুনেছি, মননশীল হৃদয়বানের যা না ভেবে উপায় নেই। অবশ্য, সংশয়বাদী নাস্তিক নন,—তাঁর চিন্তায় য‍ুক্তির অনিবার্যতা না থাকলেও বিনয়ের ক‍ুণ্ঠা আছে। এর ফলে ব্যঙ্গ-কবিতাটি বিধ‍ুরাক্ত হয়ে গেছে, যা বনফ‍ুলের কোনো কোনো ওর‍ূপ কবিতার বৈশিষ্ট্য। —যাই হোক্, 'আরোহণী' তাঁর কাব্য-মালঞ্চে আরোহণের সসঙ্কোচ সোপান।

৪

দ্বিতীয় স‍ুরের নাম 'প্রেমের কবিতা'। এই অংশে আটাশটি সনেট সহ ছোট বড়ো মোট একশ' কবিতা আছে। এই স‍ুরে আধ‍ুনিকতার মীড় আছে, স‍ুতরাং বনফ‍ুলকে প‍ুরাতনপন্থী কবি ব'লে অনাদর করা চলবে না। প্রথম কবিতাটি তিনি নিবেদন করেছেন সবিনয়ে ঃ

"আমার মনের রঙীন কথাটি　　মনের ভিতর আছে ;
তাহারে ম‍ুরতি দিবে বলি' মোরে　　কবিতা আসিয়া যাচে।
এত রঙ তার আছে কি ভাষায়—　　ভয় হয় মোর খালি,
কলমের ম‍ুখে লিখিতে গিয়া সে　　লাগাইয়া দিবে কালি !"

কিন্তু ভয়ের হেতু ছিল না। কবির রঙীন কথাগ‍ুলি বিচিত্র ছন্দে ও সরল ভাষায় সতিসত্যি বর্ণাঢ্য হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের 'অনন্ত প্রেম' কবিতার আংশিক প্রতিধ্বনি ও জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন'-এর অস্ফ‍ুট প‍ূর্বরাগিণী শ‍ুনতে পাচ্ছি চতুর্থ কবিতায়, তবে বাক্‌প্রতিমা বনফ‍ুলের নিজস্ব ঃ

"মনে হল চিনি চিনি,
কোন্-সে জনমে একই হাটে যেন
　　করিয়াছি বিকিকিনি।
আরব ইরাণ র‍ুশিয়া জাপান
　　কোশল উজ্জয়িনী—
কি জানি কোথায় ওই স‍ুরে যেন
　　বাজাইতে কিঙ্কিণী।
　　মনে হল চিনি চিনি।"

একাদশ কবিতায় আছে ঃ

"ও দ‍ুটি নয়নের নীরবতা
গোপনে মোর সনে কহে কথা।"

কবিগ‍ুর‍ুর 'প‍ুর‍ুষের উক্তি'কে স্মরণ করায়, তবে বনফ‍ুলের বাক্‌চিত্রে গভীর ব্যঞ্জনা আছে। —ঊনবিংশ কবিতায় পাচ্ছি ঃ

"ম‍ুখেতে যে-কথা যায়নাক বলা　　চোখেতে সে-কথা কহে ;

চোখেও যে-কথা পারেনা বলিতে হাওয়ায় সে-কথা বহে !"

হাওয়া-ই যেন যক্ষের মেঘদূত, যে পবনদূতে রূপান্তরিত হয়েছে। তবে এ সমস্তই প্রেমের চিরন্তন বাণী, যুগে যুগে যা নবরূপ ধারণ করে প্রাচ্যে তথা প্রতীচ্যে। —পঞ্চবিংশ কবিতাও অনুরূপ ঃ

"এসেছে তোমার চিঠি।
তরল কথায় সরল স্নেহের সুললিত কাহিনীটি।
এ নহে কালির আখর শুধু রে,
ভাসিয়া এসেছে সুদূরে—
সহজ লিপির স্বচ্ছ মুকুরে আঁখিভরা চাহনিটি।"

চত্বারিংশ কবিতাটি ছোট্ট হলেও অকিঞ্চিৎকর নয় ঃ

"সংশয়ে সারা হই, বন্ধুরে ডেকে কই—
বল্ দেখি, ভাই, ভালো বাসে কি না আমারে সই ?'
বন্ধু কহিল—'ভালোবাসে কি না ?
হতেও পারে বা—ঠিক তো জানি না।'
ফিরিনু হতাশ্বাসে ; বিশ্বাস ছিল পাশে,
আশ্বাস দিয়া কহিল আমারে— 'বাসে বাসে, ওগো, বাসে !"

অলংকারবিরল ভাষাতেও কাব্য রচনা করে প্রাণের তন্ত্রীতে ঝংকার তোলা সম্ভব—এখানে তা প্রমাণিত হয়েছে ; এ যেন—বিশ্বাসে মিলয়ে প্রেম, তর্কে বহুদূর ! অমর প্রেমের প্রতীক 'ঈশ্বরপুত্র' সম্পর্কে টেনিসনও অনুরূপ কথা বলেছেন।

সনেট সমালোচনার আগে প্রেম পর্যায়ের আরেকটি কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি, যার থেকে প্রতিপন্ন হবে যে এসব কবিতা কবিজায়ার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত ঃ

"লীলাবতী, লীলাবতী, লীলাবতী গো,
কাছে কাছে থেকে তবু দূরে অতি গো !
দূরে ছিলে জানা ছিল দূরে রয়েছ,
কাছে এসে, লীলাবতী, একি হয়েছ !"

কবির অন্তিম জীবনে রচিত 'লী' পুস্তিকা লীলাবতীকেই লক্ষ্য করে গদ্যকাব্যের কল্পনা-উড্ডয়ন। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'উদ্ভ্রান্ত প্রেম'ও গদ্যকাব্য, কিন্তু তাতে প্রচুর বাচালতা ও কৃত্রিমতা রয়েছে,' বনফুলের 'লী' ওসব ত্রুটি থেকে মুক্ত। তাছাড়া, কবি সাময়িক শ্মশানবৈরাগ্য দ্বারাও বিভ্রান্ত হননি। একাধারে গৃহিণী, সচিব, নর্মসখী ও রম্যকলার প্রিয় জহুরীর বিয়োগে মর্মাহত কবি কল্পনার সাহায্যে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন ছায়াপথের উদার প্রাঙ্গণে ; সেই অলোক মিলনের কান্তকোমল কাহিনী 'লী'-তে লীলায়িত হয়েছে লেখনীর উদ্দাম গতিতে, যে লেখনীর সঙ্গে তুলিও যেন মিলিত হয়েছে আত্মিক বন্ধনে। একমাত্র রবার্ট ব্রাউনিঙ এর আগে স্বকীয়া-প্রেমের রমণীয় কবিতা রচনা করেছেন। অবশ্য, ব্রাউনিঙের গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বনফুলের অধিকাংশ কবিতায় পাওয়া যাবেনা ; তা সত্ত্বেও তিনি পরকীয়া-প্রেমে না ভুলে প্রণয়ের চারণ কবি রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। নাটকীয় একালাপও তাঁর কাব্যে বিশেষ নেই ; কিন্তু অজস্র গীতি কবিতার ফুলঝুরি তিনি জেলেছেন অনায়াসলব্ধ নিপুণতায়। সেইন্টসবেরি কাব্যকে বলেছেন—

"জীবনের ইন্দ্রিয়সম্পৃক্ত ও মননাত্মক তথ্যের আবেগপূর্ণ ছন্দোবদ্ধ প্রকাশ," ; বনফুলের প্রেমের কবিতারাজিতে এই সংজ্ঞার ভূরি ভূরি নিদর্শন আছে। বাঙালী পুরুষের জীবনে প্রেমের প্রয়োজন ফুরিয়ে না গেলে বনফুলের প্রেমগীতি কাব্যরসিকের হৃদয়কে রসোদ্বেল করে তুলবে—অন্তত তা করা উচিত—আমার বিশ্বাস। তাঁর সনেটগুচ্ছ পাঠ করলে এ বিশ্বাসের যাথার্থ্য সপ্রমাণ হবে।

'চতুর্দশী' স্তবকের 'কৃষ্ণা' ও 'শুক্লা' এই দুইভাগে বিন্যস্ত চতুর্দশপদীগুলি দুঃখসুখের জোড়াসুতোয় গাঁথা একটি অনবদ্য প্রণয় কবিতামাল্য, কান্নাহাসির সুরমেলানো পক্ষিমিথুনের পালা। এসব কবিতার কোথাও কোথাও শেক্সপীয়ারের সনেটের এবং ওমরখৈয়ামের রুবাইয়াতের সঙ্গে সাদৃশ্য পাওয়া যায়, কিন্তু বনফুলের স্বকীয়তা তাতে ক্ষুন্ন হয়নি। অত্যাধুনিক কোনো কোনো বাংলা কবিতার পূতিগন্ধ তন্মধ্যা রিরংসা অবশ্য এতে নেই, কিন্তু প্রণয় পারিজাতের মহিমা কীর্তিত হয়েছে নব নব পরিবেশে ও ভাবের বৈচিত্র্যে। এরূপ প্রেমকে শাশ্বত বলা চলে, কারণ তা পুরাতন হয়েও নূতন—চকিতের চিরায়ণের জন্য ; সুতরাং তার কাব্যরূপ সব যুগেই আধুনিক, যদিও সাম্প্রতিক কবিতার তাকলাগানো রূপকল্প এখানে সুদুর্লভ।—শেক্সপীয়ার তাঁর সনেট বিশেষে প্রেমাঙ্গনে মিথ্যার প্রশস্তি গেয়েছেন, এবার বনফুলের কথা শুনুন ঃ

"একে একে বন্ধ করি এস সব বাতায়ন দ্বার,
আঁধারের স্বপ্ন দেখি, বাহিরেতে থাকুক দিবস ;
ভালবাসি ভালবাসি ভালবাসি বল বারংবার,
যতক্ষণ নাহি হয় শুষ্ক তালু রসনা বিবশ।
কিন্তু সখি অন্ধকারে ! অন্ধকার আনে স্বপ্ন সুধা,
সত্যের সামর্থ্য নাই মিটাইতে এ মনের ক্ষুধা।"

বনফুলের প্রেমের কবিতায় অস্থিমাংসলোভী গোবিন্দচন্দ্র দাসের ও স্মরগরলদিগ্ধ মোহিতলালের বাস্তব স্থূলতার পরিচয় পাওয়া যাবে না, ইঙ্গিত মিলবে না অচিন্ত্য সেনগুপ্ত বা বুদ্ধদেব বসুর কটুগন্ধ অন্ধকারের। অথচ স্বপনপসারী হয়েও তিনি বাস্তববাদকে পুরোপুরি বিসর্জন দেননি,—বরং কোথাও কোথাও অববাস্তববাদের সূক্ষ্ম রেখাচিত্রও অঙ্কন করেছেন ঃ

"সম্মানিত করে কভু, কভু করে লজ্জিত আমারে,
দগ্ধ করে, শান্ত করে, করে মোরে পীড়ন লালন ;
আমার মনের ক্ষুধা—ভালবাসি ঘৃণা করি তারে,
সঙ্গোপনে রাখি কভু, কভু তারে করি আস্ফালন।
প্রবল সে অনিবার্য, বহুরূপী ভীষণ মধুর,
মোর মাঝে শুনেছ কি তুমি, সখি, সে-বিচিত্র সুর ?"

আমার মন্তব্যের সমর্থনে আরেকটি কবিতাংশ পরিবেশন করছি ঃ

"যে দ্যুতিরে স্তুতি কর সে আমার নহে পরিচয়,
আলোকের আবরণ অন্তরাল করেছে তিমিরে ;
রঙ্গমঞ্চে দম্ভভরে করিয়া চলেছি অভিনয়,
যবনিকা অন্তরালে দেখেছ কি অভিনেতাটিরে ?

দেখেছ কি সেথা তারে যেথা তার নাহি বেশবাস,
নাহি কোন প্রসাধন, নাহি কোন বাহিরের সুর ;
অতিশয় স্থূল রূপে সেখানে সে স্বয়ংপ্রকাশ,
লুব্ধ ক্ষুব্ধ আশাহত অনাবৃত লজ্জিত আতুর ?"

যেখানে অস্তিত্ববাদীরা বিবমিষার স্থূল হস্তাবলেপ দেখান অসংকোচে, সেখানেও বনফুলের মাত্রাজ্ঞান শালীনতার সীমা অতিক্রম করেনি। তা সত্ত্বেও বনফুল ছুঁৎমার্গবাদী নন ঃ

"স্বপন-সরণি' পরে নামিয়াছে অন্ধকার রাতি,
সহসা থামিয়া গেলে, বল কেন বিশুষ্ক অধরে ;
এ দুরূহ পথে, সখি, কেন বল হয়েছিলে সাথী,
অকস্মাৎ মধ্যপথে থেমে যাবে যদি ক্লান্তিভরে ?
কৃষ্ণা চতুর্দশী নিশি ক্রমশ হতেছে ঘনতর,
নূতন মহিমাভরে সার্থক তাহারে তুমি কর।"

কৃষ্ণপক্ষের পরেই আসে শুক্লপক্ষ, সুতরাং ঃ

"আকাশ হইতে আলো নামিতেছে মাটির ধরায়,
নির্বাপিত প্রদীপেরে কে দিল জ্বালিয়া পুনরায় ?"

অন্য কবিতায় আছে ঃ

"বস্তুর জগতে, সখি, বারে বারে বাধা দেয় সীমা,
আজি এই জ্যোৎস্নালোকে অসীমের পেয়েছি সন্ধান ;
দেহ নয়, দেহাতীত, বস্তু নহে, অবস্তু-মহিমা,
দীপ নয়, শিখা নয়, হেরিতেছি আলো অনির্বাণ।"

এসব কবিতায় জন্ ডানের প্রভাব নেই, তবু বনফুল যেন পারতাত্ত্বিক কবির সমানধর্মা। তিনি আরো বলেছেন আলোকসন্ধানী মানবমন কল্পনার দ্যুতিমান্ রথে অজানার তমোলোকে আলোর সন্ধান করে ঃ

"অন্ধকারে মৃত্যু তার,—মানে না সে আপন বিনাশ,
অন্তরের অন্তঃস্থলে জ্বলে মৃত্যু-বিজয়িনী শিখা ;
আলোকের প্রত্যাশায় ক্ষণিকের আঁধার-বিলাস
ক্ষণিকে বিলুপ্ত হয়,—আলো জ্বালে মানস-দীপিকা।
সে-আলোক জ্বলিয়াছে ; বিদূরিত অন্ধকার তমা,
সে-আলোকে নবরূপে চিনেছি তোমারে, প্রিয়তমা !"

আবার অস্তিত্ববাদীকে যা নৈরাশ্য দেয়, বনফুলকে তা দিয়েছে আশার আশ্বাস ঃ

"নিজ দুর্গে নিজে বন্দী ; জলবিন্দু নাহি পিপাসার,
বাহিরের পথ নাই, প্রাচীর প্রাচীর চারিদিকে ,
পাষাণে কুটিয়া মাথা আপনারে হানি বারবার,
সহসা চাহিয়া দেখি—চেয়ে আছ তুমি অনিমিখে।"

বন্দী প্রমীথিউসের বন্ধনদশাকে বনফুল অস্তিত্ববাদীদের মতো মুক্তির কল্পনাব্যসনে রূপান্তরিত করেননি, কারণ তিনি প্রকৃত মুক্তির সন্ধান পেয়েছেন প্রেয়সীর অনিমেষ দৃষ্টিতে। তাই তিনি গেয়ে উঠলেন ঃ

"সত্য আজি স্বপ্নময়; ভাষা আজি লভিয়াছে সুর;
অতীত জীবন-কথা স্বপ্নকথা সম সুমধুর।"
"মহান্ আলোকতীর্থে চমৎকৃত দাঁড়াইয়া আছি,
বিমোহিত আত্মহারা তোমার আত্মার কাছাকাছি।"

বনফুলের প্রেয়সী অর্ধেক মানবী আর অর্ধেক কল্পনা ন'ন,—দিব্যমহিমান্বিতা মানবী :

"সে-আলোক আজি, সখি, উদ্ভাসিত তব মুখ' পরে,
তার দিব্য দীপ্ত বাণী কাঁপিতেছে আঁখিতে অলকে ;
জ্যোতির্ময়ী বার্তা তার লেখা তব কপোলে অধরে,
মর্ত্য মানবীরে ঘেরি, অমর্ত্যের মহিমা ঝলকে।"

অবশ্য, এখানেও কল্পনার মায়াঞ্জন কাজ করছে ; প্রিয়া দেবীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন, কিন্তু কবি কল্পনার ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন ন'ন। বর্তমান যুগে এরূপ রূপান্তর কাব্যে সুলভ নয় ; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে বনফুল প্রাচীনপন্থী ; বরং বলতে হয়—আধুনিক কাব্য ভয় হেতু প্রেমিকের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে যথাযথ রূপায়িত করে না। বস্তুত, বনফুলের প্রেমের কবিতায় অনাবিল রস ও ঐন্দ্রচাপ কল্পনার মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছে, এবং ব্যঞ্জনাও ভাষার অতীত তীরের সন্ধান দিচ্ছে ; তাই এই সুর তাঁর সরস্বতী বীণায় অপূর্ব মূর্ছনা সৃষ্টি করছে। তাঁর সনেটগুচ্ছ একটানা পড়া দরকার, কারণ সবকটিই পরস্পর সম্বন্ধ হয়ে ঐকতানের ইন্দ্রজাল রচনা করেছে। আমার ধারণা, বিদগ্ধ-রসিক সম্পাদকরাও বনফুলের প্রেমের কবিতার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেননি, কারণ তা করলে কাব্যসংগ্রহরাজিতে তাঁর একাধিক প্রণয়সনেট নিঃসন্দেহে স্থান পেত। শেক্সপীয়ারের মতোই সনেট-কুঞ্চিকা দ্বারা তিনি হৃদয়ের দ্বার উন্মোচন করেছেন এবং সে-হৃদয়ের ঐশ্বর্য অনাবিল প্রেমের রত্নদীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। আমরা কি নূতনত্বের মোহে হীরকের বদলে কয়লার অলঙ্কারে কলালক্ষ্মীকে লাঞ্ছিত ও নিজেদের প্রবঞ্চিত করবো ?

৫

তৃতীয় সুর 'স্বদেশী কবিতা'-র 'আহবনীয়' অংশের মুখবন্ধে বনফুল বলেছেন ঃ

"নিপীড়িত মানবের বিশ্বাসের গান
পুরাতন ছন্দে গাহিলাম,
স্বকীয়তা নাহি কিছু ; নাহি মোর হেন অভিমান…।

কিন্তু কথাটি আংশিকভাবে সত্য, কারণ তাঁর অভিমান না থাকলেও ছন্দ পুরোপুরি পুরাতন নয় এবং বক্তব্যও ঠিক মামুলি নয়। দৃষ্টান্ত চাই ? শুনুন ঃ

"আনন্দে বিশ্বাস করি ; যে আনন্দ জীবন-স্পন্দন,
যে জীবন ছিন্ন করে সমস্ত বন্ধন,
চূর্ণ করে বাধা বিঘ্ন সব,
যে জীবন প্রদীপ্ত উৎসব
মৃত্যুর আঁধারে ;
শাশ্বত মানব আজি চলিয়াছে ঝঞ্ঝা-অন্ধকারে
দ্বন্দ্ব যুদ্ধ ভেদি'

লক্ষ্য করি' সেই তীর্থবেদী
যেই দেবী পাদমূলে অকম্পিত শিখা জ্যোতির্ময়,
উদ্ভাসিত বাণী কহে—নাহি ভয়, নাহি কোন ভয়।"

রবীন্দ্রনাথেরও এই ধরনের কবিতা আছে, কিন্তু বনফুলের স্বকীয়তা ম্লান হয়নি এবং কবিতাটিও রসোত্তীর্ণ। অথবা :

"তোমরা জেগেছ, আর কিবা ভয়—
তোমরা পারবে, তোমরা পারবে ;
পশুর সঙ্গে লড়ছে মানুষ—
মানুষ জিতবে, পশুরা হারবে।"

'জয় হিন্দ' কবিতায় আছে :

"স্বাধীন ভারতবাসী এ মোদের সত্য পরিচয়,
জয় হিন্দ, জয় হিন্দ—উচ্চকণ্ঠে বলহ নির্ভয়।"

আরো আছে :

"বাংলার মেয়েরা, তোমরা কোথা ?
তোমাদেরি লাগি বসিয়া আছি যে
আশার প্রদীপে জালায়ে আলো।"

দেশে নেতার অভাব কবি লক্ষ্য করেছেন ; এখন বেঁচে থাকলে একথা আরো মর্মান্তিক ভাবে উপলব্ধি করতেন। কিন্তু কবি দ্রষ্টা, তাই বলেছেন :

"নেতা যখন নাইক দেশে, নিজেই তোরা এগিয়ে চল্ ;
গঙ্গা যখন খর স্রোতে নামল গিরিশিখর হতে,
কে ছিল তার নেতা তখন, দেখিয়েছিল কে তার পথ ?
তাহার স্রোতেই তলিয়ে গেল অহঙ্কারী ঐরাবত

কোথাও কোথাও সমবয়সী নজরুলের অনুরূপ ভাব ও ভাষা আছে, কিন্তু তাতে বনফুলের স্বকীয়তা নষ্ট হয়নি :

"আরোহী,
ওই দেখ গগনচুম্বী পাহাড়,
প্রস্তরসঙ্কুল কণ্ঠকাকীর্ণ দুর্গম পথ,
তবু তোমাকে উঠতে হবে ওই চূড়ায়
যেখানে তোমার পূর্বপুরুষেরা
সোল্লাসে একদা উড়িয়েছিলেন বিজয়-কেতন।"

'ত্রাণ কর' কবিতায় আছে :

"হে অগ্রণী, হে বিদ্রোহী, কোথায় তোমরা বল বল,
আর দেরি করিও না, ওঠ জাগ, চল চল চল ;
অন্তরে নিষ্পিষ্ট হয়ে দেশবাসী মুমূর্ষু কাতর,
বলিষ্ঠ লগুড়াঘাতে চূর্ণ করি' পশুত্ব-পাথর
ত্রাণ কর তাহাদের ; মিথ্যার মুখোশ যাক টুটে,
বীরত্বের ভেরী শুনি' আগ্রহে আসুক সবে ছুটে।"

বায়রনের কবিতাবিশেষের কথা এখানে মনে পড়া স্বাভাবিক। স্বাধীন ভারতে মাতৃভাষার জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে যে বাঙালী যুবকেরা পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের স্মরণে বনফুল লিখেছেন হৃদয়শোণিতস্নাত 'রক্ত' কবিতা ঃ

"রক্তের কাহিনী লেখা ইতিহাসে কাব্যেতে পুরাণে,
রক্তপদ্মে প্রদক্ষিণ করে নিত্য লোলুপ ভ্রমর ;
খ্রীষ্ট লিঙ্কন গান্ধী রক্তস্নানে হয়েছে অমর। …
রক্তবাণী লেখা থাকে চিরন্তন কালের সূচীতে,
সপ্তসিন্ধুর বলে রক্তচিহ্ন পারে না মুছিতে।"

স্বদেশী সুর অংশের বেশি কবিতা বনফুলের শ্রেষ্ঠ কাব্যকৃতির মধ্যে স্থান পাবে না। তাদের বেশ কয়েকটিকে ফরমায়েসি না হলেও তাৎক্ষণিক ব'লে মনে হয়। তবে অনেক কবিতাংশ রসোত্তীর্ণ, কারণ তারা বীররসের উন্মাদনা জাগায় তরুণ প্রবীণের ধমনীর রক্তস্রোতে।

চতুর্থ সুর 'ব্যঙ্গ কবিতা' গুচ্ছে সত্তরটি কবিতা স্থান পেয়েছে। ব্যঙ্গকবিতার রচয়িতা রূপে বনফুল 'শনিবারের চিঠি'র আসরে অবতীর্ণ হন। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সব্যসাচী—পরিহাস ও উপহাস উভয়েই সমান দক্ষ এবং যুগপৎ পঞ্চানন্দ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রসরাজ অমৃতলাল বসুর যোগ্য উত্তরসূরি। তাঁর কলম কখনো হয়েছে হাসির রংমশাল, আবার কখনো ব্যঙ্গের শাণিত কুঠার ; কিন্তু দু'টিই আমাদের প্রচুর হাসালে ও দ্বিতীয়টি ভণ্ডামি বা চরিত্রহীনতা দূর করতে পারেনি। অবশ্য কলির পরশুরামের কুঠারও তা করতে পারেনি—অসাড় সমাজের উদাসীনতার জন্য। তবে সমাজ-সংস্কার কবির প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য নয়, তা হচ্ছে নান্দনিক তৃপ্তিবিধান এবং সে-বিষয়ে বনফুল যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছেন। শিবরাম চক্রবর্তীর মতো শাব্দিক কসরতের কাতুকুতু দিয়ে তিনি আমাদের হাসাতে চেষ্টা করেননি; বাগর্থের মাধ্যমে তিনি মননশীল ব্যক্তিদের আনন্দদানের প্রয়াসী ছিলেন। এ পর্যায়ের কবিতারাজির প্রথমটিতে বনফুল আত্মপ্রচারশীল সাহিত্যকদের প্রতি ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করেছেন ঃ

"কেবল সাহিত্য করি এ বাজারে যাঁরা
হতে চান সাহিত্যিক' নমস্য তাঁহারা।
তাঁহাদের বিরচিত বাণী-অর্ঘ্যমালা
হয়তো বা ভবিষ্যতে কোন গ্রন্থশালা
সসম্ভ্রমে রক্ষা করিবেন ; ক্ষুদ্রাক্ষরে
লিপিবদ্ধ করি ক্যাটালগ নিষ্ঠাভরে
হয়তো ব্রজেন্দ্র কোন নিখুঁত তারিখে
ইতিহাসও তাঁহাদের রাখিবেন লিখে।…
বাঁচিয়া থাকুন তাঁরা অথবা মরুন,
দয়া করি এ বাজারে তাঁহারা সরুন।
এ বাজারে শোনা যায় যাঁর হাঁকডাক
জগজ্জম্পা বীর তিনি স্কন্ধে জয়ঢাক।"

অবশ্য, এ কবিতায় প্রচারবিমুখ কবির প্রচ্ছন্ন অভিমানও রয়েছে, যা' শেষ জীবনে বনফুল তাঁর আত্মজীবনী 'পশ্চাৎপট'-এ আরো তীব্র ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। 'জবাবদিহি' কবিতায় আছেঃ

"জুতসই আঁকসি দিয়ে
পাড়া যায় ফুল ফল,
এমন কি খেতাব টেতাবও ;
পাড়া যায়না ভাল কবিতা বা গল্প ;
সে আঁকসি যদি
রূপার, সোনার বা প্লাটিনামেরও হয়,
তবু যায় না।
অনুরোধ উপরোধ অনুনয় কিছুতে না।
মরজিমহলের যে মায়াকাননে ওরা বাজে,
তার কপাট খোলে
ঊনপঞ্চাশ বায়ুর লীলাস্পর্শে।
তাই কিছু লিখতে পারলাম না, ভাই !
যা লিখলাম
তা কবিতা নয়, জবাবদিহি।"

প্রসঙ্গত, উল্লেখযোগ্য এই যে বনফুলের বিচিত্র চিন্তার কাব্যময় রোজনামচা 'মর্জিমহল' নামে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়েছে কুমারেশ ঘোষের 'যষ্টিমধু' পত্রিকায়। —ওপরের কবিতাটি তরল রসের নমুনা। নিষ্করুণ ব্যঙ্গ আছে 'ভিক্ষা চাই' কবিতায় ঃ

"জীবনের কাছে হাত পেতে রোজ ভিক্ষা চাই,
লুট করবার সাহস কিংবা শিক্ষা নাই।······
খোশামোদ করি ঘরে ও বাহিরে ;
গুরু দেখলেই দীক্ষা চাই,
জীবনের কাছে হাত পেতে রোজ ভিক্ষা চাই।"

এই কবিতার গোড়ার দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের কথার প্রতিধ্বনি আছে। আত্মবিশ্বাসের অভাব চটুকারিতা ও দৈবনির্ভরতার দিকে মানুষকে ঠেলে দেয়। অধিকাংশ বাঙালীর কর্তাভজা মনোবৃত্তির জন্য অলিতে গলিতে ব্যাঙের ছাতার মতো দাদাজি বাবাজি গজাচ্ছে। বনফুল ব্যাপক ভিক্ষাবৃত্তির নিন্দে করেছেন পরিষ্কার ভাষায়। কাব্য-সমালোচককে বলছেন ঃ

"কে তুমি ধরিয়া আছ কাব্যের নিক্তি
গন্ধ মাপিছ বসি জ্বালাইয়া ধূপকে—
দুলটির চিকিমিকি, সন্ধ্যার স্বর্ণ,
শ্যামলী মেয়ের চোখে স্বপ্নের বর্ণ,
কলকোলাহলে ভরা রাজধানী মত্ত,
রসালের স্মৃতিবহ শুধু আমসত্ত,
গহন নিশীথ রাতে গাঢ় নিশ্চুপকে—

কোন্ চোখ মন দিয়ে কোন্ বাটকারা দিয়ে
ওজন করিবে বল এতগুলি রূপকে !"

বেন্থার বলেছিলেন—সমান আনন্দ দিলে পুশপিনখেলা ও কাব্যপাঠ সমপর্যায়ের। কিন্তু আমরা সবাই নৈতিক বা নান্দনিক আদর্শকে ঐকশৈলিক ভাবি না, সৌন্দর্যেরও রকমফের আছে। সুতরাং সৌন্দর্যের মূল্যায়ন যে বিচারমূঢ় তা প্রমাণিত হয় না। তত্ত্বহিসেবে বনফুলের বক্তব্য গ্রহণীয় না হলেও কাব্যরূপে রমণীয়।

বনফুলের দেশপ্রেম খাঁটি;—তাতে মননশীলতার সঙ্গে স্পর্শকাতরতার মিলন ঘটেছে। ব্যঙ্গবুলেটের মধ্যে তাঁর ব্যথার বারুদ পোরা আছে। ক্লিষ্টমনে তিনি 'এখনকার প্রশ্ন' করছেন :

"বক্তৃতা গর্জিয়াছিল মঞ্চ প্রকম্পিয়া—
'আমাদের হবে জয়, নাহি ভয় নাহি ভয় ;
ধ্বজাহস্তে চল প্রদক্ষিয়া ;
বিদেশীরে কর দূর, মর্ত্ত হবে স্বর্গপুর,
সুখৈশ্বর্য আসিবে ঝম্পিয়া।'
এ গর্জনে বহুলোক দিয়েছিল সাড়া,
ছুটেছিল খালি করি পাড়া ও বেপাড়া।
তারপর ?
কেটে গেছে কুড়িটি বৎসর।
শ্রীদুর্গাকে সম্বোধিয়া আর্তকণ্ঠে কহি আজি—
'দুর্গতিনাশিনি !
দুর্গতির শেষ প্রান্তে এখনো কি আমরা আসিনি ?"

কিন্তু তারপরে আরেক যুগ কেটে গেছে : রাজনীতির চরম নগ্ন নির্লজ্জতা বনফুল দেখে যেতে পারেন নি। তা দেখলে তাঁর 'এখনকার প্রশ্ন' আরো মর্মান্তিক হতো, —হয়তো স্বয়ং দুর্গতিনাশিনীর ওপর আস্থার ভিতে ফাটল ধরতো—'কিংবদন্তী' কবিতাটি উপাদেয় ; তার উপসংহার এরূপ :

"কিংবদন্তী যুগে যুগে দেখিয়ে গেছে পথ।
সত্য থেকে আমরা যখন ছুটে পালাই
'চড়ে মিথ্যা বাসে,'
কিংবদন্তী হাসে।"

কিছু কিংবদন্তী সত্য হলেও অনেক কিংবদন্তীই অর্ধসত্যের শিলীভূত রূপ ; কাজেই তা আমাদের প্রায়ই দুমুখো পথ দেখায়। সত্যসন্ধানী ব্যক্তিরাও প্রয়োজনবোধে দ্ব্যর্থক ভাষণের আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং এরূপ ভাষণ কালক্রমে কিংবদন্তীর রূপ নিলে তাকে নির্বিচারে গ্রহণ করেন। তা সমর্থনীয় নয়। অবশ্য, বনফুলের উপমাটি উপভোগ্য।—কবিত্বের কমতি থাকলেও 'পনেরোই আগস্ট' কবিতাটি বনফুলের মর্মযন্ত্রণাকে প্রকাশ করছে করুণ স্বরে, যদিও নির্বিকারত্ব এদেশের গীতাপ্রশস্ত সনাতন আদর্শ :

"ক্ষমতা পেয়েছি বই কি !
অনাহারে থাকবার ক্ষমতা,

অপমান অবিচার অত্যাচার সহ্য করবার ক্ষমতা,
চোর দাগাবাজ গ্ৰুডা ভণ্ডদের পায়ে
মাথা ল্‌টিয়ে দেবার ক্ষমতা !
বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের মতো হয়ে গেছি প্রায়,
হতে পারিনি কেবল নির্বিকার।
হে পনেরোই আগস্ট,
সেই টুকুও করে দাও, দয়া করো—
তাহলে পূর্ণ স্বরাজের পূর্ণ স্বাদ পাবো।”

ইলিয়ট আধুনিক যুগের গ্লানি ও নৈরাজ্যকে কাব্যে প্রকাশ করেছেন কাংস্যকণ্ঠের ঝনৎকারে, আর বনফুল স্বাতন্ত্র্যোত্তর ভারতের অসহায় অবস্থাকে রূপ দিয়েছেন নিরলঙ্কার বক্রোক্তির আর্তনাদে—স্যামুয়েল বেকেটের মতো। স্বাভাবিক কারণেই কাব্যের কমনীয়তা লুপ্ত হয়ে গেছে। পরপর অনেকগুলি কবিতায় কবিচিত্তের হাহাকার রক্তক্ষরা বাণীতে রূপায়িত হয়েছে। 'হিন্দু বাঙালী' কবিতায় তিনি বলেছেন :

“পদ্মাতীরে মার খেলি তুই গঙ্গাতীরেও খেলি,
ব্রহ্মপুত্র তীরেও তো তুই রক্তে ভেসে গেলি।
বৈতরণী তীরেও এবার কি হবে তোর হাল,
দেখবে বলে' বসে আছে স্বয়ং মহাকাল।

'যষ্টিমধু' পত্রিকার এবারকার 'বর্ষশুরু' সংখ্যায় ডঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্তের 'আসামের প্রতি' নামক ব্যথাকরুণ কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। বনফুল বেঁচে থাকলে হয়তো ”দ্বিপদ-দ্বিভুজ নরাকার স্থলচর”—এর উদ্দেশে তীক্ষ্ণতর ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করতেন তাঁর কাব্যতূণীর থেকে। তাঁর 'মড়া' কবিতায় ইলিয়টের 'ফাঁপা মানুষ”-এর অনরূপ তিক্ততা আছে :

“আমরা মরিয়া গেছি সে কথা বুঝিনি মোরা আজও;
আমরা বাঁচিয়া নাই—বাঁচিবার করি শুধু ভাণ ;
দেখিতেছ শোভাযাত্রা ? ও যে শবযাত্রা, ভাই,
চলেছে মড়ার দল হস্তে বহি প্রেতের নিশান।”

বনফুল ব্যঙ্গরসের কবিতার জাদুকর। সজনীকান্ত দাসের ব্যঙ্গকবিতায় মধুর থেকে জলের মাত্রা বেশি, কিন্তু বনফুল সম্বন্ধে একথা খাটে না। তাছাড়া আরিস্তোফানেস ও পরশু-রামের ন্যায় তিনি ব্যঙ্গরসের কবির সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে খুবই সচেতন। —এডওয়ার্ড লিয়ারের লিমেরিকের সগোত্র বনফুলের ছর্‌রা-নামক অণুকবিতা অনুপম, মাত্র দুটি উদাহরণ দিচ্ছি :

“মোটা চায় তম্বীকে, মুটি চায় স্থুঁটকো ;
আইনত হয় হোক, নয় হোক উটকো।
ভাষার কি খেল দেখ—দু'জনকে ধরিয়া
বেঁধে দিল একসাথে 'মোটামুটি' করিয়া !”
“যাচিয়া মিলেছে মান, কাঁদিয়া সোহাগ;
অহিংসার মন্ত্র শুনে অনুতপ্ত বাঘ

এই দৃশ্য কোনখানে যায় নাই দেখা ;
এসত্য মানে না যারা জেনো তারা ন্যাকা !"

এ ধরনের কবিতাকে 'অর্থহীন পদ্য' আখ্যা দেওয়া হয়, সুতরাং সর্বত্র গূঢ়তর অর্থের সন্ধান করা উচিত নয়, যদিও বনফুলের ছররাগুলিতে প্রায়ই বিতৃষ্ণার গন্ধক লুকিয়ে আছে।—অল্পদিন পূর্বে প্রকাশিত 'চূড়ামণি রসার্ণব' চম্পূকাব্যে বনফুলের নিজের আঁকা কার্টুন সহ 'টুপকী' নামে সুন্দর রঙ্গব্যঙ্গের কবিতা আছে ; একটি নমুনা উপহার দিচ্ছি ঃ

"তেলের সঙ্গে জলও মজবে গঁদ চাই,
ধনে প্রাণে মজতে হলে মদ চাই।"

'বনফুলের ব্যঙ্গকবিতা' নামে পৃথক পুস্তকও আছে, যাতে শতাধিক কবিতা স্থান পেয়েছে। উজ্জ্বল তরল কৌতুক ও নিষ্করুণ শাণিত ব্যঙ্গের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে এই পুস্তকে—বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও ছন্দের প্রাণমাতানো ঝঙ্কার যার বৈশিষ্ট্য। —'ভাদুড়ী' কবিতাটি যুগপৎ মধুর বিধুরাত্মক ; বক্তা ঠিকাদারের ব্যবসায়-বুদ্ধির সঙ্গে কবি-কল্পনার মিলন খুবই উপাদেয় ঃ

"হয়ে যায় যদি কল্পনা মম
সাঁঝে সোনালি সাগরের সম,
খুলে দিতে পারি মনের তরণী,
তুলে দিতে পারি পাল।"

দাম্পত্য-বাণিজ্যের মূলধনের যখন ভরাডুবি হলো, নিত্যসঙ্গী সমঝদার তরুণ প্রতিবেশী ভাদুড়ী চুপিচুপি পিটটান দিলো ; পাঠকের তখন মুখে হাসি চোখে জল—ফুরনের বিড়ম্বনাতে। 'ট্রাজিডি বৃক্ষের আর একটি ফল' কৌতুকরসের মনোরম কবিতা ; ছন্দের বেলোয়ারি আওয়াজও শ্রুতিসুভগ। 'ব্রহ্মার বিধানে'ও অনুরূপ, তবে তাতে ব্যঙ্গের ঝাঁজও আছে ; স্বাভাববিরুদ্ধ দক্ষতালাভের জন্য ব্যাকুল হাতী, গন্ডার, কোকিলও মাকড়শার প্রার্থনা শুনে চতুর্মুখ বিধাতার বিস্ময়ে বাক্যস্ফূর্তি হলো না ঃ

"কিছুক্ষণ পরে পুন কন —
'তা হইলে ত্যাগ কর বন,
বাঙালী হইয়া কর জনম গ্রহণ।
কবি সে ডাক্তারি করে। ডাক্তার দোকানী।
দোকানী সেতার সাধে,
সেতারী লাঙল কাঁধে কৃষকের লয়েছে ভূমিকা,
প্রেমিকা সে হয়েছে লেখিকা।
তাহাদের জীবনে প্রচুর একসাথে চাষ হয় জুঁই ও কচুর !"

কবি বনফুল এখানে নিজেকেও কি উপহাস করছেন ? তিনি স্বয়ং একসাথে কীটাণু, কুসুম ও কবিতার 'কালচার' করেছেন। বস্তুত, প্রকৃত রসিক ব্যক্তি আপনাকেও উপহাস করতে জানেন। বার্নার্ড শ তো ডিগবাজি খেয়ে সাহিত্য-আসরে অবতীর্ণ হয়ে কালক্রমে খ্যাতির শিখরে আরোহণ করেছিলেন। 'বিবাহের সাথী' কবিতার অন্তিম ছন্দপতন প'ড়ে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায়। চাঁদনি রাতে পাইপ বেয়ে ঘরে ঢুকে রক্তাক্তকলেবর যদু সুর পেলেন প্রেমিকার বদলে

তার বিরহী পতিকে। কিন্তু পতিটি রসিক, তাই তিনি কলির কেষ্টকে সাদর আহ্বান জানালেন ঃ

"নানা কাজে আজ, ভাই, ঘুরে যাওয়া ঘটে নাই,
ক্ষতি নাই– এসো, দোঁহে হই আজ মশগুল।
এসো, ভাই, খুলে প্রাণ দুজনেই গাই গান;
আমি গাই নিধুবাবু; তুমি গাও নজরুল !"

'জনপ্রিয় জনার্দন'-এর বিড়ম্বনাও হাস্যকর ; আর 'মানে; গল্পই' কবিতার গোড়াতেই আছে উপমা বনফুলস্য ঃ

দাম্পত্য জীবন মম আঁটা-সাঁটা গেঞ্জি সম;
যদিও টাইট্‌ভাবে ধরেছিল আ-কোমর গলা;
চঞ্চলা হয়নি মোর প্রীতি অচঞ্চলা।"

'প্রণয়-মিতি', 'সমস্যা ও সমাধান'; 'পলিটিক্যাল প্রেম', 'অস্মিন দেশে' ইত্যাদিও চমৎকার কৌতুক রসের কবিতা। 'বিদগ্ধ' থেকে একটি স্তবক উপহার দিচ্ছি ঃ

ক্রমশ বুঝিতে হল মিথ্যা মায়া প্রেম জামা জুতা;
পিওনের ঘনঘন আনাগোনা থেমে গেল সব ;
চতুর্দিক্ হতে লভি বহুবিধ উপদেশ-গুঁতো
নোট-ভেলা' পরে চড়ি পারাইনু পরীক্ষা-অর্ণব !"

তবে মোক্ষম ব্যঙ্গের চাবুক 'শালা' কবিতা; যাতে গৃহিণীর ভ্রাতা স্বভাব-শালা থেকে বনফুলের বিশ্বশালারূপ-দর্শন রসোত্তীর্ণভাবে প্রকাশিত হয়েছে ঃ

অপরিচয়ের মাঝে থাক তুমি অ-শ্যালক বেশে,
ঘনিষ্ঠ হলেই তব শালা-মূর্তি বাহিরায় এসে ;
আত্ম-বন্ধু- পরিজন কাছে গিয়ে দেখি, হায় শেষে
শালা—সব শালা !
দিন যায় ক্রমে দেখি শালা-সাগরেতে এসে মেশে
দুনিয়ার যত নদীনালা—
হে শ্যালক, হে অনন্ত শালা !!"

ভণ্ডতার মুখোশ বঙ্গদেশের সর্বত্র দেখতে পেয়ে বিদগ্ধ বনফুল আত্মবিস্মৃত হয়ে ঈশ্বর গুপ্তের ভাষায় প্রবঞ্চকদের তিরস্কার করেছেন। উন্নাসিক রুচিমান্ যদি কবিকে নিন্দা করেন, তিনি হয়তো বলবেন—'ভিন্নরুচিহি' লোকঃ' ! আর পুঁথি বাড়াবোনা, তবে বারোটি লঘু রসের কবিতার গুচ্ছ 'ছোট ছোট' থেকে দু'একটি নমুনা না দিলেই নয় ঃ

"যতদূর বুঝি আমি—চুন আর নুন
যাবতীয় প্রাণীদের করিতেছে খুন।
ওদের প্রচার বন্ধ একেবারে হোক—
বক্তৃতায় বলিলেন মহামতি জোঁক।"

"চোখটা খারাপ শুনি লভিনু সন্তোষ,
তাহলে ও কিছু নয়, চক্ষুরই দোষ।
চশমা কিনিয়া কিন্তু করিলাম ভুল,
সত্যই পাকিয়াছে গৃহিণীর চুল।"

ব্যঙ্গকবিতা পর্যালোচনার পর একথা বলতে চাই যে কোনো বাঙালী কবিই ড্রাইডেন, পোপ বা বায়রনের মতো উচ্চস্তরের সুদীর্ঘ ব্যঙ্গকবিতা লিখতে পারেননি, কারণ আক্রোশনিষ্ক্রান্ত মর্মঘাতী ছুরিকার তীক্ষ্ণোজ্জ্বল সুন্দর ধার তাঁদের মধ্যে মেলেনা। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় হয়তো পারতেন, কিন্তু তিনি দীর্ঘ ব্যঙ্গকবিতা লেখেন নি।

স্বরসপ্তকের পঞ্চম স্বর 'নানা রঙের কবিতা'। স্বভাবতই এতে নানা রসের কবিতা আছে—'ফানুস ও ধ্রুবনক্ষত্র' থেকে শুরু করে 'নোঙর, তুমি কখন হবে কানা' পর্যন্ত। অনেকগুলি কবিতা বিবাহ উপলক্ষে রচিত, কিন্তু ফরমায়েসি হলেও অধিকাংশই রসোত্তীর্ণ হয়েছে অনুভূতির আন্তরিকতার জন্য। তবে কিছু কিছু কবিতা অন্য স্বরেও যেতে পারতো। 'সরষে ফুল' কবিতাটির ব্যঙ্গ সুস্পষ্ট—তা'র ছন্দ, ভাব ও রূপকল্প অনবদ্য ; এটি আধুনিক কবিতাও বটে। খানিকটা উদ্ধৃত করছি ঃ

"এইবার সরসে ফুলের মুখে হাসি ফুটল—
ব্যঙ্গের হাসি ;
বলল—জমির মালিক তুমি,
আমাকে দেখতে আসনি।
আমার গর্ভের মধ্যে যে কৃষ্ণ ভ্রূণটা বাড়ছে—
যাকে পিষে একদিন তেল বার করবে তুমি—
তারই খবর নিতে এসেছ।
আমি তোমার ঐশ্বর্যের বাহিকা,
তাই আমার সোনা-পান্নায় মুখর তুমি।
আসলে আমি তোমার কেউ নই।"

কিন্তু সর্ষেফুলের কথাই যে ঠিক আমরা তা মানতে রাজি নই। সর্ষেক্ষেতের মালিকেরও কবি হতে বাধা নেই এবং তাহলে ফুলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়া মোটেই অবিশ্বাস্য নয়। অহমিকার জন্য সর্ষেফুল বুঝতে পারেনি যে তা'র শস্যকণার এতো দাম নয় যে তার জন্য তার ফুলকে সোনা-পান্নার জ্যোতিতে মন্ডিত ব'লে ভাবতে হবে। কবিতাটির মুখবন্ধই কবিমানসের পরিচয় বহন করছে ঃ

"দিগন্তবিস্তৃত সোনার স্বপ্ন যেন।
রং-সুরের সারঙে প্রসন্ন ভৈরবী যেন বাজছে
সকালের শিশিরভেজা রোদে।"

'আত্মপরিচয়' কবিতাটিও মনোরম ঃ

"আছে কিনা জানিনা তো আমার স্বতন্ত্র পরিচয়,
অসংখ্যের পরিচয়ে আমার আমিরে দেখি আজ ;
সকলের দুঃখ-সুখ, স্নেহদ্বেষ, আনন্দ বিস্ময়
কভু মোরে করে ভিক্ষু, কখনো সাজায় মহারাজ !"

বনফুল শেষ জীবনে লেখা আত্মজীবনীর নাম দিয়েছেন 'পশ্চাৎপট'—ঠিক এই কারণেই।

তা' পাঠ করলে সংশয় থাকেনা যে হৃদয়বত্তার জন্য তিনি ভিক্ষুন'ন,—মহারাজ।—'মিলনবার্তা' কবিতাটিও রসোত্তীর্ণ। সামান্য অংশ উদ্ধৃত করছি :

তুমি যখন এসেছিলে,
ঘর শূন্য ছিল,
আমি ছিলাম না।
আমি তোমাকে খুঁজতেই বেরিয়েছিলাম
পথে পথে।
ফিরে এসে দেখি তুমি নেই,
তোমার সুরভিতে ঘর পূর্ণ।"

এটি প্রেমের কবিতা অংশে স্থান পেতে পারতো। এতে 'অমরু-শতক'-এর একটি শ্লোকের সূক্ষ্ম অনুরণন আছে, কিন্তু আমি যতদূর জানি—বনফুল (অন্তত তখনো) অমরুশতক পড়েননি। 'আসা' কবিতাটিও মনোজ্ঞ এবং এটিও প্রেমের কবিতা। 'সমালোচনার উত্তরে' ব্যঙ্গরসের কবিতা, রঙ্গরসেরও বটে ; খানিকটা উপহার দিচ্ছি :

"ওহে সুরেশ,
খোঁচা দিয়ে সমালোচনাটা লিখেছ তো বেশ !
সমালোচনা-বিদ্যাতে বাঙালী পরিপক্ব,
পিটতে পায় যদি নিন্দার ঢক্ক
আর কিছু চায় না।
ওরা মানুষই, নয় হায়না
কিংবা বাঘ;
কিন্তু পরের উপর ওদের সর্বদা রাগ।
রেগে নিজেরই গা কামড়ায়,
ঘা হয়ে যায় চামড়ায়।"

কবিরা স্পর্শকাতর। শুধু বনফুল কেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অবধি বিরূপ সমালোচনায় ক্ষুব্ধ হতেন। তবে বার্নার্ড শ বলেছেন—যারা লিখতে পারে লেখে; যারা পারে না তারা সমালোচনা করে। বলা বাহুল্য; শ বিরুদ্ধ সমালোচনার কথা ভেবেছেন। 'আত্মকথা' কবিতায় ডাঃ বলাইচাঁদের নিজের কথা বলা হয়েছে পরিহাসের সুরে :

"মানব-সমাজে নহি কর্তা বা কারক,
বৃহৎ ব্যাপারে কোন বাহক ধারক
হইতে পারিনি ; আছি সামান্য হইয়া;
রোগীর তদ্বির করি দক্ষিণা লইয়া।...
শার্ট প্যান্ট পরিধানে, গলে স্টেথো-হার,
আমি, ভাই, জেনারেল প্র্যাক্টিশনার।
বুঝিও আমার কথা—এইটুকু দাবি—
তোমাদেরই হাতে মোর সাফল্যের চাবি !"

ডাক্তার বা লেখক হিসেবে বনফুলের সাফল্যের চাবি নিজের হাতেই ছিল ; বিনয়ের সঙ্গে পরিহাস-বিজল্পিত কবিতাটিতে ঝলমল করছে।

নাতি-নাতনীদের জন্ম ইত্যাদি উপলক্ষে লেখা কবিতাগুলি অবশ্য ফরমায়েসি নয়; গভীর আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস এবং—ওয়ার্ডসওয়ার্থের নিকষে—সার্থক কাব্য। ডাঃ অসীমকুমারের পুত্র সমুদ্রের জন্ম উপলক্ষে রচিত 'পৌত্র' কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি :

জানিনা তো—
কোন আকাশে কেমন করে রঙীন আলো পড়েছিল,
কোন বনেতে কার ছোঁয়াতে সবুজ পাতা নড়েছিল,
কোন আশাতে কার অধরে মধুর হাসি খেলেছিল,
কেমন করে মেঘের কোলে পেখমখানি মেলেছিল
সহস্র রং ইন্দ্রধনুর ময়ূর !"

রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা এখানে মনে পড়বে, কিন্তু বনফুলের কবিতার ওপর তার প্রভাব নেই। 'করবীর মেয়ে' কবিতার গোড়াটা এরূপ :

"নহে সে তো ক্লিওপেট্রা; নহে নুরজাহান,
কোনো আর্ট-গ্যালারিতে ও আলেখ্য পায়নি সম্মান,
পুরাণের সীতা-সতী-সাবিত্রীর সাথে
ও এখনো নামেনি তো প্রতিযোগিতাতে।...
হেরে গেছে মেনকা উর্বশী,
অপ্রস্তুত তিলোত্তমা কহিছে বিহসি—
এ বাজারে কলকে পাবনা।"

বন্ধু সজনীকান্ত দাসকে (প্রথমা দৌহিত্রী কেয়া-কন্যা ঊর্মির জন্মের পর) লেখা চিঠি 'জবাবদিহি'র খানিকটা উদ্ধৃত করছি :

"শুন হে বন্ধু, জুটেছে প্রেয়সী,
জানি এ বয়সে নহে তা শ্রেয়সী,
সকল দ্বন্দ্ব যুক্তি যে অসি
সে অসির নাহি ধার ;
তবুও যখন এসেছেন ধনী
(অতি আধুনিকা, অতি নবতনী)।
তাহারে হেরিয়া ওঠে রণরণি'
পুরানো বীণার তার।......
একদিন, ভাই; ছিল শুধু 'তিনি;'
এবার নবীনা নায়িকা না-তিনী,
অর্থাৎ, ভাই, নয় গুড় চিনি,
পড়েছি গ্লুকোজ-পাকে ;
চিঠি'র জবাব পেতে দেরি হলে,
সুতরাং, ভাই, উঠোনাক' জ্বলে,

টিকিট কাটিয়া এসো সোজা চলে
দেখে যাও নবীনাকে।"

এই কবিতার সরল সৌন্দর্য অপূর্ব, এবং এতে পারিভাষিক অর্থে শ্লেষের সুষমাও লক্ষণীয়। 'পৌত্রী রঞ্জনার জন্মদিনে'-র শুরু এইভাবে ঃ

"কোন কথাশিল্পের তুমি নব নায়িকা,
কি গান কণ্ঠে নিয়ে এলে নব গায়িকা,
কোন ধারা আনিয়াছ বহিয়া ?
আমাদের কানে কানে
আমাদের প্রাণে প্রাণে
কি কথাটি যাবে বল কহিয়া ?"

'আর একটা চিঠি (নাতনী ঊর্মিকে)' ঃ

"এই বোকা প্রজাপতি এসেছে তোমার খোঁজে
ভুল ঠিকানায় ;
ঠিক ঠিকানায় তাকে পাঠিয়ে দিলাম আজ
হারিয়ে না যায়।
কি কথা তোমার কানে বলবে ও চুপে চুপে
ও-ই সেটা জানে ;
আমরা শুনব সেটা কয়েক বছর পরে
রূপে রসে গানে।

বনফুল সেকথা শুনে যেতে পেরেছিলেন ঃ আমরাও কবিতাটি উপভোগ করি সানন্দে।
এবার উদ্ধৃত করছি লীলাময়ের 'লীলা' কবিতা সমগ্ররূপে ঃ

"দু'হাত বাড়ায়ে তোমারে ধরিতে চাই,
দিগন্তসম সরে সরে যাও চলে ;
অঞ্জলি ভরি যে বারি পাইতে চাই,
আঙুলের ফাঁকে পড়ে তাহা গলে গলে।
তোমারে যায় না ধরা,
অধরার গানে ব্যাকুল বসুন্ধরা
বরষার মেঘে বিরহের ছবি আঁকে ;
মিলনের ফাঁকে ফাঁকে
অশ্রু লুকায়ে থাকে।
জীবনের কথা হারাইয়া যায় মরণসাগর তলে,
দিগন্তসম সরে সরে যাও চলে।
সূর্য চন্দ্র তারার আলোয় তবু দেখা যায় পথ,
মনে হয় বুঝি ওই আসে তব রথ।"

এ কবিতাটি যেন একটি নিটোল অশ্রুমুক্তো—বনফুলের পাপড়িতে। কবির রথের আগেই লীলাবতীর রথ এসেছিল, কিন্তু তিনি কখনো লীলাহারা হননি—। 'লী' ও 'মর্জিমহল'-এর শেষ দিকটা পড়লেই তা জানা যায়। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পর বনফুলের

মুখে শুচিশুভ্র স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠেছিল এবং মরদেহ ভস্মীভূত হবার পূর্ব মুহূর্ত অবধি অম্লান ছিল ; তিনি কি অধরাকে ধরতে পেরেছিলেন ? প্যাট্‌মোর স্ত্রীর সম্বন্ধে অনেক গাদ্যিক কবিতা লিখেছিলেন, তাদের সবগুলি এই একটি কবিতার কাছেই হার মেনে যায়—এখানেই বনফুলের অসাধারণত্ব।

৮

ষষ্ঠ সুর 'শ্রদ্ধার কবিতা' স্বরসপ্তকের অন্যতম অনবদ্য অংশ। এখানে বঙ্গের তথা ভারতের কয়েকজন মনীষীর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হয়েছে রসোত্তীর্ণ কবিতাসম্ভারে। প্রথমেই রয়েছে 'বুদ্ধদেবকে' কবিতা, যা ভাবে ও ভাষায় অপূর্ব। দশটি স্তবকের মধ্যে প্রথম ও শেষ স্তবকদ্বয় উদ্ধৃত করছি :

"বৈশাখের পূর্ণিমায় ভেসে যায় দিগ্‌ দিগন্তর ;
হে বুদ্ধ, হে পরিশুদ্ধ, হে দেবতা মহাযুগন্ধর !
তোমার শাশ্বত বাণী চিত্তে আজি জাগে নিরন্তর—
সে বাণী সরল বাণী—ভদ্র হও, ভদ্র হও শুধু।"......
"তবু ভদ্র হই নাই : এখনও আমরা দলে দলে
রক্তে ও কর্দমে পিষ্ট রৌরবের মুদ্গরে মুষলে,
হও নি অধীর তুমি ; বাণী তব সেই কথা বলে—
ভদ্র হও, ভদ্র হও, ভদ্র হও, ভদ্র হও শুধু।"

বনফুল গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্মের মর্মবাণী উপলব্ধি করেছেন। বুদ্ধ পরলোক ও ঈশ্বরের কথা বলেন নি ; ইহলোকে সৎ জীবন যাপনের উপদেশ দিয়েছেন পঞ্চশীলের নীতি অনুযায়ী এবং বলেছেন—নৈতিক জীবনই ধর্মজীবন। এরূপ জীবনের সার কথা—ভদ্র হও এবং প্রত্যেকে হও আপন গুরু ; "আত্মদীপো ভব"। কিন্তু আমরা ভদ্র হইনি ; আত্মদীপ না হয়ে আলেয়ার পেছনে ছুটেছি, এমন কি বুদ্ধকেই ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অবতার করেছি। আমার মতে—বৌদ্ধধর্মের দিগ্বিজয় বুদ্ধের নিজের পরাজয় সূচিত করেছে, কারণ দিগ্বিজয়ী মহাযানবাদ ঈশ্বর ও দেবদেবীর পূজা প্রবর্তন করেছে এবং অর্থক্রিয়াকারী আত্মনির্বাণের পরিবর্তে অসম্ভব বিশ্বনির্বাণকে লক্ষ্য ভেবে বিমূঢ় হয়েছে। এদেশের ধর্মকঞ্চুকদের আচার-অনুষ্ঠানের কথা না তোলাই ভালো, তবে বনফুল নিজেই বলেছেন ও ইঙ্গিত করেছেন—আমরা হিংসায় প্রমত্ত হয়ে কুসংস্কারের পঙ্কে নিমগ্ন আছি এবং জীয়ন্তে নরকবাস করছি।—'তুলসী-প্রণাম' কবিতায় বনফুল "ভক্তির ভাগীরথী মহাকবি" তুলসীদাসের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন সুললিত ভাষায়। 'গান্ধিজির প্রতি' কবিতায় মহাত্মার অভয়-বাণী শুনিয়েছেন ; শুধু গোড়ার দিকটা উদ্ধৃত করছি :

"তোমার ছবির পানে চেয়ে চেয়ে ভাবি—
চলে গেছ তুমি, বন্ধু। কিন্তু তব দাবি
শেষ হয় নাই যেন ; করুণ নয়নে
তাহা যেন কথা কয় নীরব বচনে—
মৌন আকুতিতে
অন্তরের মর্মানুভূতিতে।......

নীরবে আমার পানে চেয়ে চেয়ে যেন
বলিতেছ, 'চল, আর কেন ?"

সহসা ঝড় এসে ছবিটা ফেলে দিলো, ছবির কাচ ভেঙে গেল; কিন্তু ছবির মধুর হাসি অটুট রইলো ; মৌন দৃষ্টি বললো—"ঝড় থেমে যাবে।",

বস্তুত, গৌতমভক্ত গান্ধিও অহিংসা ও শান্তির ললিত বাণী শুনিয়েছেন। বনফুল 'জয় জয় জয়' কবিতায় জওয়াহরলাল নেহরুর মৃত্যুঞ্জয়ী কীর্তির, জয়গান করেছেন। 'লালবাহাদুর শাস্ত্রী' শাস্ত্রীজির প্রয়াণকালে রচিত মঞ্জুল কবিতা ; একটি অংশ উদ্ধৃত করছি ঃ

"তোমাকে দেখিনি কখনও,
দেখেছি তোমার ছবি।
ভগবানের ছবির মতো
সে ছবিও অমর হয়ে রইল মনে—
আত্মবিশ্বাসে, ত্যাগে, শক্তিতে।
প্রবলের কণ্ঠে অহিংসার সার্থক ঘোষণায়.
মূর্তিমতী গীতার বাণীতে,
উপনিষদের দ্যোতনায়,
ভারতের শাশ্বত সভ্যতার পটভূমিকায়।"

বনফুলের অনেক বন্ধু ছিলেন ; তাঁদের মৃত্যু উপলক্ষে তিনি লিখেছেন মর্মস্পর্শী কবিতা—'বন্ধুবর নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে,' 'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়' ও 'ইন্দ্রধনু [সজনীর মৃত্যুসংবাদে]'। সজনীকান্ত বনফুলের অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন ; তাঁকে উদ্দেশ ক'রে তিনি কয়েকটি সুন্দর কবিতা লিখেছেন। 'ইন্দ্রধনু' ছাড়াও আছে 'সজনীকান্তের উদ্দেশে', 'সজনীর উদ্দেশে অভিনন্দন,' 'মেঘমল্লার,' 'সজনী' ইত্যাদি। 'সজনী,' 'ইন্দ্রধনু' ও 'সজনীকান্তের উদ্দেশে' কবিতাত্রয়ে শোনা যায় বনফুলের বুকফাটা আর্তনাদ—রসোত্তীর্ণ শোকগাথা। 'ইন্দ্রধনু' থেকে কয়েকটি পংক্তি পরিবেশন করছি ঃ

"সুইচের গোলমালে
তোমার কেনা সে বিজলী-বাতিও
হঠাৎ নিবিয়া গেল।
অন্ধকারেতে ভরে গেল সারা ঘর।
তারপর দেখি একি বিস্ময়—
ভেদ করি 'সেই অন্ধ তমিস্রারে
জানালার ফাঁক দিয়ে
প্রবেশ করেছে সূর্যকিরণ রেখা
স্বর্ণ-শায়ক সম।
সহসা চিনিনু তারে,
সহসা বুঝিনু ফিরিয়া এসেছ তুমি,
বন্ধু এসেছে বন্ধু-সম্ভাষণে।
চোখের জলেতে সে আলোকরেখা
রচিল ইন্দ্রধনু।"

মিল্টনের শোকগাথার পাণ্ডিত্যবিলাস বা টেনিসনের শোকগাথার প্রাকৃতদর্শন এসব কবিতায় নেই ; আছে গভীর শোকের প্রকাশ করুণ রসে নিষিক্ত রূপকল্পে ও বুকের সরল কথায়,— মুখের ভাষায় যার প্রস্ফুট বর্ণনা নেই অথচ ব্যঞ্জনার দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল। অবশ্য গাথাগুলির সর্বাঙ্গীণ তুলনা আমার উদ্দেশ্য নয়। 'সজনীকান্ত দাসের পঞ্চাশতম বার্ষিক জন্মদিনে' রচিত 'মেঘমল্লার' অনবদ্য কবিতা ; অখণ্ড কবিতাটি উদ্ধৃত করা দরকার। কিন্তু তা সুদীর্ঘ, তাই পাঠকদের তার রস আস্বাদনে বঞ্চিত করতে হলো। —তাছাড়াও উপাদেয় কবিতা আছে কবিশেখর কালিদাস রায়, পরশুরাম, নন্দলাল বসু, প্রমথনাথ বিশী, বিধানচন্দ্র রায়, কালীকিঙ্কর সরকার, আশু দে, সতীনাথ ভাদুড়ী, প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর ও কুমুদরঞ্জন মল্লিকের উদ্দেশে (—কারো তিরোধানে, কারো বা অভিনন্দনে)। 'কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের উদ্দেশে' কবিতাটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি ঃ

"আমার যাঁরা মনের মানুষ থাকেন তাঁরা দূরে দূরে,
তাঁদের সাথে আলাপ চলে রঙে রেখায় সুরে সুরে।
আসেন তাঁরা অলখ পথে
অচিন রূপে অরূপ রথে,
নিমন্ত্রণের অপেক্ষা নেই বসেন এসে হৃদয় জুড়ে।
তুমি আমার সেই আপনার গোপন মনের মোহন বঁধু,
তোমার তরেই জমিয়ে রাখি প্রেমফসলের অমল মধু।
আস তুমি ফুলের বাসে,
শিশির-ভেজা শ্যামল ঘাসে,
চাঁদনী রাতের রূপসাগরে হঠাৎ দেখি হাসছ তুমি,
পাখির গানে ডাক দিয়ে যাও চমকে দিয়ে কাননভূমি।"

লক্ষণীয় এই যে কবিতাটি কুমুদরঞ্জনের কবিতার সরল ভাষা, প্রাকৃতিক রূপকল্প ও সাবলীল ছন্দ লাভ করেছে। বস্তুত, বিষয়ের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ভাষা ও ছন্দ ব্যবহার—ব্র্যাডলি যাকে বিশুদ্ধ কাব্যের লক্ষণ বলেছেন—বনফুলের সহজাত বৈশিষ্ট্য।

ডাঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায়' বনফুলের শিক্ষক ও সাহিত্যগুরুর প্রয়াণে রচিত। ইনিই বনফুলের 'অগ্নীশ্বর' উপন্যাসের বাস্তব নায়ক—"রাজনৈতিক সামাজিক কোনও অন্যায়ের সঙ্গে কখনো যিনি রফা করেননি"। এই সনেটের শেষাংশ উদ্ধৃত করছি ঃ

"অন্ধকার
গ্রাসিল কি রবি ? না-না। নতি নিবেদন
করি' পদে, উচ্চকণ্ঠে কহি বারংবার—
নহ ব্যর্থ, পরাজিত, হে বহ্নিকমল,
তমোহন্ত্রী হে প্রদীপ্ত মশাল-বর্তিকা,
অগ্নি তব অনির্বাণ, চির-সমুজ্জ্বল,
অনবদ্য অপরূপ উর্ধ্বমুখী শিখা।
মহাপ্রস্থানের পথে বিগত অর্জুন
অস্ত্রাগারে রেখে গেছে শরপূর্ণ তূণ।"

এই তূণের শর শিষ্য বনফুল স্বয়ং ব্যবহার করেছেন, কারণ বনবিহারী নিজেও শাণিত ব্যঙ্গরচনা লিখেছিলেন একসময়ে।

স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে একাধিক শ্রদ্ধাসূচক কবিতা লিখেছেন বনফুল। একটি কবিতায় আছে বিবেকানন্দের নাম নিয়ে আমরা ব্যবসায়ে মাতি, তবু কবি আশা করেন—"স্বামীজির জ্যোতির্ময়ী প্রতিভা"

"আকাশে আনিবে নবীন প্রভাত, মানুষই হইবে জয়ী-
সত্য শিব ও সুন্দর গলে
আবার দুলিবে মালা।"

আরেকটি মুক্তক-ছন্দের কবিতায় বলেছেন ঃ

"বিবেকানন্দ কেবল একটি ব্যক্তি নন,
তিনি ভারতবর্ষের আত্মার অভিব্যক্তি—
অভিনব বিরাট প্রতিষ্ঠান তিনি।"

'সাষ্ঠাঙ্গ প্রণাম' কবিতায় বনফুল অপরিসীম শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ভগিনী নিবেদিতাকে (যদিও, আমার মতে, বাঙালীরা এখনো এই মনস্বিনী নারীকে যথোচিত ভক্তি-স্বীকৃতি দেননি)। কবিতার প্রথম স্তবকটি উদ্ধৃত করছি ঃ

"অয়ি দেবী, অয়ি মাতা, অয়ি দীপ্তা, অগ্নিস্বরূপিনী,
শঙ্কর-তপস্যা-শুদ্ধা, অয়ি মহাভৈরবীর সুর !
তোমারে বন্দনা করি, চিনি আমি তোমারে যে চিনি—
শ্যামাপদে জবা তুমি, ধূর্জটির জটায় ধুস্তুর !

নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে মনোজ্ঞ কবিতা লিখেছেন বনফুল, যার শেষ অংশটি উদ্ধৃত করছি ঃ

"যে-প্রেরণা যুগে যুগে উত্তরিবে সুদুর্গম পথ,
বীর্যবলে পার হবে অরণ্যানী সমুদ্র পর্বত,
তুমি সে প্রেরণা।
যে-বাণীর তূর্যনাদে ধিক্কৃত হইবে পাপী,
সমনস্ক হবে অন্যমনা,
তুমিই সে বাণী ;
তারই মাঝে, হে অমর, আছ তুমি আছ তুমি
আছ তুমি—জানি।"

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কোনো কবিতা এখানে নেই, কিন্তু 'রবীন্দ্রস্মৃতি' পুস্তকে ও 'অন্তরীক্ষে' নামক অপূর্ব নাটিকায় বনফুল গুরুতর্পণ করেছেন।

৯

সুরসপ্তকের সপ্তম সুর 'উপনিষদের কবিতা'; এতে ঈশ, কেন, কণ্ঠ ও মুণ্ডক উপনিষদের কাব্যানুবাদ স্থান পেয়েছে। আমার বিশ্বাস—অনুবাদ আক্ষরিক না হলেও মূলানুগ হয়েছে। কারণ কঠোপনিষদের ছান্দসিক অনুবাদ আমিও করেছি (বনফুলের অনুবাদের কথা না জেনে

এবং আকস্মিক কারণে)। আক্ষরিক অনুবাদ সাধারণত সার্থক হয় না; সুতরাং বনফুল আক্ষরিক অনুবাদের কথা না ভেবে ঠিকই করেছেন। অনুবাদ প্রায় সর্বত্রই সাবলীল হয়েছে। তবে কোথাও কোথাও আড়ষ্টতা আছে (যা' প্রায় অপরিহার্য), যথা ঃ

"সৃষ্টির আদি অগ্নির কথা কহিলেন তাঁরে যম,
অগ্নিচয়নে যত ইঁট চাই, আরও আছে যে নিয়ম।
শুনি সব কথা নচিকেতা পুন আবৃত্তি করিলেন,
তুষ্ট হইয়া যমরাজ তাঁরে আরো কহিলেন॥"

সফল অনুবাদের দু'টি উদাহরণ দিচ্ছি ঃ

"সূর্য-চন্দ্র-তারকাব্দয় নাহি সেথা আলো,
বিদ্যুৎ বা অগ্নি তাঁরে নারে প্রকাশিতে।
তিনি দীপ্যমান তাই অনুদীপ্ত সব,
সমস্তই উদ্ভাসিত তাঁহার জ্যোতিতে॥"

"শ্রেয় হতে প্রেয় ভিন্ন, অথচ উভয়ে
পুরুষে আবদ্ধকরে বহুবিধ ভাবে।
শ্রেয়োবদ্ধ হন যিনি মঙ্গল তাঁহার,
প্রেয়কামী হলে পরে পরমার্থ পাবে !"

ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা বনফুলের অনুবাদ-কাব্যকে অভিনন্দন জানাবেন—এ বিষয়ে আমার সংশয় নেই। —তবে বনফুলের শ্রেষ্ঠ কবিতার একটা সঙ্কলন নিতান্ত আবশ্যক ; তাতে তাঁর কাব্যশ্রী স্ফুটতর হবে।

১০

আমি বনফুলের কাব্যকাননের সামান্য পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি। আমার আশঙ্কা—উপন্যাস; নাটক ও বিশেষত অনুগল্পের জন্য বনফুলের যশ সমধিক ব'লে বিদ্বৎসমাজ তাঁর কবিতার প্রতি সুবিচার করেন না পরিচয়ের অভাবে। কিন্তু আমার বিশ্লেষণ পক্ষপাতহীন হয়ে থাকলে এটাই সপ্রমাণ হয় যে কবি হিসেবে বনফুল উপেক্ষণীয় ন'ন। বরং একথা বলবো—রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রানুসারী না হয়ে তিনি যে কবিপ্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন, তাতে তাঁকে নজরুল, মোহিতলাল ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের শ্রেণীতে স্থান দেওয়া চলে। এঁদের প্রত্যেকেরই আপন বৈশিষ্ট্য আছে ; তবে বনফুল পুরোপুরি রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্ত ন'ন, কারণ তিনিও সত্য-শিব-সুন্দরের উপাসক এবং ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাশীল। মনে রাখতে হবে যে—কবিদের গোষ্ঠীবিশেষে বন্দী করা অনেকটা স্বেচ্ছাচার, কারো কাব্যকৃতিকেই কোনো নীরন্ধ্র ছকের মধ্যে সীমিত করা যায় না। বনফুলের কাব্য সাধনা সার্থক হয়েছে—এটাই আমার মুখ্য বক্তব্য।

বলা বাহুল্য, সাম্প্রতিক কবিদের সঙ্গে বনফুলের তুলনা চলে না। তিনি এঁদের কারো কারো মতো পাণ্ডিত্যের বা ধার করা বাক্‌প্রতিমার সাহায্য নেননি। ইচ্ছে করেও নিজেকে দুর্বোধ্য করে তোলেননি নূতন কিছু করার জন্য, বা বোদ্‌লেয়ার, রিল্‌কে ও হোয়েলডার্লিনের শরণাপন্ন হননি রূপকল্পের চমক সৃষ্টি করতে। এটাও লক্ষণীয় যে-ওই তিনজন কবি গীতিকাব্যের পরাকাষ্ঠা দেখালেও প্রত্যেকেই কম বেশী অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন ; আত্মবিচ্ছিন্নতাবোধের জন্য তাঁদের অনেক ভাবনা ও রূপকল্প অজ্ঞেয় কুহেলীতে সমাচ্ছন্ন,

যার একটা আকর্ষণ, মাদকতা ও ব্যঞ্জনা আছে। হয়তো অধিকাংশ প্রতিভাবান্ চারুশিল্পী উন্মায়ুগ্রস্ত। কিন্তু প্রতিভা সত্ত্বেও বনফুল সুস্থ মানসের অধিকারী ছিলেন; তাঁর সমাজচেতনাও ছিল প্রবল, তাই তিনি উল্লিখিত পাশ্চাত্য কবিদের সগোত্র ন'ন। অনেক অত্যাধুনিক বাঙালী কবি অস্তিত্ববাদের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছেন, কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে প্রাধান্য দিলেও বনফুল আত্মকেন্দ্রিক অস্তিত্ববাদের নিগূঢ়তা ও বিকৃতমনস্কতাকে প্রশ্রয় দেন নি তাঁর কাব্যরাজিতে, কারণ গীতিকাব্য কবির স্বরূপ প্রকাশ করে। অবশ্য অস্তিত্ববাদীরাও সুন্দর কাব্য, উপন্যাস ও নাটক উপহার দিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের সঙ্গীত ধ্রুব পঙ্কিলতা ও নৈরাশ্যের ক্রন্দন। বনফুল গভীর হতাশার মধ্যেও আশার বাণী শুনিয়েছেন আদর্শবাদে বিশ্বাসের জন্য এবং সুরুচি তাঁকে শালীনতার গণ্ডী অতিক্রম করতে দেয়নি।

এটাও লক্ষণীয় যে—কাব্যে মনস্তাত্ত্বিক বা ধর্মীয় প্রহেলিকাবাদের আশ্রয় নিলে তা' যুক্তিবাদী সামাজিকের হৃদয়ে সাড়া জাগায়না; নবীনতাবিলাসী কবিরা সাড়ম্বরে তার জয় ঘোষণা করলেও। নিঃশেষে প্রকাশবিমুখ কবিতা—শুধু কবিতা কেন; রচনামাত্রই স্বধর্মচ্যুত হয়, কারণ ভাববিনিময় ছাড়া ভাষা তার ভাষাত্ব হারায়। নূতনত্বের একটা রহস্যময় মাদকতা আছে, কিন্তু কাব্য তো গোষ্ঠীবিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নয়—তার আবেদন হওয়া উচিত যতোটা সম্ভব সর্বজনীন; বনফুলের কাব্য এই পরীক্ষায় নিঃসংশয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। এর বেশী কিছু তা'তে থাকলে তা' বিদগ্ধ-রসিকের বাড়তি লাভ, এবং আমার ধারণা বনফুলের অনেক কবিতায় তা' আছে। আগেই বলেছি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বনফুলের কাব্যে নেই, কিন্তু ওরূপ বিশ্লেষণ কাব্যের পক্ষে আবশ্যিক নয়, বরং—অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী না হ'লে—তা' কাব্যের অখণ্ড সুরকে ব্যাহত করে। পাশ্চাত্য কবিদের মধ্যে সোফোক্লিস, ইউরিপিডিস, শেক্সপীয়ার ও ব্রাউনিঙ এবং প্রাচীন ভারতীয়দের মধ্যে ভবভূতি মানসিক দ্বন্দ্বকে কাব্যে রূপায়িত করেছেন অনবদ্য কল্পনার তুলিকায়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যে যা' দুর্লভ একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কথা বাদ দিলে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দ দাশ এবিষয়ে পথিকৃৎ; কিন্তু তাঁর কাব্যে পাশ্চাত্য কবিদের প্রভাব (—স্বকীয় প্রতিভা সত্ত্বেও) যথেষ্ট প্রস্ফুট; তাছাড়া, তিনি যে হোয়েলডার্লিন প্রমুখের খানিকটা সধর্মা তা' অস্বীকার করা চলে না। বনফুল ওপথে যেতে পারেন নি ব'লে তাঁকে দোষী করা যায় না, কারণ স্বভাবের বিরুদ্ধে গেলে তাঁর অনুভূতি কৃত্রিম হয়ে পড়তো এবং কাব্যও রসোত্তীর্ণ হতো না।

এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে বনফুলের জীবনবোধ গভীর নয় এরূপ অভিযোগ কেউ কেউ করেছেন। কিন্তু তাঁর উপন্যাস, ছোটগল্প ও নাটক আলোচনা না করে এই অভিযোগের খণ্ডন দুরূহ। বনফুল জীবনে অনেকরকম লোকের সংস্পর্শে এসেছেন ঃ দরদী চিকিৎসক হিসেবে তিনি বহু রোগীর অন্তরকাহিনী শুনেছেন, তাঁর বন্ধু ও পরিচিতের সংখ্যাও নগণ্য নয়; তাই বাঙালী ও বিহারী সমাজ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা খুবই ব্যাপক। তবে একথা অনস্বীকার্য জীবনে তিনি কোনো দারুণ সঙ্কটের সম্মুখীন হন নি—একমাত্র শেষ জীবনে প্রিয়তমা পত্নীর রোগযন্ত্রণা দেখা ও তাঁর চিরবিরহে মুহ্যমান হওয়া ছাড়া। মোটের ওপর, তিনি সুখের জীবন যাপন করেছেন; যদিও রোগী ও অন্তরঙ্গদের মৃত্যু তাঁকে কাতর করতো এবং দেশবাসীর দুর্দশায় তিনি উদ্বেগাকুল হতেন। কিন্তু ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের দায়ভাগী বলে তিনি হতাশায় বিহ্বল হতেন না; সত্য শিব সুন্দরের অন্তিম জয়ে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। কাজেই; তাঁর আবাল্য আশ্রিত জীবনদর্শন আকস্মিক সংঘাতে বিচলিত হয়নি; এক ধরনের আত্মতৃপ্তির জন্য দুঃখ তাঁর বিশ্বাসকে গভীরভাবে

নাড়া দেয়নি। প্রেমিক জীবনেও নিষিদ্ধ ফলের দ্বারা আকৃষ্ট না হওয়াতে তিনি বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেন নি। কিন্তু সাধারণ শুচিশীল হৃদয়বান্ হিন্দুর জীবনদর্শন তাঁর ছিল ; তাঁর সত্যনিষ্ঠা, সৌন্দর্যস্পৃহ আদর্শবাদ ও মানবপ্রীতিতে সংশয়ের অবকাশ নেই। তাঁর কাব্যসৃষ্টির পটভূমিকায় এরূপ দর্শন থাকাতে তিনি মনোবৃত্তিতে টেনিসনের প্রায় সগোত্র, যদিও তিনি ওই দর্শনের কাব্যরূপ দেন নি। তবে তাঁর সামগ্রিক জীবনবেদ বা জীবনপ্রত্যয় যথাযথ বিশ্লেষণ করতে হ'লে তাঁর কাব্যেতর সৃষ্টির বিশদ সমীক্ষা প্রয়োজন, এখানে যার অবকাশ নেই। কিন্তু তাঁর কাব্যদর্শন নিজস্ব না হ'লেও কাব্যের উৎস আবেগপুঞ্জ কৃত্রিম তো নয়ই, তাদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকটন অনিন্দনীয়। বহির্মুখী মাইকেল মানস বা অন্তর্মুখী জীবনানন্দ-চিত্তের ভাবনা বনফুলের কাব্যে খুঁজলে স্বাভাবিক কারণেই নিরাশ হতে হবে। তবে, শুধু এই কারণেই তাঁকে অগভীরসঞ্চারী বলা যুক্তিবিড়ম্বনা মাত্র। রসাল-তরুর শাখায় দ্রাক্ষাফল অন্বেষণ করলে নাকাল হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

উপসংহারে বলতে চাই যে কাব্যের কাব্যত্ব তা'র আধুনিকতার ওপর নির্ভর করে না, যদিও কবিকে যুগসচেতন হয়ে প্রচলিত চিন্তাধারার সঙ্গে তাল রেখে চলতে হয়। ইলিয়টের পদ্যনাটক থেকে কাব্যসুরভি উবে গেছে, অথচ তাদের ভাবরাজি ও বাগ্‌রীতি নিঃসংশয়ে আধুনিক। পক্ষান্তরে, সার্থক সমকালীন কাব্য (আপেক্ষিক অর্থে) চিরন্তনতার দাবি রাখে, যেমন বোদলেয়ারের 'পঙ্কপ্রসূন' বা পাবলো নেরুদার শ্রেষ্ঠ কবিতা। বনফুলের দৃষ্টিভঙ্গী ঐতিহ্যপ্রভাবিত হলেও অতীতমুখী ছিল না ; তিনি বর্তমানকে পর্যবেক্ষণ ক'রে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েছেন আশাভরা বুক নিয়ে, যদিও খানিকটা সসঙ্কোচে। সাময়িক সমস্যা তাঁকে উদ্ব্যস্ত করলেও উদ্‌ভ্রান্ত করেনি। বাস্তবকে তিনি কোথাও প্রায় নগ্নভাবে চিত্রিত করেছেন, আবার কোথাও বা কল্পনার অলখ মায়ায় মণ্ডিত করেছেন। স্টেড্ তাঁর 'নব কাব্যতত্ত্ব' গ্রন্থে সৃজনী শক্তির যে সামাজিক ভূমিকার কথা বলেছেন, বনফুল সে-সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিলেন এবং কাব্যরাজিতে সে দায়িত্ব পালন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। সর্বত্রই যে তাঁর কাব্য অনবদ্য বা রসোত্তীর্ণ হয়েছে—আমার তা' প্রতিপাদ্য নয়। স্বয়ং ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিপ্রতিভা অনেক বিকলাঙ্গ সন্তানের জন্ম দিয়েছে। তবু একথা অকুণ্ঠচিত্তে বলবো—বনফুলের শ্রেষ্ঠ কবিতার সঞ্চয়ন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে এবং দীর্ঘকাল বঙ্গভারতীর দেউলে সৌন্দর্যধূপের নীরাজনারূপে অনাবিল হর্ষচ্ছটা বিকিরণ করবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রদত্ত 'বনফুল স্মারক বক্তৃতা, ১৩৮৭

বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা, বীরহাম্বীর বৃত্ত

শ্রীতরুণদেব ভট্টাচার্য

প্রভু মোর শ্রীনিবাস পুরাইলা মনে আশ
তুয়া পদে কি বলিব আর।
আছিনু বিষয় কীট বড়ই লাগিল মীঠ
ঘুচাইলা রাজ অহঙ্কার ॥ —বীরহাম্বির

গ্রীষ্মের দিন। লাল পাথুরে মাটির বুকে দাবদাহ। বিহারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন নরপতিদের অধীনস্থ করে মানসিংহ শিবির পেতেছিলেন জাহানাবাদে। জাহানাবাদ এখনকার হুগলী জেলায় অবস্থিত আরামবাগ। এখান থেকে শুরু হয়েছিল উড়িষ্যার সীমান্ত। উত্তর উড়িষ্যার অধিপতি তখন আফগানশাসক কতলু খান লোহানী। তিনিও নিশ্চেষ্ট হয়ে ছিলেন না। আরামবাগ থেকে পঞ্চাশ মাইল পশ্চিমে বর্তমান রায়পুর থানার ধরপুরে বিছিয়ে নিয়েছিলেন সেনাশিবির। সেনানায়ক বাহাদুর কুরু। মানসিংহের পুত্র কুমার জগৎসিংহের অধীনে গঠিত হয়েছিল মুঘল পক্ষের অগ্রগামী বাহিনী। তারা এগিয়ে গিয়েছিল আরো। জ্যৈষ্ঠের আকাশে সূর্য প্রায় অস্তমিত। যুবক জগৎসিংহ মদের নেশায় ভরপুর। বাহাদুর কুরুর নেতৃত্বে সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এক সর্বনাশা চক্রান্ত। জগৎসিংহ বিন্দুবিসর্গও জানতেন না। বিষ্ণুপুরের রাজা তখন হাম্বির। ধাড়ীমল্লের সময়ে মল্লরাজ্য মুঘল অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিল। রাজস্বও ধার্য হয়ে গিয়েছিল। হাম্বির জগৎ সিংহকে চক্রান্তের কথা জানালেন। তিনি কানেই নিলেন না সে কথা। একদল সৈন্য নিয়ে হাম্বির কাছাকাছি আত্মগোপন করে থাকলেন।

সহসা জগৎ সিংহের শিবির আক্রান্ত হল।[১] অপ্রস্তুত মুঘলবাহিনী সামান্য প্রতিরোধের চেষ্টা করে রণে ভঙ্গ দিল। বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করলেন বিকা রাঠোর, মহেশ দাস ও নরুচরণ। রণাঙ্গনে তাদের শেষ শয্যা পাতা হল। সম্পূর্ণভাবে বিজয়ী হলেন কতলু খান। আহত জগৎসিংহকে উদ্ধার করে বিষ্ণুপুরে নিয়ে গেলেন রাজা বীরহাম্বির। খবর রটে গেল জগৎসিংহ যুদ্ধে মারা পড়েছেন। সে খবর মানসিংহের কাছে গিয়েও পৌঁছল। সভা করে মানসিংহ সেনাপতিদের মতামত জানতে চাইলেন। তারা সেলিমাবাদে গিয়ে জগৎসিংহের শোকাহত পরিবারকে সান্ত্বনা দেবার কথা বললেন। পরামর্শ মাননিংহের মনঃপুত হল না। তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু যুদ্ধাভিযানের আগেই কতলু খান মারা গেলেন। অন্তর্বিরোধ দেখা দিল আফগান সেনাপতিদের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত

---

১. আচার্য যদুনাথ সরকারের মতানুসারে আক্রমণ ঘটেছিল ২১ মে ১৫৯১ খ্রীস্টাব্দে। —History of Bengal, Vol.II, Dacca. পণ্ডিতের বিবরণ অনুসারে রাজা বীর হাম্বিরের রাজত্বকাল ১৫৯৬—১৬২২ খ্রীঃ। এই রাজত্বকাল আকবর-নামা কর্তৃক সমর্থিত হয় না। শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রাজত্বকাল অনুমান করেছেন ১৫৯১—১৬১৬ খ্রীস্টাব্দ। —বাঁকুড়ার মন্দির। তিনি ও 'ম্যালি' প্রদত্ত রাজত্বকালকে সমর্থন করেছেন।

কতলু খানের ছোট ছেলে নাসিরকে মসনদে বসালেন কতলু খানের উজীর খাজা ইশা। মুঘলের অধীনতা স্বীকার করে নিলেন আফগানেরা।[২]

জগৎসিংহকে উদ্ধার করে হাম্বির মানসিংহের নজরে পড়েছিলেন। মাঝে মধ্যে বিরতিসহ মানসিংহের বাংলায় অবস্থিতি ছিল প্রায় চোদ্দ বছর। একদিকে রাজস্থানের হিন্দু সংস্কৃতি অন্যদিকে মুঘল দরবারের আদবকায়দায় দুরস্ত ছিল মানসিংহের মনমেজাজ ও চরিত্র। রণকুশল; রাজনীতিতে সুপন্ডিত, মুঘল সেনাপতির সুদীর্ঘ অবস্থিতি হাম্বিরকে নানাদিক থেকে প্রভাবান্বিত ও উপকৃত করেছিল। আদিবাসী অধ্যুষিত ক্ষুদ্র অরণ্য রাজ্যটির জনজীবন ও নৃপতিদের ধ্যানধারণায় এই প্রভাবের ফল ছিল দীর্ঘস্থায়ী।

জগৎসিংহকে উদ্ধারের কথা আফগানেরা বিস্মৃত হননি। মানসিংহ বিহারে যেতে তারা মুঘল তত্ত্বাবধায়কের কাছ থেকে পুরীর মন্দির ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। ছুঁড়ে ফেলেছিলেন নাম মাত্র অধীনতার জোব্বাটি; বীর বিক্রমে আক্রমণ করেছিলেন হাম্বিরের রাজ্য।[৩] কতলু খানের বালকপুত্রের কাছাকাছি এমন কেউ ছিলেন না যিনি সুপরিকল্পিত কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে আফগান শক্তি পুনরায় সংগঠিত করতে পারেন। খাজা ইশা মৃত। শক্তিশালী আমীরেরা ব্যক্তিগত প্রাধান্য বিস্তারে ব্যস্ত। বিহার থেকে এসে মানসিংহ উড়িষ্যা আক্রমণ করলেন। পুরীর মন্দিরসহ কটক পর্যন্ত মুঘল শক্তির অধিগত হল। ভীষণ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল অধিকার।

যুদ্ধের বর্ণনা দিতে গিয়ে আবুল ফজল লিখেছেন

লোহার বুকে আগুন যেমন থাকে
বর্ম গায়ে সাগ্রহে সব বীর
মেঘের মত নিকষ কালো অসি
ক্রোধ আগুনে জ্বলল হুহুংকারে।[৪]

পরাক্রমশালী আফগান সেনানায়ক খাজা ওয়াইস নিহত হলেন। বন্দী হলেন সুলতান শুর। যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল সম্ভবত মেদিনীপুর জেলার কোন জায়গায়।[৫]

মানসিংহের আনুকূল্যে বীর হাম্বিরের রাজ্যের সীমা চতুর্দিকে অনেকখানি বিস্তৃত হয়েছিল। বিহার ও উড়িষ্যার জঙ্গলাকীর্ণ গড়জাত মহলের যে সব ছোট ছোট জমিদারী পাঠানদের অনুগত ছিল; মানসিংহ কর্তৃক বিজিত হবার পর তাদের কিছু কিছু মল্লরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। যেমন পঞ্চকোট রাজ্য। বেগলার সাহেব দলবলসহ প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে বেরিয়ে যখন পঞ্চকোটে এসেছিলেন, দুয়ারবন্দ ও খড়িবাড়ি তোরণের ওপর

২. উল্লিখিত বিবরণ H. Beveridge, ICS অনূদিত 'The Akbar-nama, Vol-III; 1973—অনুসারে লিখিত।

৩. মানসিংহ দ্বিতীয়বার উড়িষ্যা অভিযানের জন্য বিহার থেকে এসেছিলেন ৩ নভেম্বর ১৫৯১ খ্রীস্টাব্দে। —History of Bengal, Vol-II, Dacca. সম্ভবত এর আগেই মল্লরাজ্য আক্রান্ত হয়েছিল।

৪. The Akbarnama, Vol-III, ইংরেজী থেকে ভাষান্তর—তরুণদেব ভট্টাচার্য।

৫. বেভারিজ লিখেছেন স্থানটি ছিল Malnapur (Binapur) সুবর্ণরেখার উত্তর তীরে অবস্থিত কোন অঞ্চল।

বীরহাম্বিরের নাম লেখা লিপি তার নজরে পড়েছিল। লিপির সময়কাল ছিল ষোলশো খ্রীষ্টাব্দ। লিপির সাক্ষ্য মল্লরাজ্যের মধ্যে পঞ্চকোট রাজ্যের অন্তর্ভুক্তির দিকেই ইংগিত করে। হাম্বিরের সময়কে মল্লরাজ্যের ব্যাপ্তির যুগ বলা চলে। প্রথম রঘুনাথ সিংহের সময় পরিব্যাপ্ত মল্লরাজ্যের মধ্যে শৃঙ্খলা, শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক নজীরে মল্লরাজ্যের প্রথম হদিস পাওয়া যায় বীর হাম্বীরের আমলেই।

পরবর্তীকালে মল্লরাজ্যের সীমানা সঙ্কুচিত হয়ে এসেছিল। মল্লভূম বলতে তখন ছাতনা বাদে বাঁকুড়া থানা, ওন্দা, বিষ্ণুপুর, কোটালপুর ও ইন্দাস বোঝাত। হাম্বিরের সময় সীমানা ছিল বহু বিস্তৃত। সাঁওতাল পরগণার দামিন-ই-কোহ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল উত্তরসীমা, দক্ষিণসীমা পরিব্যাপ্ত ছিল বর্তমান মেদিনীপুর জেলার উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাংশ পর্যন্ত; পূর্বে বর্ধমানের কিছুটা অংশ; পশ্চিমে ছোটনাগপুর সন্নিবিষ্ট পাঁচেট রাজ্য।[৬]

মানসিংহের সংস্পর্শে আসা ছাড়াও, এ সময় আরো একটি ঘটনা রাজা হাম্বির ও মল্লরাজ্যের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এবং এখানকার মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন পদ্ধতি, ধর্মাচরণ ও সংস্কৃতির মূল ধারাটি নিয়ন্ত্রিত করেছিল।

কিংবদন্তী অনুসারে বীর হাম্বিরের রাজসভার জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে মূল্যবান ঐশ্বর্য চলে যাচ্ছে। অরণ্যের ভেতর দিয়ে পথ বা ঘাটগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থাকত ঘাটোয়ালদের ওপর। তারা রাজার অধীনস্থ। নিয়মানুসারে যাত্রিকদের গমনাগমনের সংবাদ ঘাটোয়ালদের গোচরে আনা ছিল তৎকালীন প্রথা। সম্ভবত বৈষ্ণব আচার্যেরা অজ্ঞাতসারে প্রথাটি লঙ্ঘন করেছিলেন বা পথ ভুলে মল্লরাজ্যের সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন। হাম্বিরের নির্দেশে তাঁদের ঐশ্বর্য ভাণ্ডার লুণ্ঠিত হয়েছিল। দুই গাড়ী বোঝাই লুণ্ঠিত সম্পদ যখন রাজার কাছে আনা হল; পেটিকা খুলতেই অনুতপ্ত হলেন হাম্বির। পেটিকাগুলিতে থরে থরে সাজান ছিল হাতে লেখা বৈষ্ণব পুথির সম্ভার। তিনি সেগুলি প্রকৃত স্বত্বাধিকারীর কাছে ফিরিয়ে দিতে আদেশ দিলেন। নিযুক্ত হল গুপ্তচর।[৭]

যে তিনজন আচার্যের অধীনে পুঁথিগুলি বৃন্দাবন থেকে বঙ্গদেশে পাঠান হয়েছিল, তারা ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ। পুঁথি লুণ্ঠিত হতে তিনজনেরই বুক ভেঙ্গে গিয়েছিল। বৃন্দাবনে সংবাদ পাঠালেন শ্রীনিবাস[৮]। নরোত্তম ও

---

৬. Some Historical and Ethnical Aspects of the Burdwan District, 1894—W. B. Oldham ও Reports, Archaeological Survey of India, Vol. VIII,—J. D. Beglar.

৭. পুঁথি লুণ্ঠনের ঘটনা প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর ও কর্ণানন্দ—তিনটি বৈষ্ণবগ্রন্থেই বর্ণনা করা হয়েছে। ভক্তিরত্নাকর অনুসারে হাম্বির পুঁথিগুলি ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনটি গ্রন্থেই বৈষ্ণব আচার্যদের অনুসৃত ভ্রমণপথের বিবরণ পরস্পর বিরোধী।

৮. কথিত আছে পুঁথিগুলির মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত সদ্যসমাপ্ত 'চৈতন্যচরিতামৃত' পুঁথিখানিও ছিল। লুণ্ঠনের খবর পেয়ে কৃষ্ণদাস রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে দেহত্যাগ করেছিলেন। তখন তিনি বৃন্দাবনে থাকতেন। কাহিনীটি এখনও পর্যন্ত ঐতিহাসিকভাবে সমর্থিত হয়নি।

শ্যামানন্দকে নরোত্তমের জন্মভূমি সন্তোষগ্রামে চলে যেতে বললেন। নিজে ভার নিলেন পুঁথি উদ্ধারের। এবং গোপনে খোঁজখবর নিতে শুরু করলেন।

বিষ্ণুপুরের কাছে দেউলি গ্রাম। সেখানে এসে খবর পেলেন রাজা পুঁথি লুণ্ঠনের সঙ্গে যুক্ত। শ্রীকৃষ্ণবল্লভ নামে জনৈক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে নিয়ে তিনি রাজসভায় গিয়ে হাজির হলেন। মল্লভূমে বৈষ্ণবধর্ম আগে থেকে প্রচারিত ছিল। শ্রীজীব গোস্বামীর আত্মীয় মথুরেশ সার্বভৌম শ্রীনিবাসের আগে এখানে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। তাকে ঘিরে একটি ভক্তমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। তবে সে মণ্ডলের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল সীমিত। রাজসভার কিছু কিছু ব্যক্তি নতুনভাবে ঢেলে সাজানো বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কারণ শ্রীনিবাস যখন রাজসভায় উপনীত হয়েছিলেন; সভাপণ্ডিত রাজাকে 'ভ্রমরগীতা' পাঠ করে শোনাচ্ছিলেন। যে অংশের তখন পাঠ ও ব্যাখ্যা চলছিল; তা 'রাসপঞ্চাধ্যায়ী'।

শ্রীনিবাস এসে শ্রোতাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। পরে ব্যাখ্যা মনের মত না হওয়ায় নিজেই উঠে পাঠ ও ব্যাখ্যা করতে শুরু করেছিলেন। রাজাসহ সকলের দৃষ্টি তার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। আকর্ষণের ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। রাজপণ্ডিত শ্রীব্যাস চক্রবর্তী সপরিবারে সর্বপ্রথম শ্রীনিবাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। দীক্ষা নেবার পর ব্যাসাচার্য নামে তিনি পরিচিত হন। বিষ্ণুপুরের সুধীসমাজ কিছুদিনের মধ্যে একে একে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীরাম মজুমদার, গোপাল মজুমদার, কবিপতি বল্লভী কবিরাজ, বল্লভ ঠাকুর, করুণাকর দাস ও তার দুই পুত্র জানকীরাম ও প্রসাদ।

আষাঢ় মাসের তৃতীয় দিনে রাজা শ্রীনিবাস আচার্যের কাছ থেকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। সেদিন ছিল কৃষ্ণপক্ষ। দীক্ষা নেবার পর নতুনভাবে নামকরণ হয়েছিল রাজার।[৯] রাজা ছাড়াও রাজপরিবারের অনেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন। ধর্মাচরণের অধিকার শুধু রাজপুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, মহিষীরাও মনেপ্রাণে ধর্মের সহজ ও আন্তরিক রূপটি একান্তভাবে অনুশীলন করেছিলেন। হাম্বিরের অন্যতম মহিষী রানী সুলক্ষণাও বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

মুঘল আমলে পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যায় কিছুকালের জন্য রাজনৈতিক স্থিরতা ফিরে এসেছিল। পররাজ্য আক্রমণ ও নিজরাজ্য আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা অনেকাংশে দূর হয়ে গিয়েছিল। মল্লরাজাদের হাতে অবকাশ ছিল প্রচুর। সে অবকাশ তারা রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও সাংস্কৃতিক শ্রীবৃদ্ধির কল্যাণে উৎসর্গ করেছিলেন। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, সাহিত্য; সংস্কৃতচর্চা, আহার বিহার এমনকি বিলাসব্যসনের মধ্যেও নতুন রুচি ও পরিমার্জিত দৃষ্টিভঙ্গির দিকবদল সূচিত হয়েছিল। মন্দির, টেরাকোটার ঐশ্বর্য; রাস উৎসব, সঙ্গীত, আপামর জনসাধারণের মধ্যে বৈষ্ণবধর্মের গভীর ও পরিব্যাপ্ত প্রভাব নতুন দৃষ্টিভঙ্গির দিকে ইংগিত সূচিত করে। দুর্গম অরণ্যপ্রদেশে বসবাসকারী অধিবাসীরা সহসা তাদের সীমিত রাজ্যের গণ্ডী ডিঙিয়ে বাংলা তথা ভারতের বৃহত্তর জনজীবনের সঙ্গে যোগস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় বৃন্দাবনে পরিণত হয়েছিল বিষ্ণুপুর। চারপাশের গ্রামগুলি ব্রজমণ্ডলের

৯. প্রেমবিলাস অনুসারে নাম হয়েছিল হরিচরণ দাস। ভক্তিরত্নাকর অনুসারে শ্রীচৈতন্য দাস, কর্ণানন্দ অনুসারে শ্রীগোবিন্দ দাস।

অনুকরণে নতুনভাবে নামাঙ্কিত হয়েছিল। যেমন, মথুরা, অবন্তী, দ্বারকা, অযোধ্যা। সংগতি রেখে বাঁধগুলিরও নামকরণ হয়েছিল। যমুনা বাঁধ, কালিন্দী বাঁধ, শ্যাম বাঁধ, কৃষ্ণ বাঁধ ইত্যাদি। জয়ানন্দ দাস বনবিষ্ণুপুরকে 'গুপ্ত বৃন্দাবন' আখ্যা দিয়েছিলেন।[১০]

মল্লরাজ্যে বৈষ্ণবধর্মের প্রবল তরংগ আছড়ে পড়েছিল। শ্রীনিবাস আচার্য ছিলেন প্রাণপুরুষ। রাজা, রাজদরবার ও সুধীজনের মধ্যে শুধু বৈষ্ণবধর্মের প্রচারকার্য সীমাবদ্ধ ছিল না। ছড়িয়ে পড়েছিল বৃহত্তর জনসমাজের একেবারে নিচুতলা পর্যন্ত। তিনটি ধারায় সাধিত হয়েছিল প্রচার। এক রাজার সাহায্যে প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণকে দীক্ষা দান। দুই, রাজ অনুগ্রহপুষ্ট প্রভাবশালী গোষ্ঠীর অনুকরণে স্বেচ্ছায় দীক্ষা গ্রহণ। তিন, হরিনাম ও ঘরে ঘরে সংকীর্তন প্রচারের ফলে উদ্বুদ্ধ জনসাধারণের ধর্মান্তর গ্রহণ।

নবপ্রচারিত ধর্মের বিশিষ্ট উৎসব ছিল রাস। সুরুচি ও সমন্বয়ের মাধ্যমে রাস উৎসবকে রাজকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হাম্বির যে সৌধটি নির্মাণ করিয়েছিলেন, তা রাসমঞ্চ। স্থাপত্যবিদ্যার কলাকৌশল ও পুরনো অভিজ্ঞতা একপাশে রেখে সৌধটির গঠনকৌশল অভিনবভাবে বিন্যস্ত হয়েছিল। ঝামা পাথরের প্রকাণ্ড বেদী। লম্বা চওড়ায় চব্বিশ মিটার। ভেতরবার মিলিয়ে তেইশটি স্তম্ভের ওপর পিরামিড আকারের ছাদ। উঁচু দেড়মিটার। গর্ভঘর ও তার দক্ষিণে একটি ছোট ঘরকে ঘিরে তিনপ্রস্থ দেয়াল। দেয়ালগুলি খিলান যুক্ত। থামগুলি আটকোণা ও ফুলকাটা। এই অভিনব ইমারতটির জুড়ি আর কোথাও দেখা যায় না।

রাস উৎসব অনুষ্ঠিত হত কার্তিক মাসে। সেসময় বিষ্ণুপুরের সমস্ত বিগ্রহ রাসমঞ্চে আনা হত। উৎসবের সময় মঞ্চটি সাজান হত চমৎকারভাবে। মঞ্চের উপান্তে খোলা অঙ্গনে কাতারে কাতারে দর্শক এসে দাঁড়াতেন। ঐশ্বর্যে আড়ম্বরে মঞ্চটি তখন অপূর্ব শ্রী ধারণ করত। এখন শুধু কল্পনাতে উৎসব ও আড়ম্বরের কথা অনুমান করা যায়। রাস উৎসব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বহুদিন আগে। সম্প্রতি বিষ্ণুপুরের কয়েকজন সুধীজনের আগ্রহে পুরনো উৎসবটিকে পুনরায় রাসমঞ্চে চালু করা হয়েছে।[১১] রাসমঞ্চের অনুকরণে বাঁকুড়া জেলার আরো কয়েকটি জায়গায় রাসমঞ্চ ও দোলমঞ্চ নির্মিত হয়েছিল।

হাম্বিরের পরে মল্লরাজ্যের অধীশ্বর কে হয়েছিলেন সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। জনশ্রুতি অনুসারে তার মৃত্যু হয়েছিল ১৬১৬ খ্রীস্টাব্দে, বৃন্দাবনে। দীর্ঘজীবী ছিলেন তিনি। ভক্তিরত্নাকর ও কর্ণানন্দ অনুসারে হাম্বিরপুত্র ধাড়ী হাম্বির ছিলেন হাম্বিরের উত্তরাধিকারী। পণ্ডিতের বিবরণী এই তথ্য সমর্থন করে।

বিষ্ণুপুরের সবচেয়ে পুরনো দেবকুল বা দেউল মল্লেশ্বর মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ লিপিতে বীরসিংহের নাম পাওয়া যায়। শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেছিলেন বীরসিংহ বীর হাম্বিরের নামান্তর। পরবর্তীকালে আরও সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে অভিমত পরিবর্তন

১০, মদনমোহন বন্দনা—জয়কৃষ্ণ দাস।

১১. মল্লসংস্কৃতির পটভূমিকায় বিষ্ণুপুরের রাসোৎসব—শ্রীগুরুপ্রসাদ সরকার। বিষ্ণুপুর, ১৯৮০।

করেছিলেন। বীরসিংহকে তিনি বীরহাম্বিরের জ্যেষ্ঠপুত্র বলে অনুমান করেছিলেন। তিনি রঘুনাথ সিংহের অগ্রজ।[১২]

মল্লেশ্বর মন্দিরের লিপিটি নানা দিক দিয়ে কৌতূহল উদ্রেক করে। লিপিটিতে প্রথম মল্লাব্দের উল্লেখ দেখা যায়। বীরসিংহ কর্তৃক দেবকুলটি শিব পাদপদ্মে নিহিত বা সমর্পিত হয়েছিল। বীরসিংহের নামের আগে বা পরে নৃপতিসূচক বিশেষণ অনুপস্থিত। সিংহ উপাধিটিও রহস্যময়। জনশ্রুতি অনুসারে প্রথম রঘুনাথ সিংহের সময় থেকে মল্লের বদলে 'সিংহ' উপাধির প্রচলন শুরু হয়। এদিক থেকে রঘুনাথ অগ্রজের সিংহ উপাধি ধারণের যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব ধর্মের প্রবল স্রোত বয়ে যাবার পরেও কেন প্রথম উল্লেখযোগ্য দেবসৌধটি শিব পাদপদ্মে নিবেদন করা হয়েছিল, বোঝা যায় না।

মল্লেশ্বর মন্দিরের চার বছর পরে বাসুদেবপুরের মন্দিরটি তৈরী হয়েছিল। তাতে প্রতিষ্ঠালিপিটি ভাঙা। প্রতিষ্ঠাতার নাম বিলুপ্ত। মন্দিরটি শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করা হয়েছিল। কেউ কেউ অনুমান করেন সে সময় বীরসিংহ বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সবচেয়ে বিভ্রান্তিমূলক বিক্রমপুরের প্রতিষ্ঠাফলকটি। ফলকটি রাজা রঘুনাথ সিংহ কর্তৃক স্থাপিত হয়েছিল। রঘুনাথ সিংহকে ক্ষিতিপাল বীরসিংহের পত্নীর পুত্র হিসেবে শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে অনুমান করেছেন,[১৩] ঐতিহাসিকভাবে তা সমর্থিত হয় না। '...শ্রীবীরসিংহ ক্ষিতিপালযোষিতামুদা জননী। শ্রীরঘুনাথ শ্রীপতে'—উৎকীর্ণ লিপির 'যোষিতা' এবং 'মুদা; শব্দ দুটি ভিন্ন অর্থে আলোচিত হবার অপেক্ষা রাখে।[১৪] মন্দিরটি রমণী শ্রেষ্ঠা, বীরসিংহের জননী কর্তৃক সানন্দে সমর্পিত বা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এই বীরসিংহ রঘুনাথ-পুত্র বীরসিংহ হতে পারেন না। কারণ প্রতিষ্ঠালিপিটি রঘুনাথ সিংহ কর্তৃক সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। পিতা কখনই পুত্রকে 'ক্ষিতিপাল' বলে পরিচিত করান না। মল্লেশ্বর মন্দিরের লিপিতে এবং বিক্রমপুরের মন্দির লিপিতে উল্লিখিত বীরসিংহ একই ব্যক্তি। রাজপরিবারে অনেক সময় পিতৃপুরুষ ও পিতামহের নামে উত্তর পুরুষদের নাম রাখা হয়। মল্লরাজবংশেও এই ধারা অনুসৃত হয়েছিল।

ভক্তিরত্নাকর ও কর্ণানন্দ অনুসারে বীর হাম্বিরের পরে মল্লরাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন ধাড়ী হাম্বির। রাজত্ব ছিল স্বল্পকাল। তিনি শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য ছিলেন। দীক্ষা নেবার পর শ্রীজীব গোস্বামী নতুম নামকরণ করেছিলেন শ্রীগোপাল দাস। তার রচিত একটি পদেরও হদিস পাওয়া যায়।[১৫]

১২. শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঁকুড়ার মন্দির' গ্রন্থে এস. এস ও ম্যালির অভিমত সমর্থন করে স্থির করেছিলেন হাম্বিরের পরবর্তী রাজা রঘুনাথ সিংহ। তার রাজত্বকাল ১৬১৬—১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দ। পরে গেজেটিয়ার ও বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তিতে স্থির করেন বীরহাম্বিরের উত্তরাধিকারী ছিলেন বীরসিংহ, রাজত্বকাল ১৬১৬—১৬৪২ খ্রীস্টাব্দ। এই অভিমতও সন্দেহাতীত নয়।

১৩. বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি—শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৪. যোষিতা শব্দের অর্থ স্ত্রী, অন্য অর্থে রমণীশ্রেষ্ঠা। মুদা শব্দের অর্থ হর্ষ বা সানন্দে।

১৫. বাংলা পুঁথি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পুঁথি নং, ২০০।

ধাড়ী হাম্বিরের পরে সম্ভবত সুরু হয়েছিল বীরসিংহের রাজত্বকাল। তিনি বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি অনুরক্ত নাও হতে পারেন। মল্লেশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠা একদিকে যেমন তাকে শৈব বলে অনুমান করতে ইংগিত দেয়, অন্যদিকে বৈষ্ণব কবিদের লেখায় নামোল্লেখ না থাকায়, অনুমান দৃঢ়তর করে। বীরসিংহের পরে রাজা হন রঘুনাথ সিংহ। ধাড়ী হাম্বির ও রঘুনাথ সিংহ দুজনেই ছিলেন বীর হাম্বিরের পুত্র। কিন্তু বীরসিংহ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না।[১৬]

মল্লেশ্বর মন্দির লিপিতে প্রথম মল্লাব্দ ও সিংহ উপাধির উল্লেখ পাওয়া যায়। ধরাপাটের মন্দির ফলকে 'হম্বীর সিংহে'র যে উল্লেখ পাওয়া যায় তা অর্বাচীন কালের বলে মনে হয়। ফলকে লিখিত 'বিক্রমঅবদের' উল্লেখও চৈতন্যসিংহের প্রতিষ্ঠিত রাধাশ্যাম মন্দিরের আগে আর কোন মন্দিরলিপিতে পাওয়া যায় না। স্বভাবত মনে হয় ধরাপাট মন্দিরের ফলকটি চৈতন্যসিংহের সমসাময়িককালে বা পরে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল।

রাধাশ্যাম মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপিতে একই সঙ্গে মল্লাব্দ ও শকাব্দ উল্লিখিত হয়েছে।[১৭] যেহেতু শকাব্দ খুব পুরনো ও বহুল প্রচলিত, শকাব্দের সূত্র ধরে মল্লাব্দ, খ্রীস্টাব্দ, বঙ্গাব্দ ইত্যাদি অব্দগুলি গণনা করা যায়। মল্লাব্দের সঙ্গে ৬৯৪ যোগ করলে খ্রীস্টাব্দ পাওয়া যায়। অর্থাৎ ৬৯৪ খ্রীস্টাব্দে মল্লাব্দ সুরু বা কল্পিত হয়েছিল। অবশ্য মল্লাব্দ যখন চালু হয়েছিল, খ্রীস্টাব্দ সে সময় বাংলায় প্রচলিত ছিল না। শকাব্দ বা বঙ্গাব্দ ধরেই মল্লাব্দ গণনা সুরু হয়েছিল। বঙ্গাব্দ থেকে মল্লাব্দ একশো বা একশো এক বছর কম। অর্থাৎ মল্লাব্দ, একশো বঙ্গাব্দ থেকে অনুমিত হয়েছিল। শকাব্দ থেকে মল্লাব্দের ফারাক ৬১৬ বছর।

চারিদিকে প্রতাপশালী মুসলমান রাজ্যের মধ্যে ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্যটি মল্লরাজা ও বৈষ্ণব আচার্যদের কাছে গৌরবের বিষয় ছিল। নানাভাবে একে গৌরবান্বিত করে তুলতে তাদের প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। মন্দির নির্মাণ যেমন এক দিক দিয়ে এই প্রচেষ্টার ইঙ্গিতবহ, মল্লাব্দের প্রচলন সে প্রচেষ্টার অন্যরূপ।

কিংবদন্তী অনুসারে রাজপরিবারে সিংহ উপাধির প্রচলন সুরু হয়েছিল রঘুনাথ সিংহের আমল থেকে এ বিষয়ে একটি কাহিনীও চালু আছে। ও ম্যালি সাহেব সেটি গেজেটিয়ারে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। রাজস্ব বাকি পড়ায় রঘুনাথ সিংহকে বন্দী করে মুর্শিদাবাদে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে আটক থাকার সময় একদিন দেখলেন নবাবী ফৌজের ষোলজন লোক একটি ঘোড়াকে ধরে নদীতে ঘসামাজা করতে নিয়ে যাচ্ছে। দৃশ্যটি দেখে তিনি উপহাসের হাসি হেসে উঠলেন। কথাটা নবাবের কানে গেল। বিরক্ত নবাব রঘুনাথের কাছে হাসির কারণ জানতে চাইলেন।

রঘুনাথ বললেন, একটা ঘোড়া সামলাতে ষোলজন লোক। নবাবী সৈন্যের তাকত কত।

---

১৬. চন্দ্রকোণার লালজী মন্দির ফলকে আর দুজন মল্লরাজার নাম পাওয়া যায়। একজন হোলমল্ল, অপরজন নারায়ণমল্ল। সম্ভবত বীরসিংহের পূর্বনাম ছিল হোলমল্ল। তার পুত্র নারায়ণমল্ল হয়ত অল্প কিছুদিনের জন্য মল্লভূপ হয়েছিলেন।

১৭. রাধাশ্যাম মন্দির লিপিতে উল্লিখিত হয়েছে ১০৬৪ মল্লাব্দ ও ১৬৮০ শকাব্দ। অর্থাৎ ১০৬৪ মল্লাব্দ = ১৬৮০ শকাব্দ = ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দ = ১১৬৫ বঙ্গাব্দ।

নবাব বললেন, তাহলে এস। দেখাও তোমার তাকত।

রঘুনাথ এগিয়ে গেলেন। লাগাম ধরে এক লাফে ঘোড়ার পিঠে উঠে আট দিনের পথ নয় ঘণ্টার ভেতর পাড়ি দিয়ে ফিরে এলেন। খুশী হলেন নবাব। দরবারের লোকেরা বাহবা দিল। সিংহের মত সাহসী ও শক্তিশালী রাজপুত্রকে নবাব 'সিংহ' উপাধি দান করলেন, মকুব করে দিলেন তার বকেয়া রাজস্ব। রাজ্যে ফিরে যাবারও অনুমতি দিলেন।

বলা বাহুল্য এ কাহিনী নেহাতই কিংবদন্তী। ইতিহাসের নিরিখে সমর্থিত হয় না। যে চক্রান্তের ফলে ঢাকা থেকে মুর্শিদকুলি খান মুর্শিদাবাদে বাসস্থান স্থানান্তরিত করেছিলেন তা সংঘটিত হয়েছিল ১৭০২ খ্রীস্টাব্দে। রঘুনাথ সিংহের রাজত্বকাল অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল।[১৮] ত্রুটি সংশোধন করতে কেউ কেউ অনুমান করেছেন, মুর্শিদাবাদ নয়, রঘুনাথ সিংহকে আটকে রাখা হয়েছিল রাজমহলে।[১৯] রঘুনাথ সিংহের রাজত্বকালের বিরাট অংশ জুড়ে শাহজাহানপুত্র সুজা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার ছিলেন। এবং তার অধিষ্ঠান ছিল রাজমহলে। কিন্তু সমসাময়িক ইতিহাসে এমন কোন উল্লেখ খুঁজে পাওয়া যায় না যাতে এই কিংবদন্তী সমর্থিত হতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে মানসিংহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার আগেই, বীর হাম্বির বৈষ্ণব আচার্যদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। মানসিংহ বৈষ্ণব আচার্যদের কাছে অপরিচিত ছিলেন না। বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দিরটি তিনি তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। বৈষ্ণব আচার্য ও মানসিংহের প্রভাব বীরহাম্বিরের জীবনে ও মল্লরাজ্যে যুগলস্রোত বয়ে এনেছিল। পরবর্তীকালে শ্রীনিবাস আচার্যের প্রভাব কিছুটা ক্ষীণ হয়ে এলে মল্লরাজারা রাজপুতানার রাজপরিবারের সঙ্গে তাদের বংশগত সম্বন্ধ গড়ে তুলতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সিংহ উপাধি গ্রহণের সূচনাও সেই সময় থেকে। বীরসিংহ নিজে সম্ভবত বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত ছিলেন না। ফলে রাজকীয় গৌরব তার কাছে শ্লাঘনীয় ছিল।

বীরসিংহের পরে রঘুনাথ সিংহ মল্লরাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন। নানা দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার রাজত্বকাল। টেরাকোটার সুচারু কাজে সমন্বিত বিষ্ণুপুরের অধিকাংশ মন্দির তিনি তৈরি করিয়েছিলেন। পাঁচটি মন্দিরের[২০] প্রতিষ্ঠাফলকে তার নাম পাওয়া যায়। এ ছাড়া রঘুনাথ সিংহের মহিষী ও রাজস্ব আদায়কারীও দুটি মন্দির তৈরি করিয়েছিলেন। মন্দিরের গায়ে টেরাকোটার চিত্রগুলি থেকে সমসাময়িক সমাজ ও জনজীবনের অনেক টুকিটাকি খবর জানা যায়।

মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুরে সে সময় নানাজাতের মানুষ এসে বসতি গড়ে তুলেছিলেন।

---

১৮. রঘুনাথ সিংহের রাজত্ব ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দের আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। লালজী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাফলকে সে সময় রঘুনাথপুত্র বীরসিংহকে (২য়) নৃপতি হিসেবে দেখা যায়।

১৯. বিষ্ণুপুরের অমরকাহিনী—ফকিরনারায়ণ কর্মকার।

২০. (১) শ্যামরায় (বিষ্ণুপুর) (২) যাদবনগরের মন্দির (৩) বিক্রমপুরের মন্দির (৪) জোড়বাংলা (বিষ্ণুপুর) (৫) কালাচাঁদ (বিষ্ণুপুর,—এছাড়া বীরসিংহ গ্রামের বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দিরের প্রতিষ্ঠাফলকটি ভাঙা। মোটামুটি ভাঙা অংশ থেকে জানা যায় সেটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রঘুনাথ সিংহ।

বিচিত্র তাদের চেহারা, বিচিত্র সাজ পোশাক। গায়ে লম্বা ডোরাকাটা জামা; পায়ে শুঁড়ওয়ালা জুতো, মাথায় সুঁচলো ধাঁচের জাহাঙ্গীরী তাজ। রাজপুরুষদের হাতে বাজপাখী, কোথাও মালা হাতে আলখাল্লা পরা সুফী দরবেশ। এদেরই পাশাপাশি ভারী গড়নের নারীপুরুষ। নাকে নথ, স্ফীত চিবুক, কানজোড়া দীর্ঘ নয়ন, ভক্তিবিনম্র প্রশান্ত মুখমণ্ডল। টেরাকোটা চিত্রগুলিতে এইসব বিচিত্র মানুষের মিছিল শিল্পীর অসাধারণ কুশলতায় স্থির হয়ে আছে। এ যেন রাজপুত ও মোগল চিত্রকলার সঙ্গে গুজরাট ও ত্রিপুরার চিত্ররীতির সহজ ও স্বচ্ছন্দ সংমিশ্রণ।

রঘুনাথের পরে রাজা হয়েছিলেন তার পুত্র দ্বিতীয় বীরসিংহ। রঘুনাথ যেমন মন্দিরের প্রতিষ্ঠাফলকে নিজেকে হাম্বিরপুত্র বলে পরিচিত করেছিলেন; বীরসিংহও তেমনি রঘুনাথপুত্র বলে নিজেকে উল্লেখ করেছেন। কালাচাঁদ মন্দিরটিই রঘুনাথ সিংহ কর্তৃক ফলকযুক্ত শেষ মন্দির। সময় ১৬৫৬ খ্রীস্টাব্দ। এর পরেই বীরসিংহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের হদিস পাওয়া যায়। সেটি লালজী মন্দির। প্রতিষ্ঠাকাল ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দ। অর্থাৎ বীরসিংহের রাজত্বকাল এই সময় বা এর কিছু আগে সুরু হয়েছিল।[২১]

সুজার রাজত্বকালে ভূমি বিষয়ে নতুনভাবে রাজস্ব নির্ধারিত হয়েছিল। বিষ্ণুপুর, পঞ্চকোট, চন্দ্রকোণা ও আরো কয়েকটি করদ রাজ্যের পেশকুশ স্থির হয়েছিল ৫৯, ১৪৬ টাকা। যে ভুক্তি বা সরকারের মধ্যে এই রাজ্যগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তার নাম সরকার পেশকুশ। কথিত আছে সুজা একবার বিষ্ণুপুর রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। নদীর বাঁধ কেটে তখন তার পথ অবরোধ করা হয়েছিল। ফলে তিনি ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।[২২] সরকার পেশকুশে বিষ্ণুপুর রাজ্যসহ পাঁচটি মহল বা পরগণা ছিল। দ্বিতীয় বীরসিংহের সময় থেকেই মল্লরাজ্য মুঘলদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে এসেছিল।

ফলকে নামযুক্ত বীরসিংহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পাঁচটি মন্দিরের[২৩] হদিস পাওয়া যায়। এ ছাড়া বীরসিংহের মহিষীদের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দুটি মন্দির। রঘুনাথ সিংহ রাজধানীর বাইরে সুসজ্জিত মন্দির তৈরির যে প্রচেষ্টা সুরু করেছিলেন, বীরসিংহের সময় ব্যাপকভাবে তা অনুসৃত হয়েছিল।

বীরসিংহ নিষ্ঠুর ছিলেন বলে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। লোকে বলে তিনি তার সমস্ত পুত্রদের গৃহবন্দী করে পাঁচিল তুলে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ছোট ছেলে দুর্জন সিংহ কোনক্রমে সেই নিষ্ঠুরতা থেকে রক্ষা পান। লোককথার মধ্যে কতখানি সত্য নিহিত আছে, বলা কঠিন। তবে তাঁর রাজত্বকালে জনহিতকর বিভিন্ন কাজে মল্লরাজ্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এখনও পর্যন্ত মন্দির ও বাঁধগুলি তার সাক্ষী হয়ে বিরাজ করছে।

রাঢ় অঞ্চলে জলাভাব নিত্যকালের। বিশেষ করে গ্রীষ্মে জলকষ্ট নিদারুণ আকার ধারণ করে। জলাভাবে কৃষিকর্মও বিঘ্নিত হয়। এ অভাব দূর করতে তিনি আটটি বাঁধ বা

---

২১. দ্বিতীয় বীরসিংহের রাজত্বকাল আনুমানিকভাবে ১৬৫৬—১৬৭৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অনুমিত হয়েছে।—জেলা গেজেটিয়ার, ১৯৬৮। কিন্তু এর পরেও মুনিনগর মন্দিরলিপিতে (১৬৭৮ খ্রীস্টাব্দে) মহীপতি বীরসিংহের নাম পাওয়া যায়।

২২. বাঁকুড়া পরিক্রমা—অনুকূলচন্দ্র সেন।

২৩. (১) লালজী (বিষ্ণুপুর) (২) রণিয়াড়ার মন্দির (৩) সারাকোণের মন্দির (৪) মুনিনগরের মন্দির (৫) তেজপালের মন্দির।

দীঘি খনন করিয়েছিলেন। মন্দিরস্থাপত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিও সমান গুরুত্বে তার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। বিষ্ণুপুরের বর্তমান গড়টিও তিনি তৈরি করেছিলেন বলে জনশ্রুতি। প্রশাসনের দিকেও তার দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ন। মালিয়াড়ার প্রশাসক মণিরাম অধূর্য প্রজাদের নিপীড়ন করেন শুনে সসৈন্যে সেখানে গিয়ে হাজির হন। ভয়ানক যুদ্ধে তাকে পরাজিত করেন।

মুঘল আমলে, বিশেষত জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের সময়, মাঝে মধ্যে বিঘ্নিত হলেও, উত্তর-পূর্ব ভারতে রাজনৈতিক স্থিরতা ও শান্তি ফিরে এসেছিল। শাহজাদা সুজার প্রশাসনে বাংলা ব্যবসাবাণিজ্য ও কৃষি-সম্পদে ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠেছিল। বীরহাম্বির থেকে দ্বিতীয় বীরসিংহ পর্যন্ত মল্ল-রাজাদের শাসনকাল সে সমৃদ্ধির পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিল। মল্লরাজ্যে বিত্তশালী মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠেছিল। প্রধানত তারা ছিলেন রাজ-অনুগ্রহপুষ্ট। এই অবকাশভোগী মধ্যবিত্তসমাজের বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা কম ছিল-না। তারাই মধ্যযুগে রাঢ় অঞ্চলে সাংস্কৃতিকবৃত্তের কাঠামোটি তৈরি করেছিলেন। বৃত্তের মধ্যে যেমন উচ্চবর্ণের ধ্যানধারণা প্রাধান্য পেয়েছিল অন্যদিকে তেমনি আদিবাসী ও প্রাকৃতজনের জীবনযাত্রা ও সাংস্কৃতিক মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। মল্লরাজাদের দুর্গোৎসব, রাস, ইন্দ্রোৎসব, ধর্মঠাকুরের পুজো, ঝাঁপান ইত্যাদিতে এই সমন্বয়ের প্রচেষ্টা আজও খুঁজে পাওয়া যায়।

বৈষ্ণব ধর্মের অন্তর্নিহিত দীনতা ও বিনয় আন্তরিকভাবে অনুসৃত হলেও প্রয়োজনে অস্ত্রধারণে মল্লনৃপতিরা পরাঙমুখ হতেন না। দ্বিতীয় বীরসিংহের মালিয়াড়া অভিযান ও দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের চেতুয়া-বরদা বিজয় প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় বীরসিংহের পর রাজা হয়েছিলেন পুত্র দুর্জন সিংহ। হাজার মল্লাব্দে বিষ্ণুপুরে মদন মোহনের মন্দির নির্মাণ ছাড়া, তার রাজত্বকালে উল্লেখযোগ্য আর কোন ঘটনার হদিস পাওয়া যায় না। বিষ্ণুপুরের মুরলীমোহন মন্দিরের ফলকে যদিও তার নামোল্লেখ দেখা যায়, মন্দিরটি সম্ভবত আগেই তৈরি হয়েছিল বা কিছুটা তৈরি হয়ে অসমাপ্ত অবস্থায় ছিল। বীরসিংহের অন্যতম মহিষী চূড়ামণি দেবী এটি তৈরি করিয়েছিলেন। দুর্জন সিংহ পরবর্তীকালে এটি সম্পূর্ণ করেছিলেন বা মায়ের নামে ফলকটি সন্নিবিষ্ট করেছিলেন।

দ্বিতীয় বীরসিংহের রাজত্বকালে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যাচ্ছিল। ১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর সম্রাট শাহজাহান গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে, সম্রাটের চার পুত্রের মধ্যে মসনদ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হয়। আটষট্টি বছরের শান্তিপূর্ণ জীবধারা সহসা উচ্ছিন্ন করে রণোন্মাদ সৈন্যদের ঘোড়ার ক্ষুরে বাংলার পথপ্রান্তর উত্তাল হয়ে উঠেছিল।

শাহজাহানের বড় ছেলে দারা শিকোহ ছিলেন সম্রাটের মনোনীত উত্তরাধিকারী। কিন্তু মুরাদ বক্স আহমদাবাদে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষিত করেন। ঔরঙ্গজেব সম্মুখীন হন দারার। সুজা গালভরা উপাধি নিয়ে রাজমহলে নিজেকে সম্রাট বলে অভিষিক্ত করেন। সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক কাঠামোটি অকস্মাৎ ভেঙে পড়ার মুখে এসে দাঁড়ায়। বাংলায় সুজাকে দমন করতে প্রেরিত হন শাহজাদা সুলতান। তিনি অধিনায়ক ছিলেন নামে মাত্র। প্রকৃত নেতৃত্ব ছিল মীরজুমলার হাতে। খুব কম সময়ের মধ্যেই রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল এবং ঔরঙ্গজেব ভারতের সম্রাট হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

টানাপোড়েনের ভেতর দিয়ে শেষ হয়েছিল দ্বিতীয় বীরসিংহের রাজত্বকাল এবং সুরু হয়েছিল পরবর্তী মল্লরাজা দুর্জন সিংহের শাসন।[২৪]

দুর্জন সিংহের শাসনকালে বাংলার নানাস্থানে আর এক শক্তি ক্রমশ সংঘবদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এরা ছিলেন ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়। পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, ও ইংরাজেরা। ইউরোপীয়দের মধ্যে পর্তুগীজরা এসেছিলেন সর্বপ্রথম। বাংলায় তাদের প্রথম ঘাটি ছিল চট্টগ্রামে। সেখান থেকে সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণী। পরে গুছিয়ে গাছিয়ে বসেছিলেন হুগলীতে। ওলন্দাজদের ছাউনি ছিল চুঁচুড়ায়। ফরাসীরা ঘাটি গেড়েছিলেন চন্দননগরে। ইংরেজদের কুঠি ছিল বালেশ্বর, কাশিমবাজার ও কলকাতায়।

দুর্জন সিংহের পর দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের রাজত্বকালের সুরুতে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা এক ব্যাপক বিদ্রোহের অভিঘাতে আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। প্রথম দিকে বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন চেতুয়া-বরদার জমিদার শোভা সিংহ। ১৬৯৫ সালের জুলাই-আগেস্ট মাসে তিনি তার পরগণার চারপাশে লুঠতরাজ চালিয়ে বিদ্রোহের সূত্রপাত করেন। পরে আক্রান্ত হয় বর্ধমান। বর্ধমানের জমিদার তখন কৃষ্ণরাম। বাধা দিতে গিয়ে নিহত হন। ধৃত হন তার স্ত্রী ও কন্যা। পুত্র জগৎ রায় পালিয়ে যান ঢাকায়। কৃষ্ণরামের ধনরত্ন শোভা সিংহের হস্তগত হয়।

লুণ্ঠিত ধনরত্নে সমৃদ্ধ শোভা সিংহ সৈন্যসংখ্যা বাড়িয়ে নেন। উপাধি নেন রাজা। উড়িষ্যার আফগান শাসক রহিম খান বিদ্রোহী রাজার সঙ্গে এসে যুক্ত হন। শক্তিশালী হয়ে ওঠেন বিদ্রোহীরা। ক্রমাগত বেড়ে চলে তাদের অধিকারের চৌহদ্দি। জলপথে মাল চলাচলের ওপর চৌকি বসে গঙ্গার দুই তীরে। সুতানটি থেকে মুখসুদাবাদ পর্যন্ত।

ঔরংগজেবের রাজত্বের শেষদিকে মুঘল শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সুবাদার ইব্রাহিম খান মন্থর ও আরামপ্রিয়। ফৌজদার নুরুল্লা খান পাকা ব্যবসায়ী ও সমরবিমুখ। শোভাসিংহের বিদ্রোহের সময় যুদ্ধের পোষাকও হয়ত তাকে নতুন করে তৈরি করাতে হয়েছিল। বিদ্রোহের প্রারম্ভে হুগলীর দুর্গের ভেতর নিরাপদে আশ্রয় নিয়েছিলেন। হুগলী আক্রান্ত হতে তিনি ও তার লোকলস্কর বন্দর ছেড়ে পালিয়ে যান। লুণ্ঠিত হয় বন্দর। প্রতিরোধের জন্য এগিয়ে আসেন ওলন্দাজেরা। একদিকে তারা আক্রমণ চালান অন্যদিকে বিদ্রোহীদের পালাবার জন্য পথ করে দেন।[২৫] হুগলী থেকে বর্ধমানে ফিরে গিয়ে শোভা সিংহের মৃত্যু হয়।[২৬]

---

২৪ দুর্জন সিংহের রাজত্বকাল ১৬৭৮-১৬৯৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অনুমিত। দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের রাজত্বকাল ১৬৯৪-১৭৩০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অনুমিত।—গেজেটিয়ার, ১৯৬৮।

২৫ শ্রীসুপ্রকাশ রায় এই বিদ্রোহকে 'ইংরেজ বণিক শক্তির সংগে প্রথম সশস্ত্র সংঘাত' বলে যে মন্তব্য করেছেন, ঐতিহাসিক তথ্যাবলী সে অভিমত সমর্থন করে না। দ্রষ্টব্য, ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, ২য় সং, ১৯৭২। শোভাসিংহের বিদ্রোহ সম্বন্ধে বিশদ পর্যালোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, সপ্তদশ শতাব্দীর সুবা বাংলার শেষ বিদ্রোহ ঃ নূতন মূল্যায়ণ, ১ ও ২ পর্ব।—অনিরুদ্ধ রায়। কৌশিকী শারদীয় ১৩৮৩ ও কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৮৩।

২৬ শোভাসিংহের মৃত্যু রহস্যময়। কেউ বলেন কৃষ্ণরামের কন্যার ওপর বলাৎকার করতে গিয়ে তিনি তার হাতে ছুরিকাঘাতে নিহত হন। কারও মতে উঁচু ছাদ থেকে পড়ে মারা গিয়েছিলেন।—অনিরুদ্ধ রায়, দ্রষ্টব্য ২৫।

শোভাসিংহের ভাই হিম্মৎসিংহের মধ্যে শোভাসিংহের মত নেতৃত্বের বাঁধুনি ছিল না। রহিম খান বিদ্রোহীদের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে পরিগণিত হলেন। নতুন নামকরণ হল রহিম শাহ। আরামপ্রিয় ইব্রাহিম খানকে সুবাদারী থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে ঔরঙ্গজেব পৌত্র আজিমউদ্দিনকে বাংলায় পাঠালেন। ইব্রাহিম খানের পুত্র জবরদস্ত খান বিদ্রোহীদের অনেকখানি অবদমিত করে এনেছিলেন। শেষে চন্দ্রকোণার যুদ্ধে রহিম খান সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হলেন। হামিদ খান কুরেশী তাঁর মাথা কেটে ফেললেন। সূত্রপাতের তিন বছরের মধ্যে বিদ্রোহের সম্ভাবনাপূর্ণ বহ্নি একেবারে নির্বাপিত হয়ে গেল।

নিষ্ফল পরিণতির মধ্য দিয়ে বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটলেও, অন্যদিক থেকে ফল হয়েছিল সুদূর প্রসারী। বিদেশী বণিক সম্প্রদায় পণ্য নিরাপদ ও সুরক্ষিত করার প্রচেষ্টায় সুবাদার ইব্রাহিম খানের কাছে দুর্গ তৈরির জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। মঞ্জুর হয়েছিল প্রার্থনা। চুঁচুড়ায় ওলন্দাজেরা শক্ত দেয়াল দিয়ে প্রাকার গড়ে তুললেন। ফ্রাসোয়া মাতিন চন্দননগরে ফোর্ট-দ্য-অরলিনস্ তৈরি করালেন। কলকাতার বর্তমান বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগে ইংরেজ তাদের কুঠির চতুর্দিকে পাকাপোক্ত দেয়াল তুলে পাঁচিলে কামান বসিয়ে নিলেন। সূত্রপাত হল ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের! বসবাসকারী রাজ্যে রাজশক্তির ওপর নির্ভর করার পরিবর্তে ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায় নিজেদের শক্তিতে আস্থাবান হয়ে উঠলেন।

দুর্জন সিংহের আমলেই বিষ্ণুপুরের পার্শ্ববর্তী রাজ্য গড়বেতা মল্লরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। গড়বেতার রাধামাধব মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি এই তথ্য সমর্থন করে।[২৭] বিষ্ণুপুরের রাজপদে অধিষ্ঠিত হবার আগে দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ সম্ভবত গড়বেতার রাজা ছিলেন। শোভাসিংহের বিদ্রোহের প্রথম দিকে হয়ত বিদ্রোহের প্রতি তার পরোক্ষ সমর্থন ছিল। পাশাপাশি ক্ষুদ্ররাজ্য চন্দ্রকোণার রাজা মিত্র সেন অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে এ রাজ্যও মল্লরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। দুর্জন সিংহের দ্বিতীয় পুত্র গোপাল সিংহ সম্ভবত এই রাজ্যের রাজা ছিলেন। গড়বেতার যুদ্ধে রহিম খান পরাজিত ও নিহত হলে রঘুনাথ বগড়ী আক্রমণ করছিলেন। ধনরত্ন ও দেববিগ্রহ সহ তিনি শোভাসিংহের কন্যা চন্দ্রপ্রভা ও নর্তকী লালবাঈকেও বন্দিনী করে এনেছিলেন। চন্দ্রপ্রভার সঙ্গে পরে রঘুনাথ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। লালবাঈ রক্ষিতা হিসেবে বিষ্ণুপুরে বসবাস করতে থাকেন।

লালবাঈকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে গোপাল সিংহের নেতৃত্বে রাজনৈতিক চক্রান্ত দানা বেঁধে ওঠে। রাজনৈতিক চক্রান্তে ধর্মীয় প্ররোচনা ঔরঙ্গজেবের সময়েই শক্তিশালী হাতিয়ার রূপে পরিগণিত হয়ে উঠেছিল। গোপাল সিংহ হাতিয়ারটিকে কাজে লাগিয়েছিলেন। এমন কি রঘুনাথমহিষী চন্দ্রপ্রভাও চক্রান্তের সঙ্গে বিজড়িত হয়ে পড়েছিলেন। অন্তত চক্রান্তের কথা তার অজ্ঞাত ছিল না। জনশ্রুতি, নাটক ও উপন্যাসে ঘটনাটি অতি সরলীকৃত করে পরিবেশন করা হয়। যেন বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনে পারিবারিক কলহের মতই এর চেহারা ও চরিত্র। প্রকৃতপক্ষে মল্লরাজ্য এ সময় নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না। সমগ্র বাঁকুড়া, বর্ধমানের

---

২৭ গড়বেতার রাধামাধব মন্দির তৈরি করিয়েছিলেন দুর্জন সিংহ, ৯৯২ মল্লাব্দে বা ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে। হ্যারিসনের রিপোর্টে চৈতন্য সিংহের পুত্র দুর্জন সিংহকে বগড়ীর রাজা বলে যে উল্লেখ করা হয়েছে তা ভ্রান্তিপূর্ণ। দুর্জন সিংহ বগড়ীর রাজা ছিলেন, তবে তিনি চৈতন্য সিংহের পুত্র নন।

একাংশ, গড়বেতা, চন্দ্রকোণা ও পঞ্চকোট পর্যন্ত ছিল রাজ্যের চৌহদ্দি। বৃহত্তর বঙ্গে রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন সুষ্ঠু ছিল না। হতভাগ্য বন্দীকে সামনে রেখে গোপাল সিংহ তার উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে পরিপূর্ণভাবে সফল হয়েছিলেন। আততায়ীর হাতে অতর্কিতে নিহত হয়েছিলেন রঘুনাথ সিংহ। গোপাল সিংহ নিজেকে অভিষিক্ত করেছিলেন মল্লরাজ্যের সিংহাসনে।

দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের আকস্মিক মৃত্যু মল্লরাজ্যের শক্তি ও সামর্থ্যে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল। ভেতর থেকে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল সামরিক শক্তি। ধর্মোন্মাদ গোপাল সিংহ দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়ে অবনতির পথ ত্বরান্বিত করেছিলেন। পরবর্তীকালে বাঁকুড়া জেলার জনজীবন হতশক্তি রাজাদের অধীনতায় বারবার বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছিল। বর্গীর আক্রমণ ও লুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে যে দুর্ভোগের সূচনা হয়েছিল, উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত থেকে থেকে তার ঢেউ এসে এখানকার মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ওপর আছড়ে পড়েছিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল বাংলার এই প্রাচীনতম ক্ষুদ্র রাজ্যটির স্বাতন্ত্র্য, শ্রী ও গৌরব।

বিপ্র পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল

শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপক নলিনীনাথ দাশগুপ্তের সম্পাদনায় পরশুরাম চক্রবর্তীর 'কৃষ্ণমঙ্গল' প্রকাশিত হয়েছে (১৯৫৭)। গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক মহাশয় লিখেছেন—[ভাগবতের দশম স্কন্ধের] "ঊননব্বই অধ্যায়টি দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগানুসারে সরস্বতী নদীর তীরে যজ্ঞ সম্পাদনকালে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এই তিনজনের মধ্যে কে প্রধান এই লইয়া ঋষিদের মধ্যে যে বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল, ব্রহ্মার পুত্র ভৃগু তাহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় ভাগানুসারে, দ্বারকার জনৈক ব্রাহ্মণের মৃত সন্তানগুলিকে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন পরমেষ্টিপতি পুরুষোত্তমের নিকট হইতে উদ্ধার ও পুনর্জীবিত করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়াছিলেন।······পরশুরাম তাঁহার কাব্যে দশম স্কন্ধের ঊননব্বই অধ্যায়ের প্রথম ভাগের বিবরণ প্রদান করিয়া সমগ্র একাদশ স্কন্ধ হইতে মাত্র আটটি পংক্তি মন্থন করিয়া পুথি সাঙ্গ করিয়াছেন।" (পৃঃ ৷৷৴০) তিনি আরো লিখেছেন—[দশম স্কন্ধের] "৬৬ হইতে ৭০ অধ্যায়ের প্রসঙ্গগুলি [পৌণ্ড্রকবধ ও কাশিরাজবধ, দ্বিবিদবধ, মায়াবিভূতিবর্ণন; কৃষ্ণের নিকট জরাসন্ধ-পীড়িত রাজাদের দূতের আগমন] পরশুরাম পরিত্যাগ করিয়াছেন।" (পৃঃ ৷৷৵০ ৷৷৶০) দুঃখের বিষয়, আলোচ্য কবি সম্পর্কে সম্পাদক মহাশয়ের উপরোক্ত দুটি মন্তব্যের কোনটি-ই সমর্থন করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গেই একাধিক পুথিশালায় পরশুরাম চক্রবর্তীর কৃষ্ণমঙ্গলের পুথি ঐ মন্তব্যদ্বয়ের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেয়। কলকাতা বরাহনগর পাটবাড়ীর পুথিশালায় পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গলের একখানি প্রায়-সম্পূর্ণ পুথি আছে (পুথি সংখ্যা ২২৯৫, পত্রসংখ্যা ২—১৮৪। ১৮৪ পত্রেই পুথি শেষ। লিপিকাল নেই; তবুও ব্যবহারযোগ্য ভালো পুথি)। সেখানে যদুবংশবৃদ্ধিতে কৃষ্ণের দুর্ভাবনায় দশম স্কন্ধ শেষ করে লিখিত হয়েছে—

এত দূরে সাঙ্গ হৈল দশমের কথা। একাদশ কহি শুন কৃষ্ণগুণ-গাথা। ১৭৭ক পত্র

এরপর যাদবগণের দুর্মতি, তাদের প্রতি মুনির অভিশাপ, বসুদেবকে নারদের যোগশিক্ষাদান, বৈকুণ্ঠে প্রত্যাবর্তনের জন্য কৃষ্ণকে দেবগণের অনুরোধ, কৃষ্ণের উপদেশে উদ্ধবের বদরিকাশ্রম গমন, দ্বারকায় অমঙ্গল-লক্ষণ প্রকাশ, সপরিবারে কৃষ্ণের প্রভাস গমন, যদুবংশধ্বংস, জরা ব্যাধের বাণে কৃষ্ণের তনুত্যাগ, মৃত্যুর পূর্বে সারথি দারুককে কৃষ্ণের নির্দেশ, রামকৃষ্ণ-বিয়োগে উগ্রসেন-বসুদেব-দৈবকী-রোহিণী-রুক্মিণী প্রভৃতির শোক, কারো আত্মবিসর্জন, কারো অর্জুনসহ মথুরাগমন, রামকৃষ্ণের মৃত্যুসংবাদে যুধিষ্ঠিরের বিলাপ, মথুরায় বজ্রের রাজ্যাভিষেক, হস্তিনায় পরীক্ষিৎকে সিংহাসন দান করে পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থান প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। তারপর কলিযুগধর্ম জ্ঞানভক্তি প্রভৃতির দু'এক কথা বলে উপসংহার টানা হয়েছে—

দ্বাদশ স্কন্ধ ভাগবত কহিল সংক্ষেপে। যেজন যেরূপে ভজে পায় সেইরূপে। ১৮৪ পত্র

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, নলিনীনাথ দাশগুপ্ত প্রমুখ কৃষ্ণলীলা কাব্যের সম্পাদকগণ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সংগ্রহে একখানি সম্পূর্ণ পরশুরামী কৃষ্ণমঙ্গল-পুথির উল্লেখ করেছেন। দাশগুপ্ত মহাশয় সেই পুথিখানা দেখবার সুযোগ পেলেন না কেন জানি না। পেলে তাঁর সম্পাদিত আলোচ্য গ্রন্থখানি সমৃদ্ধতর হত। বঙ্গীয় সাহিত্য

পরিষৎ পুথিশালার 'চিত্তরঞ্জন সংগ্রহে' ঐ পুথি আছে (পুথি সংখ্যা-চি-২২৯, পত্রসংখ্যা ১—২৩; ২৫—১১১, ১১৩—১৫৬। ১৫৬ পত্রেই পুথি সমাপ্ত। বাঁকুড়া 'সুকসাএরে'র পুথি। লিপিকাল ১১২৯; কি ১২২৯; সে-বিষয়ে সংশয় জাগে। ১১২৯ হলে সেটা মল্লাব্দ হওয়া অসম্ভব নয়)। দুঃখের বিষয়, কীটের আক্রমণে পুথিখানা আজ নষ্ট হতে বসেছে। সব পাতা জমাট বেঁধে গেছে, খুলতে গেলেই ছিঁড়ে যায়। অতি সাবধানে দু' একটি পাতাই দেখতে পেয়েছি। ঐ পুথির শেষাংশ উদ্ধৃত করছি—

সমুদ্রে দ্বারকাপুরী ডুবিবে এখন। চলিলা অর্জুনবীর লয়্যা সর্বজন ॥
বজ্রকে করিল রাজা মথুরায় গিয়া। সমুদ্রে দ্বারকাপুর দিল ডুবাইয়া ॥
রুক্মিণীর গৃহখণ্ড থাকিল কেবল। অতঃপর পরিপূর্ণ মথুরা মণ্ডল ॥
বজ্র রাজা হৈল অনিরুদ্ধের নন্দন। পাটে রাজা করিলেন আনি প্রজাগণ ॥
মথুরা নগরে রাজা হৈল সিংহাসনে। শিরে ছত্র ধরিলেন অর্জুন আপনে ॥
কৃষ্ণের বৈকুণ্ঠ যদি হৈল আগুসার। শুনি যুধিষ্ঠির রাজা করে হাহাকার ॥
শোক দুখে হস্তিনাতে থাকে পঞ্চভাই। কালক্রমে কৃষ্ণচন্দ্র পাইবে তথাই ॥
অতঃপর শুন শুন রাজা পরীক্ষিত। তোমারে করিল রাজা হয়্যা আনন্দিত ॥
রাজা করি তোমারে থুইল নিজ দেশে। তারপর পঞ্চভাই গেলেন স্বর্গবাসে ॥
তব পুত্র জন্মেজয় হৈল রাজ্যেশ্বর। আপনি যাইবে রাজা বৈকুণ্ঠ নগর ॥
কৃষ্ণ কথা সুধারস অমৃত কেবল এত দূরে সাঙ্গ হৈল শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥
এক চিত্তে যেইজন কর এ শ্রবণ। অনায়াসে পায় সেই গোবিন্দ চরণ ॥
আউ যশ ধর্ম বাড়ে কৃষ্ণপদে মতি। অন্তকালে হয় তার বৈকুণ্ঠে বসতি ॥
গান বিপ্র পরশুরাম ··· ···। হরি হরি বল সভে ···॥ ১৫৬ খ পত্র

আমাদের কাছেও পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গলের একখানি প্রায়-সম্পূর্ণ পুথি আছে (১—৮০ পত্র) শেষের দু'একটি পত্র ছিন্ন, তাতেও কৃষ্ণলীলার শেষ অবধি পাওয়া যায়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, পরশুরাম ভাগবতের সমগ্র কৃষ্ণচরিতই তাঁর কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। নলিনীবাবু তাঁর যে পুথিখানিকে সম্পূর্ণ বলে দাবী করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তা কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। "সমগ্র পুথি দুর্লভ" বলে 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে' অপর যে-পুথির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (এসিয়াটিক সোসাইটি পুথিসংখ্যা গ-৫৪১৭) তাতে রুক্মিণী-হরণের আরম্ভ পর্যন্তই পাওয়া যায় (দ্রষ্টব্য— ডেস্কৃপটিভ ক্যাটালগ অফ ভার্ণাকুলার ম্যানাস্কৃপ্ট, এইচ. পি. শাস্ত্রী, পৃঃ ১৮৬-৮৭।)

সম্পাদিত পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গলে সুদাম উপাখ্যানের পরেই বকাসুরবধ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ঐ কাব্যের আর আর পুথিতে সুদাম উপাখ্যানের পর যাদবগণের কুরুক্ষেত্র-গমন, নন্দ-বসুদেবের মিলন, দ্রৌপদীর নিকট কৃষ্ণমহিষীগণের স্ব স্ব বিবাহবর্ণন, বসুদেবের যজ্ঞানুষ্ঠান, দ্বিজ-শ্রুতদেব ও রাজা বহুলাশ্বের প্রতি কৃপাবান কৃষ্ণের বিদেহগমন প্রভৃতি কাহিনী পাওয়া যায়। বলরামের যমুনা আকর্ষণের পর পৌণ্ড্রক, কাশীরাজাদি-বধের কাহিনী অপরাপর পুথিতে পাওয়া যায়। বরাহনগর পাটবাড়ী পুথি থেকে পৌণ্ড্রকবধ-সম্পর্কিত একটি ত্রিপদী উদ্ধৃত করা গেল—

পৌণ্ড্রক অসুর গোকুল [সে] পুর ভুঞ্জে নিজ বাহুবলে।
কৃষ্ণবেশ যত করে অবিরত বনমালা দেয় গলে ॥

শংখ চক্র ধরে গদা পদ্ম করে শ্রীবৎস কৌস্তুভ শোভে।
নব গুঞ্জমালে চূড়া বান্ধে ভালে ভ্রমর গুঞ্জরে লোভে ॥
কৃত্রিম করিঞা এসব ধরিঞা বলে আমি যদুপতি।
আমি ভগবান আমার সমান আর কেবা আছে ক্ষিতি ॥
আমারে ছাড়িঞা পূজে কারে যাঞা ত্রিভুবনে কেহ নাই।
পাঠাইল দূতে যাহ দ্বারকাতে কহগা কৃষ্ণের ঠাঁই ॥
আমি নারায়ণ জগততারণ সে আর কিসের মাঝে।
বনমালা আদি শ্রীবৎস অবধি ছাড়ুক সকল সাজে ॥
এত বলি দূতে পাঠাইঞা ত্বরিতে আইলা দ্বারকাপুরী।
করিঞা বিস্তার কহে সমাচার শুনিঞা হাসিলা হরি ॥
শুনি সর্বলোকে বসিঞা কৌতুকে উচ্চস্বরে সভে হাসে।
এমন বচন না শুনি কখন নাহি শুনি কোন দেশে ॥
অদ্ভুত বচন শুনি নারায়ণ কহিলা দূতের তরে।
যত তার ভুর সব করি চূর পাঠাব যমের ঘরে ॥
কৃষ্ণের ভারতী শুনি দূত তথি দ্রুত গেলা তার পাশে।
করিঞা বিস্তার কহে সমাচার শুনিঞা পৌণ্ড্রক হাসে ॥
কৃষ্ণগুণ-বাণী ভক্তমুখে শুনি হেলায় তরিবে তারা।
পরশুরাম মনে ভাবে অনুক্ষণে ভক্তিপথ হইঞা হারা ॥ ১০৫ ক পত্র

নর নারায়ণ-কর্তৃক দ্বারকার ব্রাহ্মণের মৃত পুত্রগুলির উদ্ধারের কাহিনী আলোচ্য কাব্যে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত, আমাদের পুথি থেকে তার শেষাংশটুকু উদ্ধৃত করছি—

হাতে ধরি অর্জুনেরে চাপাইলা রথে। পাইবে ব্রাহ্মণপুত্র আইস মোর সাথে ॥
এত বলি কৃষ্ণচন্দ্র অর্জুনেরে লঞা। সপ্ত দ্বীপা পৃথ্বী তবে গেলেন ছাড়িঞা
তবে সিন্ধু পার হঞা দুইজন গেলা। সপ্ত গিরি পর্বত তখন এড়াইলা ॥
লোকালোক সকল ছাড়িলা গদাধরে। প্রবেশ করিল গিয়া ঘোর অন্ধকারে ॥
অন্ধকার কাটিঞা চলিলা সুদর্শনে। সেই পথে চলিলা অর্জুন নারায়ণে ॥
কোটি সূর্যের তেজ সুদর্শন ধরে। ক্ষুদ্র পিপীলিকাপ্রায় যায় অন্ধকারে ॥
সেইপথে চলিলা গোবিন্দ ধনঞ্জয়। বৈকুণ্ঠ ভুবন যাঞা দেখিল নিশ্চয় ॥
শয়নে অনন্ত তথি আছেন সুন্দরে। সহস্রেক ফণা শোভে সহস্রেক শিরে ॥
রজত কাঞ্চন তথি দেখি গিরি-আভা। শ্বেত রক্ত নীলাম্বর কিবা তার শোভা।
তার কাছে বিষ্ণু এক পরি পীতবাস। পারিষদগণ সব শোভে চারিপাশ ॥
তাহাকে অর্জুন কৃষ্ণ করি জোড় হাত। প্রণমিয়া স্তুতি কৈল অনন্ত-সাক্ষাত ॥
কহিতে লাগিল কৃষ্ণ বাক্য সুধাময়। ব্রাহ্মণের পুত্রগুলি দেহ মহাশয় ॥
অনন্ত বলেন কৃষ্ণ শুন আমি কই। ব্রাহ্মণের পুত্রগুলি লয়া যাও অই ॥
তোমাদের দুজনারে দেখিবার তরে। ব্রাহ্মণের পুত্রগুলি আন্যাছিলাম ঘরে ॥
অতঃপর শুন কৃষ্ণ আমার ভারতী। পৃথিবীর ভারক্ষয় কর শীঘ্রগতি ॥
অন্তর্ধানে খণ্ডাহ সে পৃথিবীর ভার। আমার নিকটে তুমি আইস পুনর্বার ॥
শুনিঞা অর্জুন এত করিলা প্রণাম। ব্রাহ্মণের পুত্র লঞা আইলা নিজ ধাম ॥

যত পুত্র ব্রাহ্মণের মৈল বারে বারে। সব পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র আন্যা দিল তারে॥
পুত্রদান পায়া তবে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী। আনন্দে নাহিক সীমা মনে ভাগ্য মানি॥
দেখিয়া কৃষ্ণের মায়া অর্জুন বিস্ময়। দিব্যজ্ঞানে সকল দেখিল কৃষ্ণময়॥
তবে কৃষ্ণ খণ্ডাইলা পৃথিবীর ভার। বৈকুণ্ঠ-সম্পদ হরি দৈবকীকুমার॥
ভাগবত কৃষ্ণকথা পুরাণের সার। গান বিপ্র পরশুরাম কৃষ্ণ সখা যার॥

৭৭ ক পত্র

পরশুরাম ভণিতায় শ্রীবৎস-চিন্তার পালাকে ডঃ সুকুমার সেন পরশুরাম চক্রবর্তীর কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যেরই অংশবিশেষ মনে করেছেন এবং সেই সূত্রেই কৃষ্ণমঙ্গলের রচনাকাল নির্ণয় করেছেন। ঐ কাব্যের সম্পাদক নলিনীবাবু কিন্তু ডঃ সেনের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি। পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গলের মোটামুটি-সম্পূর্ণ দুখানি পুথি আমরা দেখেছি, সে-দুখানিতে শ্রীবৎস-চিন্তার কাহিনী পাওয়া যায় নি। ('চিত্তরঞ্জন সংগ্রহে'র পুথিখানি আপাততঃ হিসাবের বাইরে রাখা গেল।) পরশুরামের শ্রীবৎস-চিন্তা পালারও দুখানি সম্পূর্ণ পুথি আমরা দেখেছি। একখানি নিজ সংগ্রহ, লিপিকাল ১১৯২ চব্বিশ পরগণা-ফলতা অঞ্চলের পুথি, অপরখানি কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের, পুথিসংখ্যা ২১৩১, লিপিকাল ১২৫১ 'মনোহরপুরে'র পুথি; সেখানে পুথির নাম 'শনিচরিত্র'। উভয় পুথিতেই পাঁচবার ভণিতা আছে; পাঁচবারই কেবল 'পরশুরাম' নামটুকু পাওয়া যায়—কবির বর্ণ বা পদবী কিছুই জানা যায় না।* লক্ষণীয় পরশুরাম রায়ের 'মাধব-সঙ্গীতে' আত্মপরিচয় অংশ ছাড়া আর কোথাও নামের সঙ্গে কবির বর্ণ বা পদবীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। কৃষ্ণমঙ্গলের পরশুরাম চক্রবর্তী দুএকবার কেবল নামটুকু ব্যবহার করলেও 'বিপ্র-পরশুরাম' বা 'দ্বিজ পরশুরাম' ব্যবহারেই তাঁর সমধিক প্রবণতা। শ্রীবৎস-চিন্তা পালার কবি পরশুরামের দেশকাল—'সন হাজার সত্তরি সাল দেশ জলেশ্বরে' (বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ ১০৪৪)। 'মাধব-সঙ্গীতে'র প্রাচীনতর পুথিটি উড়িষ্যাতে পাওয়া গিয়েছে। ঐ গ্রন্থের অতগুলি পদের মধ্যে একটিকেই-বা 'পদ উৎকল' বলে চিহ্নিত করা হল কেন? কাশীদাসী মহাভারতের (বনপর্ব) শ্রীবৎস-চিন্তা আখ্যানের সঙ্গে আলোচ্য পরশুরামের ঐ পালার প্রথমদিকে বিশেষ সাদৃশ্য নেই। মুন্শী আবদুল করিম সংগৃহীত দীন ষষ্ঠীচরণের 'শ্রীবৎস উপাখ্যানে'র খণ্ডিত পুথি থেকে কাহিনীর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। (প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১ম খণ্ড; ২য় সংখ্যা, পৃ ৬৮) শ্রীবৎস-চিন্তা কাহিনীর উৎস কোথায়? কৃষ্ণমঙ্গলের সঙ্গে এই কাহিনীর যোগসূত্রই-বা কতখানি? আমাদের মতে, বলবত্তর প্রমাণ হাতে না আসা পর্যন্ত 'শ্রীবৎস-চিন্তা' বা 'শনিচরিত্রে'র কবিকে পৃথক রাখাই ভালো।

পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গলের সম্পূর্ণতাদান করতে গেলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত গ্রন্থখানির নূতন সংস্করণ আবশ্যক। নলিনীবাবু আজ স্বর্গত, এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন বাংলা সাহিত্য-গবেষকগণের দায়িত্ব বেড়েছে। প্রকাশন কর্তৃপক্ষেরও এ-বিষয়ে দায়িত্ব আছে।

* 'পরশুরাম দ্বিজ' ভণিতায় 'শ্রীবৎস রাজা উপাখ্যানে'র দুখানি খণ্ডিত পুথি কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আছে (পুথিসংখ্যা ১২৭৭ ও ২২৭৯) বলে 'বাংলা পুথির তালিকা সমন্বয়ে' যে-সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে (পৃঃ ২৮০), তা ঠিক নয়। ঐ পুথিদ্বয়ের কোথাও 'পরশুরাম' নামের আগে বা পরে 'দ্বিজ' শব্দের উল্লেখ নেই।

পরিষদ-সংবাদ

জন্মদিবস পালন

গত ২৮ পৌষ, ১৩৮৭ (১২ জানুয়ারি, ১৯৮১) সোমবার অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সমিতির যৌথ উদ্যোগে পরিষৎ মন্দিরে স্বামী বিবেকানন্দের ১১৯তম জন্মদিন উদযাপিত হয়।

সভার প্রারম্ভে সম্পাদক শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস তাহার স্বাগত ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব বাংলাদেশের জাতীয় চেতনাকে কিভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল তাহা ব্যাখ্যা করেন।

অধ্যাপক ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী বিবেকানন্দের দর্শন বিষয়ে আলোচনা করেন। অধ্যাপক ডঃ শঙ্করী প্রসাদ বসু স্বামীজীর জীবন কথা এবং অধ্যাত্ম চেতনা বিষয়ে সারগর্ভ ভাষণ দেন। আকাশবাণী, কলিকাতা কেন্দ্রের ডিরেক্টার শ্রীকল্যাণকুমার দাশগুপ্ত স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ বিষয়ে আলোচনা করেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র। বস্তুবাদী পশ্চিমী দেশসমূহে বিবেকানন্দের চিন্তাধারার প্রয়োজনীয়তা যে গভীরভাবে অনুভূত হইতেছে তাহা তিনি তাহার ভাষণে বহু উদ্ধৃতি সহযোগে প্রমাণ করেন।

চিত্র প্রতিষ্ঠা

গত ২৭ পৌষ, ১৩৮৭ পরিষদ ভবনে ভগিনী নিবেদিতার একখানি চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চিত্রখানি প্রতিষ্ঠার জন্য দান করিয়াছেন বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সমিতি। এই সম্পর্কে উক্ত দিবসে যে অনুষ্ঠান হয় তাহাতে সভাপতিত্ব করেন ডঃ রমা চৌধুরী। এই অনুষ্ঠানেই মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের চিত্রখানিও পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্পাদক জানান যে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ মহাত্মা শিশিরকুমারের তৈলচিত্রখানি অনেক অর্থব্যয় করিয়া সংস্কার করিয়া দিয়াছেন।

আজীবন সদস্য

শ্রীমদন মোহন সাহা ৩৬১ বি রবীন্দ্রসরণী, কলিকাতা-৬ পরিষদের আজীবন সদস্য পদ গ্রহণের জন্য যে আবেদন করিয়াছিলেন ২৭ পৌষ, ১৩৮৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে তাহা গৃহীত হইয়াছে।

স্মারক বক্তৃতামালার বক্তা নির্বাচন

পরিষদে বিভিন্ন গচ্ছিত তহবিল হইতে বার্ষিক স্মারক বক্তৃতামালার বক্তা নির্বাচনের জন্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি ডঃ সুকুমার সেন, শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস, শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, ডঃ কানাইচন্দ্র পাল এবং ডঃ শিবদাস চক্রবর্তীকে লইয়া গত ২৪ আশ্বিন তারিখে যে উপসমিতি গঠন করিয়াছিলেন তাঁহাদের সুপারিশ অনুযায়ী কার্যনির্বাহক সমিতি গত ১৪ অগ্রহায়ণ তারিখে ১৩৮৭ বঙ্গাব্দের জন্য নিম্নলিখিত বক্তা নির্বাচন অনুমোদন করিয়াছেন :

(১) রামলাল হরিপ্রিয়া স্মারক বক্তৃতা—শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
(২) রামকমল সিংহ বক্তৃতা—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
(৩) বনফুল স্মারক বক্তৃতা—শ্রীউজ্জ্বলকুমার মজুমদার
(৪) রাধাগোবিন্দ নাথ স্মারক বক্তৃতা—শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী

ইহা ব্যতীত নির্মলকুমার বসু স্মারক বক্তৃতা দিবার জন্য ডঃ শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের নাম পূর্বেই অনুমোদিত হইয়াছে।

জন্ম শতবার্ষিকী পালনের প্রস্তাব

কার্যনির্বাহক সমিতি বর্তমান বর্ষে খগেন্দ্রনাথ মিত্র, রাজশেখর বসু, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমচাঁদ, সুব্রহ্মণ্য ভারতী এবং আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের জন্মশতবার্ষিকী পালনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

চিত্রশালার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান

কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি দপ্তর চিত্রশালার বিভিন্ন আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকার একটি অনুদান মঞ্জুর করিয়াছেন।

গত ২৪ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭ (ইং ১০।১২।৮০) চিত্রশালা উপসমিতির এক অধিবেশনে এই অনুদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ জানানো হয়। কেন্দ্রীয় সরকার প্রেরিত এই অনুদানের অর্থ যথাযথ ভাবে কাজে লাগাইবার জন্য বিশিষ্ট দৈনিক সংবাদপত্রে দরপত্র চাহিয়া বিজ্ঞাপন দিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের নিকটও চিত্রশালার ছবি তুলিবার জন্য কুড়ি হাজার টাকার অনুদান চাহিয়া আবেদন করা হইয়াছে।

চিত্রশালা উপসমিতির সভায় এবং পরবর্তীকালে কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় বিভিন্ন সদস্য চিত্রশালাটিকে অন্তত আংশিক সময়ের জন্যও খুলিয়া রাখার প্রস্তাব করেন। ডঃ কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত মনোমোহন গাঙ্গুলী-কৃত চিত্রশালায় রক্ষিত ভাস্কর্যগুলির প্রকাশিত বিবরণের সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশের জন্য প্রস্তাব করেন। চিত্রশালায় রক্ষিত দ্রব্যাদির তালিকা প্রণয়ন ও মুদ্রণেরও প্রয়োজনীয়তা সকলে অনুভব করেন। চিত্রশালার জন্য একজন কিউরেটর নিয়োগেরও অতি প্রয়োজন। এই পদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ চাহিয়া সরকারের নিকট আবেদন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় এই সব বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

॥ আলোচনা ॥

রামপ্রসাদ কি শুধুই আঠারো শতকের কবি ?

গত বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা (১৩৮৭) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি রামপ্রসাদ রায়ের নবাবিষ্কৃত কাব্য কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়লাম। বিশ্বনাথবাবু 'কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু'র নিম্নলিখিত রচনাকাল উদ্ধৃত করেছেন—

'রাম ভুজ মুনি চন্দ্র শক মম্বর্ন্তরে।
সিতপক্ষ মাঘে আর পঞ্চবিংশতি বাসরে॥
ভৃগুবার আর তিথি ত্রিতিয়া সোভনে।
পুর্বভাদ্রপদ তারা সিবজোগ দিনে॥'

আশ্চর্যের বিষয়, বিশ্বনাথবাবু পয়ারটির অর্থভেদ করে শকাঙ্ক বের করেন নি। আমরা এখন তাই করি :

রাম = ৩ ('পরশুধর রাম, ধনুর্ধর রাম, হলধর রাম')
ভুজ = ২ ('জাতকার্ণব' প্রভৃতি গ্রন্থ মতে)
মুনি = ৭ ('মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ')
চন্দ্র = ১ ('একশ্চন্দ্র তমোহন্তি')

অঙ্কস্য বামাগতিতে শকাঙ্ক হয় ১৭২৩, এর সঙ্গে ৭৮ যোগ করে খ্রীস্টাব্দ পাই ১৮০১-০২। অর্থাৎ রামপ্রসাদ রায় ১৮০১-০২ খ্রীষ্টাব্দে শুক্লপক্ষ মাঘ মাসের ২৫ তারিখে শুক্রবার তৃতীয়া তিথিতে তাঁর কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধুর রচনা সমাপ্ত করেন। সেদিন ছিল পূর্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্র ও শিবযোগ। (দ্রষ্টব্য : আঙ্কিক শব্দ—যোগেশচন্দ্র রায়, সা. প. পত্রিকা, ১৩৩৬ ; ইণ্ডিয়ান এপিগ্রাফী—ডি. সি. সরকার, ৭ম পরিচ্ছেদ ইত্যাদি।)

রামপ্রসাদ রায় তাঁর বাবার সঙ্গে 'অদ্ভুত রামায়ণ' এবং 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি'-ও রচনা করেন। দুর্গাপঞ্চরাত্রির রচনাকাল ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দ। তখন কবির বয়স ২২ বছর বলে কোন কোন পুথিতে উল্লেখিত আছে ('দ্বাবিংশতি বর্ষ মোর বয়ক্রম যবে'—সা.প. পত্রিকা ১৩০২, পৃ. ৩০২ ; বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড, ১ম সং. পৃ. ৭৭০ দ্রষ্টব্য)। একথা সত্য হলে ১৮০১-০২ খ্রীস্টাব্দে তাঁর বয়স ৫৩/৫৪ বছর। রামপ্রসাদ রায় আঠারো-উনিশ শতকের সন্ধিকালের কবি।

বিশ্বনাথবাবু খণ্ডিত-অখণ্ডিত তিনখানি কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু পুথির উল্লেখ করেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে (কলিকাতা) বহুদিন থেকে কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু আদি লীলার একখানি সম্পূর্ণ পুথি আছে (নং ১৩৪৯, পত্রসংখ্যা ১-৮৭, লিপিকাল ১২৮০)। পুথিখানা সংগ্রহ করেন বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়। বিশ্বনাথবাবুর প্রবন্ধে তার কোন উল্লেখ না দেখে বিস্মিত হয়েছি।

শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

সুদৃশ্য বাঁধাই

১ম খণ্ড : টা. ২০.০০

২য় খণ্ড : টা. ৩০.০০

স্বল্প সংখ্যক পুস্তক অবশিষ্ট আছে

বাংলা সাময়িক পত্র

১ম খণ্ড : টা. ১১.০০

২য় খণ্ড : টা. ৯.০০

গিরীন্দ্রশেখর বসু প্রণীত

স্বপ্ন

প্রায় এক যুগ পরে পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। সুদৃশ্য বাঁধাই

মূল্য : পনের টাকা

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস, সম্পাদক : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-কর্তৃক
প্রকাশিত ও বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স, ৫৭এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন
কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।
মূল্য : তিন টাকা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

৮৭ বর্ষ ॥ চতুর্থ সংখ্যা
মাঘ-চৈত্র
১৩৮৭

পত্রিকাধ্যক্ষ
শ্রীসরোজমোহন মিত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

৮৭ বর্ষ ॥ চতুর্থ সংখ্যা

মাঘ-চৈত্র

১৩৮৭

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসরোজমোহন মিত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৭০০০০৬

॥ সূচীপত্র ॥

শশাঙ্কের রাজত্বকালীন এগরা তাম্রশাসন	॥	শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার	১
গাঙ্গেয় ভূমি ও ব-দ্বীপের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব	॥	শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৬
উনবিংশ শতকে ফ্রান্সে রামমোহন-চর্চা	॥	দিলীপকুমার বিশ্বাস	২০
পরিষৎ-সংবাদ	॥		৪২
১৩৮৭ বঙ্গাব্দে উপলব্ধ পুস্তকের তালিকা			৪৪

শশাংকের রাজত্বকালীন এগরা তাম্রশাসন

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুরের নিকটবর্তী এগরা থানার কাছাকাছি পাচরোল একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। সেখানকার জনৈক ভদ্রলোকের গৃহে অনেকদিন থেকে একখানি তাম্রপট্ট রক্ষিত ছিল। এগরার ফোটোগ্রাফার আশিস রায়চৌধুরী মহাশয় তাম্রপট্টখানি সংগ্রহ করে তাঁর কাছে এনে রাখেন। আমার ভূতপূর্ব ছাত্র ডক্‌টর সরযূপ্রসাদ সিংহ গয়াতে বিহার সরকারের Archaeological Registering Officer; তিনি গয়াশহরের চাঁদচৌরা অঞ্চলবাসী মথুরামোহন চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছে এই আবিষ্কারের কথা শুনে আমাকে জানান যে, মেদিনীপুর জেলার এগরা গ্রামে একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে। আমি তখন আমার অপর একজন ভূতপূর্ব ছাত্রকে শাসনটি অনুসন্ধান করে ওর ছাপ দিতে অনুরোধ করি। ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর দীপকরঞ্জন দাস। ডক্টর দাস খোঁজ খবর নিয়ে এগরা গ্রামে রায়-চৌধুরী মহাশয়ের সংগে সাক্ষাৎ করেন এবং শাসনটির ছাপ তুলে এনে আমাকে দেন। সেই ছাপের ভিত্তিতে শাসনের পাঠোদ্ধার করা গেল; কিন্তু কোথাও কোথাও পাঠে কিছু সন্দেহ রইল। তখন ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রত্নলেখবিদ্যাশাখার কর্মচারীদের তাম্রশাসনটির ভাল করে ছাপ তুলে দিতে অনুরোধ করা হল। তাঁদের তোলা ছাপ হাতে পাবার পর অভিলেখের সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার সম্ভব হল এবং আমি এ বিষয়ে Journal of Ancient Indian History (Vol. XII, 1978-79, pp. 132-37) পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ লিখলাম।

তাম্রপট্টের বামদিকের মধ্যস্থানে শীলমোহর সংযুক্ত। তার ডানদিকে শাসনের পঙ্‌ক্তিগুলি লম্বালম্বি উৎকীর্ণ। মোট ৩৭ পঙ্‌ক্তি অভিলেখের ২০ পঙ্‌ক্তি সম্মুখভাগে এবং বাকি ১৭ পঙ্‌ক্তি পশ্চাদ্দিকে। পট্টের ডানদিকের কোণ দুটি কেটে ঘষার ফলে ঐ দিক্‌টার অর্ধচন্দ্রের মত আকৃতি হয়েছে। মাঝামাঝি জায়গায় পট্টটি লম্বায় ৭$\frac{১}{৮}$ ইঞ্চি এবং উচ্চতায় ৬$\frac{১}{৮}$ ইঞ্চি। শীলমোহরের ডিম্বাকৃতি উপরিভাগে ২" × ১$\frac{১}{৮}$" স্থানের উপর দিকে পূর্ণকুম্ভরূপ মঙ্গল চিহ্ন; নিম্নে দুই পঙ্‌ক্তি লেখ—

১. একতাকক্ষ-বিষয়

২. ……াধিরণ (।*)

অংশ দুটি একটি লম্বা রেখাদ্বারা বিভক্ত।

বর্তমান তাম্রশাসনের অক্ষর গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের (আ ৬০০-২৫ খ্রী) রাজত্বকালীন মেদিনীপুর তাম্রশাসনদ্বয়ের মত। প্রত্নলিপিতত্ত্বের দিক্ থেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, '১০০' সংখ্যাটি চিহ্ন দ্বারা লেখা হলেও তার পরে অকারণ দুটি শূন্য বসানো হয়েছে। এটা বিভিন্নচিহ্ন দ্বারা সংখ্যালিখনের প্রাচীন পদ্ধতির উপর নবপ্রচলিত দশমিক প্রথায় সংখ্যালিখন প্রণালীর প্রভাবের ফল। অন্তঃস্থ 'ব'-এর চিহ্ন দ্বারা বর্গীয় 'ব' অক্ষরটি

লিখিত হয়েছে। বাংলা বর্ণমালায় এই পার্থক্য বোঝানো যায় না। রচনারীতির দিক্ থেকে এগরা তাম্রশাসন শশাঙ্কের পূর্ববর্তী রাজা গোপচন্দ্রের রাজত্বকালীন মল্লসারুল শাসনের অনুরূপ। শাসনটিতে তারিখ নেই।

বর্তমান শাসনের সূচনায় 'সিদ্ধম্' বা 'সিদ্ধিরস্তু' বোধক চিহ্ন এবং তার পরে (১ম-৫ম পঙ্‌ক্তি) নিম্নোদ্ধৃত গদ্যবাক্য।—

স্বস্ত্যনেক-সৃষ্ট্যন্তরেষু পারম্পর্য্য-ক্রমেণ সমতীত-রাজেষ(ষু) (২) শতসহস্রাধ্যাসিতায়াং চতুর্দিক্-পর্যন্তায়াং চতুর্বর্ণাশ্রমাকীর্ণায়াং (৩) চতুরম্ভোনিধি-মেখলা-কলাপাভরণায়াং শব্দ-শষ্বাষ(স্পর্শ)-ব(র)স-রূপ-গন্ধবত্যা(৪)মপরিমিত-গুণবত্যাং পৃথ(থি)ব্যাং পরমদৈবত-শ্রীপরমভট্টারক-শ্রীশ(শ্রী)মহারা(৫)জাধিরাজ-পরমমাহেশ্বর-শ্রীশশো(শা)ঙ্কদেব(বো)রাজ্যং প্রশাসতি স্ম।

এখানে যেদেশে ভূমিদান করা হয়েছিল, তথাকার রাজা শশাঙ্কদেবের নামোল্লেখ করে তাঁর রাজোপাধি বলা হয়েছে 'পরমভট্টারক' ও 'মহারাজাধিরাজ' এবং তাঁর ধর্মজীবন-সম্পর্কিত বিশেষণ হচ্ছে 'পরমদৈবত' (দেবতাদের ভক্ত) ও 'পরমমাহেশ্বর' (শিবের উপাসক)। শশাঙ্ক শৈবধর্মাবলম্বী ছিলেন ; কিন্তু পৌরাণিক বা স্মার্ত হিন্দুমতবাদিগণের মত অন্যান্য দেবদেবীর প্রতিও তাঁর শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। "শশাঙ্কদেবো রাজ্যং প্রশাসতি স্ম" এই বাক্যের ক্রিয়াপদে অতীতকাল ব্যবহৃত দেখা যায়। সেকালে এসব ক্ষেত্রে এইরূপ ব্যবহার বিরল ছিল না। তবে এখানে লেখা উচিত ছিল 'শশাঙ্কদেবে রাজ্যং প্রশাসতি,' অর্থাৎ 'যখন শশাঙ্কদেব রাজ্যশাসন করছিলেন।'

শাসনের পরবর্তী বাক্যটি (৫ম-১৭শ পঙ্‌ক্তি) নিম্নরূপ।—

ইহৈকতাকক্ষ-(৬) বিষয়ে পুজ্যাম্বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ কার্ত্তাকৃতিকোপরিক-ভুক্তিপত্তলিক-কুমারামাত্য-বি(৭)ষয়পতীস্তদ(থা)ধিকৃতাং(তান্) ভাণ্ডাগারে চ ভাণ্ডাগারাধিকৃতাস্তদা(থা)-ধিকরণানি চ যথা(৮)র্হন(র্হং) জা(জ্ঞা)পয়িত্বা শিরোভিশ্চ প্রণিপত্যৈতদা(দ)বিধ্ববাসীয়-মহামহত্তর স্কন্দসেন-(৯) নাগসেন-প্রত্যগ্রহারীয়-পট-প্রাণেকাগ্রহারীয়-নাগদেবানন্তদেব-তর স্তোদর্ভাগ্রহারী (১০) য়-মহামহত্তর-ধর্ম্মগুপ্ত-যজ্ঞবসু-লোড্ডাবাগ্রহারীয়-মহামহত্তর-সোমদেব-গু-(১১)হদেবাথবটীয়কাগ্রহারীয়-মহামহত্তর-গোধ্যাক্ষিঘোষ-মোক্ষদেব-বি(বিং)শতিখড্ডানীয়-(১২) মহা-মহত্তসো(র)-মহীভদ্র-রাত-চ্ছাত্র- মুগাটে(টী)য়-গোমিদত্ত-গুর্জ্জারপদ্রকীয়- (১৩) ভট্টধনপাল-কাপলাশকীয়-ভট্টগোপালদেব-সর্ষপবাসিনীয়-মহাদেব-(১৪) ব্রাহ্মণপদ্রকীয়-বৈথিস্বামি-বৈষয়িকা-নাম-মহামহত্তর-বৎস শর্ম্ম- মহাপ্রধানোদয়(১৫)চন্দ্র-প্রধান-জয়দেব-প্রধান-ধ্রুবদ-প্রধ(ধা)ন-যশো-নাগ-প্রধান-বান্থ(ন্ধ)বনাগ-করণিকো(ক)-প্রবৃদ্ধদত্ত-(১৬) সমুদ্রদত্ত- উদ্যো (ত্তোদ্যো)তসিংহ-পুস্তপাল-জিনসেনাদামরাচোন-স্থায়িপাল-শ্রীধর্ম্ম-স্বস্তয়স্তদা (১৭) জ্ঞাপয়ন্তি চান্তরঙ্গ-দোষতু-ঙ্গেন বিজ্ঞাপিতা(ঃ*) স্যস্মে।)

এস্থলে একতাকক্ষ নামক বিষয় বা জেলার (কিংবা তদন্তর্গত কোনও অঞ্চলের) পঞ্চায়েত সভার মত সংস্থাবিশেষের সভ্যগণের একটি বিবৃতি উদ্ধৃত দেখা যায়। বিবৃতিটি ঐ জেলার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মচারীদের উদ্দেশে প্রচারিত হয়েছিল। এখানে নিম্নলিখিত কর্মচারিগণের উল্লেখ আছে।—(১) কার্তাকৃতিক (আরব্ধকার্যের অগ্রগতির বিষয় কর্তৃপক্ষকে জ্ঞাপনকারী উচ্চকর্মচারী) ; (২) উপরিক (প্রদেশ-শাসক) ; (৩) ভুক্তি-পত্তলিক (প্রাদেশিক মহাফেজখানার অধ্যক্ষ) ; (৪) কুমারামাত্য (রাজকুমারদের-মর্যাদাপ্রাপ্ত শাসক মত

শ্রেণীর কর্মচারী) ; (৫) বিষয়পতি (জেলার শাসক) (৬) ভাণ্ডাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিগণ, এবং তাঁদের সকলের অধিকরণ বা কার্যালয়ের কর্মচারিসমূহ।

যাঁরা বিবৃতি দিয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা ৩৫।— (১-২) শাসন-কার্যালয় অঞ্চলের মহামহত্তর স্কন্দসেন ও নাগসেন ; (৩) ঐ স্থানের অগ্রহার বা নিষ্করগ্রামবাসী পট ; (৪-৫) ত্রাণেকাগ্রহারের নাগদেব ও অনন্তদেব ; (৬-৭) তরঙ্গোদভ অগ্রহারের মহামহত্তর ধর্মগুপ্ত ও যজ্ঞবসু ; (৮-৯) লোড্ডাবা অগ্রহারের মহামহত্তর সোমদেব ও গুহদেব ; (১০-১১) আখবটীয়িক অগ্রহারের মহামহত্তর গোধ্যক্ষিঘোষ ও মোক্ষদেব ; (১২-১৪) বিংশতিখড্ডানের মহামহত্তর মহীভদ্র, রাত ও ছাত্র ; (১৫) মৃগাটার মহত্তর গোমিদত্ত ; (১৬) গুর্জারপদ্রকের ভট্ট ধনপাল ; (১৭) কাপলাশকের ভট্ট গোপালদেব ; (১৮) সর্বপবাসিনীর মহাদেব ; (১৯) ব্রাহ্মণপদ্রকের রৈথিস্বামী ; (২০) বৈষয়িক অনাম ; (২১) মহামহত্তর বৎসশর্মা ; (২২) মহাপ্রধান উদয়চন্দ্র ; (২৩) প্রধান জয়দেব ; (২৪) প্রধান ধ্রুবদ ; (২৫) প্রধান যশোনাগ ; (২৬) প্রধান বান্ধবনাগ ; (২৭-২৯) করণিক প্রবন্ধদত্ত, সমুদ্রদত্ত ও উদ্দ্যোতসিংহ ; (৩০-৩২) পুস্তপাল জিনসেন, আদামর ও অচোন ; এবং (৩৩-৩৫) স্থায়িপাল শ্রীধর্ম ও স্বস্তি। এঁদের বিবৃতি থেকে জানা যায়, অন্তরঙ্গ দোষতুঙ্গ এঁদের কাছে একটা আবেদন করেছিলেন।

উল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কারও কারও নামের সংগে কেবল তাঁদের বাসগ্রামের বা অগ্রহারের নাম বলা হয়েছে। আবার কেউ কেউ ছিলেন 'প্রধান' বা 'মহাপ্রধান' এবং 'মহত্তর' বা 'মহামহত্তর'। 'প্রধান' যদি কোনও গ্রামপ্রধান হন, তবে 'মহাপ্রধান' কোনও গ্রামসমষ্টি বা পরগণার প্রধান হতে পারেন। 'মহত্তর' যদি কোনও গ্রামের নির্বাচিত প্রতিনিধি হন, তা হলে হয়ত 'মহামহত্তর' কোনও অঞ্চলের প্রতিনিধি হবেন। এই 'মহামহত্তর'-কেই অন্যত্র কোথাও 'মহত্তম' বলা হয়েছে। 'বৈষয়িক' 'বিষয়পতি' থেকে স্বতন্ত্র ; তাই তিনি 'বিষয়-মহত্তর' হতে পারেন। 'করণিক' (বা 'কায়স্থ') পাটোয়ারি শ্রেণীর কর্মচারী ; তবে তাঁদের কাজ প্রধানতঃ হিসাবপত্র এবং লিখন ঘটিত বলে বোধহয়। কারণ দলিলপত্রের রক্ষক ছিলেন 'পুস্তপাল'। 'স্থায়িপাল' বোধহয় ন্যাসরক্ষক এবং 'অন্তরঙ্গ' পরামর্শদাতা।

দোষতুঙ্গের প্রার্থনাটি কি ছিল এবং সে সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া হল, তা এর পরে (১৭শ-২৭শ পঙ্‌ক্তি) বিবৃত হয়েছে।—

আ-চন্দ্রার্ক-সমকালীনাক্ষয়নী(১৮)বী(ব্যা) সম্যক্‌প্রতিপাল্য-সাধনানি পর-(রা)ক্রমেন(ণ) ভুজ্যমা(না*)নি ইচ্ছেহ(১৯) সহ পি(ত্রা*) মাতা-পিত্রো(১৯)-রাত্মনশ্চ পুণ্যাভিবৃর্ধ(দ্ধ)য়ে কৌশিক-সগোত্রায় ত্রিপ্রবরায় কৌশিকাম্ন(ঘ)মর্ষণ-বৈশ্বামিত্র-প্রবরায় ত্রিবেদাধ্যায়িনি(নে) ভট্ট-দামস্বামি(নে ক্ষেত্রাণি দাতুমিতি। তৎ*) কপর্দ্দিপদ্রকে (২১) দ্রোণবাপ-শতং ক্ষেত্রং তাম্রপট্টীক্রি(কৃ)ত্য ছিত্ত্বা তু(ত্বাত্র) মং(মাং) তি(দী)-য়তাং(তাম্‌।) এতদ্ধর্ম্ম(২২)সংহিতা-বচনমুপশ্রুত্যাস্মাভির্বৈরূপরিলিখিতকে(কৈ)রন্যো-ন্যাবধারণ(২৩)য়াবধৃতং যুক্তময়াং(য়ং) প্রার্থয়তে (।*) চিখা(র)-খিল-শূন্যাবস্করাম্লাং ভূমাবব(২৪)তিষ্ঠমানায়াং ন কিঞ্চিদর্থমাত্রং রাজ্ঞ(ঃ*) পুঞ্চাত্যি(ত্য)স্য চ রাজ্ঞো ধর্ম্ম-ফল-ষ(২৫)ড্‌ভাগ-প্রাপ্তিরস্ত্যেব (।*) যতো দীয়তামেতৎ কোষা(ষ্ঠাৎ) তাম্রপট্ট- দান-মর্ষা-দয়া (।*) চতু(২৬)ষ্পণিক-দ্রোণবাপাম্ভস্মাঙ্গারাদিনা দ্রোণবাপ-শতং ছিত্বা(ত্বা) দত্তং গা(গ্রা)মাৎ পশ্চি(২৭)মোত্(ত্ত)রাদিগ্‌ভাগেন দ্রো ১০০ ॥

এখানে দেখা যাচ্ছে, দোষতুঙ্গ চাইছিলেন, তাঁর এবং তাঁর পিতামাতার পুণ্যের জন্য চিরস্থায়ী অক্ষয়নীবী রূপে জনৈক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের ব্যবস্থা করতে। অক্ষয়নীবী এক ধরণের ন্যাস; তাতে কেবল ভোগের অধিকার থাকত দান বিক্রয়ের অধিকার থাকত না। দানের পাত্র ছিলেন কৌশিক-গোত্রীয় ঋক্, যজু এবং সামবেদ অধ্যয়নকারী ব্রাহ্মণ—দামস্বামী। তাঁর তিন প্রবর—কৌশিক, অঘমর্ষণ ও বৈশ্বামিত্র। দোষতুঙ্গ প্রস্তাব করেন যে, এর জন্য তাঁকে কপর্দ্দিপদ্রক গ্রামে একশতদ্রোণ ভূমি দেওয়া হোক। বিবৃতি-দাতারা বলছেন যে, ধর্মশাস্ত্রানুসারে অনুসন্ধান করে দেখা গেল, দোষতুঙ্গের আবেদন সঙ্গত; কারণ চিরদিনের পতিতজমি বৃক্ষাদিহীন ভিটা অবস্থায় পড়ে থাকায় রাজার কোনও অর্থলাভ হয় না; কিন্তু সেই ভূমির দানের ব্যবস্থা হলে রাজার একষষ্ঠাংশ পুণ্য লাভ হয়ে থাকে। তাই তাঁরা স্থির করলেন যে, ওখানকার সরকারী সম্পত্তি থেকে তাম্রপট্ট ধর্মানুসারে এটা দেওয়া যাক। তখন প্রতি দ্রোণবাপের দাম চার পণের হিসাবে যে জমি ছিল, তা থেকে গ্রামের পশ্চিমোত্তর দিকে একশত দ্রোণবাপ ভূমি ভস্ম, অঙ্গার প্রভৃতি দ্বারা আলাদা করে তাঁকে দানের জন্য দেওয়া হল। অঙ্কে দ্রো ১০০ ॥

এই অংশের দ্রোণবাপ' শব্দের মৌলিক অর্থ 'যতটা জমিতে একদ্রোণ পরিমাণ ধান্য-বীজ বপন করা যায়' এবং 'দ্রোণ' ১০২৪ মুষ্টি ধান্য। তবে 'বপন' অর্থে বীজ ধান ছড়িয়ে দেওয়া কিংবা ধানের চারা পোতা, তা জানা নেই। কিন্তু দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করলে আধুনিক মাপের ১৬ থেকে ২০ বিঘা জমিতে এক দ্রোণবাপ হতে পারে। পূর্ববাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাপের দোণ (অর্থাৎ দ্রোণবাপ) এখনও প্রচলিত আছে। দ্রোণবাপের আটগুণ ছিল কুল্যবাপ; অনুরূপ এক কুল্যবাপ জমি অন্যত্র ২, ৩ বা ৪ দীনারে বিক্রীত হত। দীনার নামক স্বর্ণমুদ্রা রূপক (ধরণ, দ্রম্ম, কার্ষাপণ প্রভৃতি) নামক ১৬টি রৌপ্য-মুদ্রার সমান ছিল। আবার ১৬ পণে এক রৌপ্যমুদ্রা হত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এক দ্রোণবাপের মূল্য ৪ পণ হলে এক কুল্যবাপের মূল্য পড়ত ৩২ পণ অর্থাৎ এক দীনারের অষ্টমাংশ। সুতরাং মেদিনীপুর অঞ্চলে জমির দাম ও চাহিদা দেশের অন্যত্র থেকে অনেক কম ছিল। মধ্যযুগে ১২৮০ কড়িতে একপণ গণনা করা হত। যা হোক, একথা উল্লেখ করা উচিত যে, সেকালে জমির অবস্থা ও ভোগের শর্ত সরকারে জমা দেওয়া অর্থের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল ছিল।

শাসনের উপরিলিখিত অংশের পরে (২৭শ-৩৭শ পঙ্ক্তি) আছে—অপি চ। মহাভারতে শ্রূয়তে স্থ(ধ)র্ম্মশাস্ত্রে (২৮) শ্রূয়তে (।*)

স্বদত্তাং পর-দত্তাম্বা(ত্তাং বা) যো হরেতি(ত) বসুন্ধরা (মূ ।*)

স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূ(২৯)ত্বা পিতৃভি(ঃ*) সহ পচ্চ(চ্য)তে (॥*)

বহুভির্ব্বসুধা দত্তা রাজা(জ)ভি(ঃ*) সগরাদিভি(ঃ।*)

যস্য (৩০) যস্য যদা ভূমিত(স্ত)স্য তস্য তদা ফলম্ (॥*)

কণ্টকারিক(কা)-গর্ত্তা-পশ্চিমদক্ষিণে(ণ)-(৩১)কোণে কীলক(ঃ ।*) ততো দক্ষিণে-ন তালপুষ্কি(ষ্ক)রিণ্যা(ঃ*) পশ্চিম-মহাপদকা-দক্ষিণেন কীলকঃ (।*) (৩২) ততো (তঃ) পশ্চিমোত্তর(রেণ) বাহিদকীর্য(র্য)-স্যূন্তোদক-পুষ্কি(ষ্ক)রিণ্যাং (পূ*)-র্বেন কীলক (ঃ*)। তদুত্তরেণ ভক্ত (৩৩) স্বামি-মণ্ডলদ্রী(য়*) সীমায়াং কীলকঃ। ততো-(তঃ) পূর্ব্বেণে(ণ) চাণ্ডাল-পুষ্কি(ষ্ক)রিণ্যাং দক্ষিণ-মহাপ(৩৪)দকায়াং কীলকঃ

(।*) ততো দক্ষিণ(ণে)ন বেদম-ত্তম্বামিমণ্ডলে পূর্ব্বেণ কীলক(ঃ।*) ততো(তঃ) পশ্চিমনে-(মেন)ষু(৩৫)ষ্ট্র(শুষ্ক)-পুষ্কি(ষ্ক)রিণী-পশ্চিমোত্তরো(র)-কোণে কীলকে(কঃ) । ততো দক্ষিণেন ১০ কণ্টকারি (কা*)-(৩৬)গর্তায়ামা প্রতীকং(কম্) । শ্রূয়তে ধর্ম্মশাস্ত্রে মহাভারতে (।*)

ষষ্টিং বর্ষি(র্ষ)-সহস্রাণি (৩৭) স্বর্গে মোদতি ভুমি*) দ(ঃ ।*)
আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তান্যেন(ন্যেব) নরগম্ব(কং ব)সে (৫ ।*)

এই অংশের প্রথম দিকে দত্তভূমির অপহরণকারীর পাপ এবং রক্ষাকর্তার পুণ্যের বিষয় সম্পর্কিত দুটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হয়েছে। তারপর প্রদত্ত ভূমির সীমা বর্ণনা এবং সর্বশেষে ভূমিদাতার ষাট হাজার বৎসর স্বর্গবাস এবং ভূমিহরণকারী ও তার পরামর্শদাতার ততকাল নরকবাস বিষয়ক আর একটি শ্লোক উদ্ধৃত দেখা যায়। তিনটি শ্লোকই মহাভারত সংজ্ঞক ধর্মশাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, একথা দুবার বলা হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে 'শ্রূয়তে' শব্দটি ভুলবশতঃ দুইবার ব্যবহৃত দেখা যায়।

সীমাবর্ণনার শেষদিকে বোধহয় '১০' অঙ্ক দ্বারা চিহ্নিত একটি প্রতীকের উল্লেখ আছে। তবে এখানে ভাষার কিছু ত্রুটি আছে। এই বর্ণনায় 'মণ্ডল' শব্দটি ঠিক কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তা বোঝা কঠিন। কারণ শব্দটির সাধারণ অর্থ 'জেলা'। বোধহয়, এখানে এর অর্থ গ্রামসমষ্টি বা পরগণা। ভূমির সীমায় 'চাণ্ডাল-পুষ্করিণী'র উল্লেখ লক্ষণীয়; কারণ ভূমিতে স্থায়ী প্রজাস্বত্ব না থাকলে সেখানে বিশেষ সরকারী অনুমোদন ব্যতীত পুষ্করিণী খনন সম্ভব হত না। তবে অন্ত্যজ জাতির পক্ষেও জমিতে স্থায়ী স্বত্ব লাভে অসুবিধা ছিল না। 'রাজতরঙ্গিণী'-তে (৪।৫৫-৭৫) দেখা যায়, অষ্টম শতাব্দীর রাজা চন্দ্রাপীড় মন্দির নির্মাণের জন্য জনৈক চর্মকারের কাছ থেকে তার জমি কিনে নিয়েছিলেন। এগরা অঞ্চলের চণ্ডালদের কিছু প্রতিষ্ঠা ছিল বলে মনে হয়। পুষ্করিণীর 'পদকা' বলতে বোধহয় পাড়ি বোঝানো হয়েছে।

গাঙ্গেয় ভূমি ও ব-দ্বীপের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব

শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

গাঙ্গেয় ভূমি ও ব-দ্বীপের স্রষ্টা গঙ্গানদী ভারতের তথা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নদী বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। আবহমান কাল হইতে গঙ্গার মত পৃথিবীর অন্য কোন নদী কোটী কোটী নরনারীর সংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁহার লেখা বিখ্যাত পুস্তক "ভারত আবিষ্কার"-এ ভারতের কৃষ্টি ও সভ্যতা বিকাশে গঙ্গার অবদানের কথা উচ্ছ্বসিত ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। মধ্যযুগে গঙ্গার তীরে মগধরাজ্যে ভারতীয় সভ্যতার সূত্রপাত হয় এবং পরে ভারতের চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। অর্থনীতিক ক্ষেত্রে গঙ্গার প্রভাব সম্বন্ধে আমরা সব সময় সচেতন; গঙ্গার অবর্তমানে আমাদের দৈনন্দিন জীবনধারা কোন পথে চালিত হইত, তাহার ধারণা করা দুঃসাধ্য।

হিমালয়ে গঙ্গা ও গাঙ্গেয় উচ্চভূমি :

গঙ্গার জন্ম পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত হিমালয়ের গিরিকন্দরে। এইজন্য পুরাণে গঙ্গাকে হিমালয় দুহিতা বলা হইয়াছে। প্রাচীনকালে ভারতীয় মুনিঋষিরা তপস্যার জন্য লোকালয়ের বহুদূরে হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চলে ধ্যান ধারণার উপযোগী মহামহিমময় বিভিন্ন স্থান আবিষ্কার করেন ও সেই সূত্রে হিমালয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য; উচ্চ পর্বতরাজি—নন্দাদেবী (৭৮১৭ মিটার), শতপন্থ (৭৬৮৪ মিটার), বদ্রিনাথ (৭১৩৮ মিটার); ত্রিশূল (৭১২০ মিটার), কেদারনাথ (৬৯৪০ মিটার), শ্রীকান্ত (৬৭২৮ মিটার), গঙ্গোত্রী (৫৬১১ মিটার), ও অন্যান্য বহু-গিরিশৃঙ্গের সন্ধান তাঁহারা উত্তরাখণ্ডে ও সন্নিহিত অঞ্চলে দেখেন ও তাহাদের নামকরণ করেন।

উচ্চ হিমালয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া বিশাল হিমক্ষেত্র (হিমল) কয়েক ভাগে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে এবং তাহাদের অগ্রভাগ হইতে নিঃসৃত বহু হিমবাহ—গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ, যমুনোত্রী প্রভৃতির আবিষ্কার তাঁহারা করেন। গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী হিমবাহ হইতে গঙ্গা ও যমুনা বাহির হইয়াছে, ইহাও তাঁহাদের আবিষ্কারের ফল। তাঁহারা দেখেন যে গঙ্গোত্রী হিমবাহের এক বিরাট জিহ্বা বরফ-গহ্বরের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে এবং বাহিরের উষ্ণতার সংস্পর্শে গলিয়া নদীরূপে বহিয়া যাইতেছে। তাঁহারা ঐ স্থানের নাম রাখেন 'গোমুখ'। উহাই এখন গঙ্গার প্রধান উৎসমুখ বলিয়া ধরা হয়, যদিও পৌরাণিক যুগ হইতে উহা ভাগীরথী নামে পরিচিত। পুরাণ রচয়িতারা কল্পনা নেত্রে দেখেন মহারাজ ভগীরথ কর্তৃক আনীত গঙ্গা স্বর্গ হইতে মর্ত্যলোকে নামিয়া আসিতেছেন; তখন হইতে গঙ্গার শীর্ষ নদীর নাম ভাগীরথী। সার্ভে-অফ-ইণ্ডিয়ার মানচিত্রে ঐ নামই লেখা হইয়াছে। ভাগীরথী ছাড়া গঙ্গার আরও কয়েকটি শীর্ষ-নদী আছে, উহাদের মধ্যে অন্ততঃ ছয়টি উল্লেখযোগ্য : মন্দাকিনী, ধৌলিগঙ্গা; পিণ্ডারগঙ্গা; জাহ্নবী ও সরস্বতী মিলিয়

অলকানন্দা। ভাগীরথীর পরেই অলকানন্দার স্থান; দেবপ্রয়াগে ভাগীরথীর সহিত অলকানন্দার মিলন হয়; এই মহাসংগমের পর হইতে দুইটি নদী মিলিয়া গংগা নাম গ্রহণ করে। বিভিন্ন ধারা মিলিয়া গংগার উৎপত্তি—এই ভৌগোলিক সত্য পুরাণ রচয়িতাদের নিশ্চয় জানা ছিল। কাজেই পৌরাণিক উপাখ্যানে গংগা শিবের মাথার বিপুল জটাজাল হইতে সপ্তধারায় নামিয়া আসিয়াছে, রূপকচ্ছলে তাঁহারা লিখিতে পারিয়াছিলেন।

গংগার মত যমুনা হিমালয়ের এক হিমবাহ হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে। এই হিমবাহের নাম যমুনোত্রী। ভাগীরথী উৎসমুখের ২৫ কিলোমিটার পশ্চিমে বন্দরপুচ্ছ পর্বতের (৬৩১৫ মিটার) গা বহিয়া যমুনোত্রী হিমবাহের ৩২৫৫ মিটার উচ্চ মুখ হইতে যমুনা বাহির হইয়াছে। এখানে পরে যমুনোত্রী মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। পশ্চিমে টোনস নদীর উৎপত্তিস্থল। যমুনা মধ্য হিমালয়কে ৭৫ কিলোমিটার ভেদ করিয়া টোনস্ নদীর সহিত মুসৌরি পাহাড়ের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে কালসির সন্নিকটে মিলিত হইয়াছে। যমুনা অপেক্ষা টোনস্ দ্বিগুণ বেশী জল বহন করিয়া সঙ্গমে আনিয়া ফেলে। যমুনার আর একটি শাখা নদীর নাম গিরি। সিমলার কাছ হইতে উঠিয়া এই নদীটি পাওনটার কাছে যমুনার সহিত মিলিত হয়। যমুনা উৎসমুখের কাছে কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবণ দেখা যায়, ইহাদের মধ্যে ৮ কিলোমিটার দূরে যমুনোত্রী উষ্ণ প্রস্রবণ বিখ্যাত। যমুনার দৈর্ঘ্য উৎসমুখ হইতে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত ১৫২ কিলোমিটার; এখান হইতে হরিদ্বার—৮০ কিলোমিটার পূর্বদিকে।

গঙ্গা ও যমুনার উৎসমুখ যাহাতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকে তাহার জন্য উৎসমুখের কাছে দুইটি মন্দির স্থাপিত হয়—অলকানন্দার তীরে বদ্রীনাথের বদ্রীনারায়ণের মন্দির। আর যমুনোত্রি হিমবাহের যাপে যমুনোত্রী মন্দির। হিন্দুদের কাছে এই মন্দির দুইটি আজ মহাপবিত্র স্থান। দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত হইলেও প্রতি বৎসর বহু হিন্দু তীর্থযাত্রী যাতায়াতের সকল রকম দুঃখ কষ্ট স্বীকার করিয়াও গঙ্গা ও যমুনার উৎসমুখ দেখিতে পদব্রজে বা ডাণ্ডীতে যাইতে প্রস্তুত। এখন অবশ্য পাকা রাস্তা নির্মিত হওয়ায় অন্ততঃ কিছুদূর মোটরে যাওয়া যায়। গঙ্গা ও যমুনা দুই বিভিন্ন পথ ধরিয়া হিমালয়ের মহান ও মধ্য পর্বতকে কাটিয়া নীচে নামিয়া আসিয়াছে। হৃষীকেশের কাছে গঙ্গা মধ্য হিমালয় হইতে বাহির হইয়া আসে আরও কিছুদূর চলার পর হরিদ্বারে আসিয়া গঙ্গার সমভূমিতে নামিয়া আসে। উৎসমুখ হইতে হরিদ্বার পর্যন্ত গংগার দৈর্ঘ্য ১৯৫ কিলোমিটার। প্রথম ৩৫ কিলোমিটার চলার পর ইহা মহান হিমালয়কে কাটিয়া মধ্য হিমালয়ে আসিয়া প্রবেশ করে এবং আরও ১৪০ কিলোমিটার দূরে দেবপ্রয়াগে অলকানন্দার সহিত মিলিত হয়; পরে উভয়ে মিলিয়া ৭০ কিলোমিটার বহির্হিমালয়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া হরিদ্বারে আসিয়া পৌঁছায়।

গঙ্গা-যমুনার উচ্চভূমি ঃ

গাঙ্গেয় ভূমির প্রথম রূপ আমরা হিমালয়ের উচ্চভূমিতে দেখিতে পাই; বিশেষ করিয়া উত্তরাখণ্ডে ভূমি ভাংগা ও গড়া এই দুই কাজেই গংগা ও তাহার সহকর্মী যমুনা বিশেষ পারদর্শী। পাথর কাটিয়া গংগা দ্রুতবেগে নীচে নামিয়া আসিতেছে ও বড় বড় পাথরের চ্যাংগর চারিদিকে ছড়াইয়া আছে। নদীর গভীর খাত ও দুই পার্শ্বে জলপ্রপাত গংগায় প্রচণ্ড শক্তির স্বাক্ষর দেয়। আবার গংগার পার্বত্য অঞ্চলেও ভূমি গঠনের অদ্ভুত

ক্ষমতা দেখা যায় ; নদীর দুই ঢালে প্রশস্ত ধাপ একটির ওপর আর একটি বিস্তীর্ণ স্থান অধিকার করিয়া গঙ্গার গঠনমূলক কার্যের পরিচয় দেয়। অবশ্য নদীর ভূমি গড়া ও ভাঙ্গা অনেকটা নির্ভর করে কি ধরনের পাথরের ওপর দিয়া নদী প্রবাহিত হইতেছে—আগ্নেয়-পাথর গ্রানাইট, বা রূপান্তরিত পাথর কোয়ার্টজাইটের মত শক্ত পাথর; অথবা বেলে বা শেলের মত নরম পাথর। এ ছাড়া হিমালয়ের এখনও উত্থানের সহিত নদীখাতের গভীরতা বাড়িয়া যাইতেছে।

অধ্যাপক এইচ্, এন. ছিব্বরের ইংরাজীতে লেখা 'হিমালয়ে ভাগীরথী-গঙ্গার গতিপথ' প্রবন্ধের শ্রীমতি ঊষা সেন ব্যংলায় অনুবাদ করিয়া গঙ্গা কর্তৃক ভূমি ভাঙ্গা ও গড়ার কয়েকটি উদাহরণ উত্থাপিত করেন,—যেমন ভাগীরথী জাড্গঙ্গা সঙ্গমের নিকট নদীবক্ষে গ্রানাইট পাথরে কাটা সঙ্কীর্ণ খাত ও পাহাড়ের ঢালে জলস্রোতের দ্বারা ঘূর্ণমান পাথরের নুড়ি দিয়া কাটা গোলাকার দাগ বিশেষ নিদর্শন; আবার ধারালী ও ঝালার মধ্যবর্তী অংশে ভাগীরথীর ঢালকে কাটিয়া উপত্যকাকে প্রশস্ত করা ও মূলনদীর গতিবেগ মন্দা হওয়ায় দুই তীরে পলি জমাইয়া চাষবাসের উপযোগী ধাপের সৃষ্টি করা—নদীর ভূমি গঠনের স্বাক্ষর দেয়।

হিমালয়ে গাঙ্গেয় উচ্চভূমিতে গঙ্গা ও তাহার শীর্ষ নদী কর্তৃক ভূমি ভাঙ্গা ও গড়ার কাজ দেখিবার আমি অনেক সুযোগ পাইয়াছিলাম এবং সে সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা পরে ভারত গভর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত হয়।[২] ভাগীরথী মহান হিমালয়কে কাটিয়া বাহির হইয়া আসিবার সময় এক গভীর নদীখাত সৃষ্টি করিয়াছে, উহা ভাগীরথীর ভূমি ভাঙ্গার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ, ভাগিরথী খাতের দুই পার্শ্বে পাহাড়ের খাড়া ঢাল উহাকে আরও স্পষ্ট করিয়া তোলে। কিন্তু ভাগীরথীর-সে রুদ্র মূর্তি সীমিত হওয়ার ফলে তেহ্রি ও ভাটওয়েরির মধ্যবর্তী অংশে ভাগীরথী এক প্রশস্ত উপত্যকা সৃষ্টি করে এবং তাহার দুই তীরে পলি সঞ্চিত করিয়া কয়েকটি ধাপ গড়িয়া তোলে। প্রাক্তন তেহ্রি রাজ্যের রাজধানী নদী কর্তৃক গড়া ধাপের উপর স্থাপিত হয়।

আবার রুদ্রপ্রয়াগে অলকানন্দা ও মন্দাকিনী সঙ্গমের নীচে অলকানন্দার দুই পার্শ্বে নদী কর্তৃক গড়া কয়েকটি প্রশস্ত ধাপ দেখা যায়। রুদ্রপ্রয়াগ ও কর্ণপ্রয়াগের মধ্যে অবস্থিত এইরূপ একটি পলি-ধাপের নাম 'গোচর' দেওয়া হয়; উহা পার্বত্য অঞ্চলের পক্ষে এতই প্রশস্ত যে গোচারণ করা ছাড়া বিমানের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

রুদ্র প্রয়াগের ওপরদিকে অলকানন্দার ভূমি ভাঙ্গার বহু পরিচয় পাওয়া যায়। স্থানীয় পাথর কোয়ার্টজাইট্ বেশ শক্ত। দেখা যায় যে অলকানন্দা প্রবল বেগে বহিবার সময় নদীপথের শক্ত পাথর কাটিয়া উপত্যকার গভীরতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতেছে; কিন্তু নদীর ঢালে জল একে কম; তার ওপর ছড়াইয়া থাকায় কোন বিশেষ খাতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে পারে না। কাজেই তাহার পক্ষে দ্রুত ঢালের পাথর কাটিয়া নদীকে চওড়া করিবার ক্ষমতার যথেষ্ট অভাব। নদীর খাড়া ঢালে মূল নদী কর্তৃক পলি না জমাইবার ইহাই প্রধান কারণ। সুযোগের অভাবে অলকানন্দা ঐ স্থানে তাহার গঠনমূলক কাজ করিতে অপারগ।

গঙ্গার অন্যান্য শীর্ষ বা শাখা নদী সম্বন্ধে ঐ একই কথা প্রযোজ্য। গঙ্গার মত যমুনা হিমালয়ের উচ্চভূমি ভাঙ্গা গড়ার কাজে সর্বদাই ব্যাপৃত থাকে। যমুনা ও তাহার প্রধান শাখা নদী টোনস যমুনোত্রী হিমবাহের বিভিন্ন স্থান হইতে বাহির হইয়া গভীর নদীখাতের মধ্য দিয়া দ্রুত প্রবাহিত হইয়াছে ; এই নদীখাতটির দুই পাশে খাড়া পাহাড়। হনুমানগঙ্গা

ও মুসৌরী পাহাড়ের মধ্যবর্তী অংশে যমুনা ও টোনস্ এর সঙ্গমের উপর নদী দুইটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত উপত্যকার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া দুই তীরে ধাপ গঠন করিয়াছে। ভূতাত্ত্বিক গঠন, পাথরের বৈশিষ্ট্য, ঢালের ক্রমাবনত ও নদীতে জলের পরিমাণের উপর যমুনার ভূমি ভাঙ্গা ও গড়ার কাজ নির্ভর করে। মহান হিমালয় ছাড়া আর তিনটি পর্বত কাটিয়া—ধৌলাধর, নাগটিব্বা ও মুসৌরী—তাহার ভাঙ্গন শক্তির পরিচয় দেয়। যমুনা নদীর তলায় পাথরের তাপ খুব বেশী। ফলে সেখান হইতে কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবণ বাহির হইয়া আসিতেছে। যমুনোত্রী মন্দিরে যাইবার পথে এইরূপ কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবণ দেখা যায়। মন্দিরের কাছে একটি প্রস্রবণের মধ্য হইতে ফুটন্ত জল বাহির হইয়া আসিতেছে। তাপমাত্রা ৯০·৪ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। তীর্থযাত্রীরা ঐ গরম জলে চাল প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য সিদ্ধ করিয়া লয়। পাশেই আবার অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা জলের প্রস্রবণ আছে। স্নানের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। যমুনার দৈর্ঘ্য বরাবর গতিপথে দেখা যায় অন্ততঃ তিনটি জায়গায় প্রশস্ত উপত্যকা হঠাৎ গভীর খাতে পরিণত হইয়া জলপ্রপাতের নীচ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে নদীর গতিপথের হিমালয়ের উত্থানের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ হিমালয় যখন মাথা চাড়া দিয়া উপরে উঠে তখনই তাহার প্রভাব নদীগুলির উপরে পড়ে। পাথর কাটিয়া নদী তখন তাহার গতিপথে দ্রুত চলিতে থাকে ও দুই পার্শ্বের ঢাল ক্রমেই তীব্রতর হইতে থাকে। ভূতত্ত্ববিদদের মতে হিমালয়ে যমুনার অববাহিকা আধুনিক যুগে অন্ততঃ তিনবার উপরে উঠে।

গাঙ্গেয় সমভূমি ঃ

বহির্হিমালয়ের দক্ষিণ প্রান্তে শিবালিক পাহাড়ের যে কয়টি গিরিদ্বার আছে, তাহাদের মধ্যে হরিদ্বার আমাদের কাছে অতীব পবিত্র স্থান। কারণ আগেই বলা হইয়াছে ইহার মধ্য দিয়া গঙ্গা হিমালয় হইতে বাহির হইয়া গাঙ্গেয় সমভূমির মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে হরিদ্বারের মধ্য দিয়া আসিবার সময় প্রতি বৎসর প্রায় ২১৩৯ কোটি কিউবিক মিটার জল প্রতি বৎসর সংগ্রহ করিয়া উত্তর ভারতের সমভূমিতে প্রবেশ করে। এই সমভূমি গঙ্গার সৃষ্টি। গঙ্গা তাহার শাখা প্রশাখা সমেত আজ যে সমভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে উহার ইতিহাস চমকপ্রদ। প্রায় ২৫ লক্ষ বছর আগে প্লায়স্টোসিন যুগে টেথিস মহাসাগর হইতে সদ্যোত্থিত হিমালয়ের সঙ্গে দক্ষিণ দিক হইতে ভাসিয়া আসা প্রাচীন গোণ্ডওয়ানা মহাদেশের এক প্রচণ্ড সংঘাতের ফলে কঠিন পাথরের তৈরী গোণ্ডওয়ানা ল্যাণ্ড না ভাঙ্গিয়া নুইয়া পড়ে ও অন্যদিকে হিমালয়ের অগ্রগতিতে বাধা দেয়। এই অবনত নিম্নভূমি দেখিতে অনেকটা কানাউঁচু এক বিরাট কাঁসির মত ছিল—উত্তর কানায় বহির্হিমালয়, দক্ষিণ কানায় বিন্ধ্য পর্বত, এবং মধ্যভাগে এবড়োখেবড়ো অসমান গোণ্ডওয়ানা ভূমি। পরে উত্তরে হিমালয় হইতে যমুনা, গঙ্গা, ঘর্ঘরা, গণ্ডক, কোশী, মহানন্দা এবং দক্ষিণে চম্বল, সিন্দু বেতোয়া, কেন শোন নদী লক্ষ লক্ষ বছর ধরিয়া পলি বহন করিয়া আনিয়া এই বিশাল নিম্নভূমিকে ভরাট করিয়া ফেলে।

এই নদীগুলির গতিপথের উপর নদী বৈজ্ঞানিকেরা বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছেন। কারণ সমভূমির উপর দিয়া বহিবার সময় দিক পরিবর্তন করা ইহাদের স্বধর্ম। এই দিক পরিবর্তনের ফলে জনসাধারণের বিশেষ করিয়া স্থানীয় কৃষকদের বহু ক্ষয় ক্ষতি অতীতে হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে হইবার সম্ভাবনা আছে। বিহারে কোশী নদী নেপাল হিমালয় হইতে আসিয়া

সমভূমিতে প্রায়ই দিক পরিবর্তন করে এবং তখন চারিদিক বন্যার জলে ভাসাইয়া দেয়। গঙ্গা পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়া তাহার দাক্ষিণাভিমুখী পথ হইতে সরিয়া দক্ষিণপূর্ব দিকে বাংলাদেশে প্রবেশ করার পরিণাম পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা হাড়ে হাড়ে আজ বুঝিতেছে। ভাগিরথীতে আজ জল কম; কলিকাতা হইতে ষ্টীমার শান্তিপুর পর্যন্ত যাইতে পারিত, জলাভাবে তাহাও অধুনা যাইতে পারিতেছে না। কলিকাতার মত বড় শহরে পানীয় জলের অভাব। গঙ্গার মোহানা দিয়া সমুদ্রগামী জাহাজ অতি সন্তর্পণে নদীর চড়া হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া কলিকাতা বন্দর পর্যন্ত আসিতে পারে। ফারাক্কার বাঁধ বাঁধিয়া গঙ্গার জলের কিছুটা পশ্চিমবঙ্গে আনিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে বাংলাদেশের অধিবাসীদের ঘোর আপত্তি কারণ গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের পূর্বাংশে নদীগুলি মজিয়া যাইবে। ইহার আশঙ্কা তাহারা করিতেছে।

প্রায় ২০০ বছর আগে ১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দে জেমস রেনেল অবিভক্ত বঙ্গদেশের নদীগুলির বৈশিষ্ট্য ও গতিপথ লক্ষ্য করিয়া এক মানচিত্র অঙ্কন করেন; ঐ মানচিত্রের সহিত আজকালকার নদীগুলিকে তুলনা করিলে দেখা যায় যে গঙ্গা, বিশেষ করিয়া তাহার বিভাজিকা নদীগুলির (distributeries) চলৎ-শক্তি আগেকার মত নাই; ইহারা এখন হয় মজিয়া জলাভূমি সৃষ্টি করিয়াছে আর না হয় আঁকিয়া বাঁকিয়া কোনরকমে বঙ্গোপসাগরের দিকে আগাইয়া যাইতেছে। রেনেলের মত আমরা আজ জোর গলায় বলিতে পারি না "বাংলার নদীগুলি এমনকি বড় বড় নালা পর্যন্ত প্রত্যেকটি নাব্য। প্রচুর জল লইয়া তাহারা বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইয়া দেশকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে, এমন কোন গ্রাম নাই যাহার পাচ মাইলের মধ্যে নাব্য নদী না থাকায় জলপথে চলাচল করিবার সুযোগের অভাব। গ্রীষ্মকালে কাঠফাটা রোদ্দুরে কোন নদীর জল শুকাইয়া যায় না। নদী আপন মনে দেশের ও দশের উপকারের কাজ করিয়া চলিতেছে"।

আমাদের নদীগুলির এই দুরবস্থার কারণ কি? বৃষ্টিপাত কমে নাই। তুষারগলা জলে গঙ্গা এখনও পুষ্ট হইতেছে। কিছুদিন আগে এই বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে বলা হয়। আমার অনুসন্ধানের ফলাফল পশ্চিম জার্মানী হইতে প্রকাশিত এনালস্ অফ জিওমরফলজিতে ছাপা হয়। এক মানচিত্র অঙ্কন করিয়া আমি দেখাই যে জল ও স্থলের দ্বন্দ্ব ইহার প্রধান কারণ সমুদ্র যখনি জিতিয়া অল্পাধিক উপরে উঠিতে সক্ষম হইয়াছে, তখন সমুদ্র সংলগ্ন নিম্নভূমির উপর প্রভাব দেখা দিয়াছে। নিম্নভুমি ও সমুদ্রপৃষ্ঠের পারস্পরিক উচ্চতা কমিয়া যাওয়ার ফলে নদীগুলির চলৎ-শক্তি হ্রাস পায় ও নদীবক্ষে চড়া পড়ে। ভারতের সাগর উপকূলে এই ধরনের সমুদ্রপৃষ্ঠের উত্থান ও পতন গত ২০ হাজার বছর মধ্যে কোয়াটার্ণি কালীন, অন্ততঃ সাতবার হয়, তাহার বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ডায়মণ্ডহারবারের কাছে ভূমিউচ্চতামাপক চিহ্নগুলি এখন মাটির বেশ নীচে নামিয়া গিয়াছে। দেখা যায় এবং সুন্দরবনের 'জটার দেউল' প্রভৃতি প্রাচীন মন্দিরগুলি নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে, সে সম্বন্ধে বহু প্রমাণ আছে।

সমুদ্র হইতে দূরে প্রবাহিত বহু নদী তাহার দিক পরিবর্তন করিয়া এক মূল নদী হইতে অন্য মূল নদীতে গিয়া পড়িয়াছে তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ তিস্তা নদী। ১৭৮৭ খৃস্টাব্দের পূর্বে উত্তরবঙ্গের মধ্য দিয়া করতোয়া ও পুনর্ভবার সাহায্যে সোজা দক্ষিণে চলিয়া গঙ্গায় আসিয়া পড়িত। পরে এক ভূমিকম্পের ফলে ইহা দিক পরিবর্তন করিয়া ব্রহ্মপুত্রের সহিত

মিলিত হয়। ফলে উত্তরবঙ্গে জলের অভাবে বহু নদী শুকাইয়া যায়। ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন জলধারা এক সময় মৈমনসিং জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। পরে ইহা পশ্চিম দিকে সরিয়া যাওয়ার ফলে নদীর প্রাক্তন খাত প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে। বাংলাদেশে ধলেশ্বরীর মধ্য দিয়া এক সময় গঙ্গা প্রবাহিত হইয়া নারায়ণগঞ্জের কাছে ব্রহ্মপুত্রের সহিত আসিয়া মিলিত হইত। গঙ্গা ও মেঘনা নিজ নিজ খাতের মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরে আসিয়া পড়িত। এখন গঙ্গা চাঁদপুরের কাছে তাহার বৈশিষ্ট্য হারাইয়া মেঘনার সহিত মিলিত হইয়া বঙ্গোপসাগরের দিকে প্রবাহিত হইতেছে। গঙ্গার দুইটি বিভাজিকা নদী—ভৈরব ও চন্দনা তাহাদের গুরুত্ব হারাইয়া ক্ষুদ্র নদীতে পরিণত হইয়াছে। এখনকার ক্ষীণকায় ভৈরব নদীকে দেখিয়া মনে হয় না যে সে এক সময় নামের সার্থকতা অনুযায়ী প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে গিয়া পড়িত। এই নদী যে এক সময় গভীর খাতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত তাহার চিহ্ন বঙ্গোপসাগরের তলায় এক গভীর কাটা উপত্যকা হইতে বোঝা যায়। ইহাকে অতলস্পর্শী নদী উপত্যকা বলা হয়। (Swatch of no ground)। দেখিতে অনেকটা যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো নদীর গভীর উপত্যকার মত (Colorado Canyon)। আমার আঁকা 'পরিবর্তনশীল সমুদ্র পৃষ্ঠ সম্বন্ধীয়' মানচিত্রে ইহার অবস্থান দেখান হইয়াছে। বঙ্গোপসাগর উপকূলের অনতিদূরে এইরূপ আরও কয়েকটি বিচ্ছিন্ন গভীর উপত্যকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে বঙ্গদেশের দক্ষিণ ভাগ সমুদ্রের তলায় নদী নালা সমেত নামিয়া গিয়াছে। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা প্রভৃতি নদী বহু দিন ধরিয়া পলিমাটি আনিয়া সমুদ্রগর্ভে সঞ্চিত করা সত্ত্বেও দেশের উপকূল সমুদ্রের দিকে আগাইয়া যাইতেছে না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল যে গঙ্গা ও তাহার বিভাজিকা নদীগুলি এবং ব্রহ্মপুত্র মেঘনা প্রভৃতি নদী বহুদিন ধরিয়া পলিমাটি আনিয়া সমুদ্রগর্ভে সঞ্চিত করা সত্ত্বেও দেশের উপকূল সমুদ্রের দিকে আগাইয়া যাইতেছে না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল যে গঙ্গা ও তাহার বিভাজিকা নদীগুলি এবং ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা তাহাদের বহিয়া আনা পলি সমুদ্রবক্ষের গভীর খাতগুলি ভরাট করিতে ব্যবহৃত হইতেছে। আবার পলির কতকাংশ জোয়ারের সময় পূর্ব হইতে পশ্চিমে আসিয়া সমুদ্রের খাড়ির নদীর কয়েকটি মোহানার মধ্য দিয়া পশ্চিমবঙ্গে ২৪ পরগণা জেলায় নিম্নভূমিতে প্রবেশ করিতেছে।

গঙ্গার দিক পরিবর্তনের ফলে ভৈরব নদীর উপরাংশ, যাহা আজ মহানন্দা নামে পরিচিত কাটা পড়ে, পরে ভৈরব আরও দুই বা তিন ভাগে খণ্ডিত হইয়া যায় চন্দনা এক সময় মধ্য বঙ্গের প্রধান নদী ছিল। গঙ্গার জল ইহার মধ্য দিয়া প্রবেশে বাধা পাওয়ায় ইহার অস্তিত্ব প্রায় লুপ্ত হইতে বসিয়াছে।

হরিদ্বারকে গাঙ্গেয় সমভূমির প্রারম্ভ বলিয়া ধরা হয়। যদিও ইহার আরও ৮০ কিলোমিটার পশ্চিমে যমুনা আজ হিমালয় হইতে বাহির হইয়া সমভূমি সৃষ্টি করিতে গঙ্গাকে সাহায্য করিতেছে। ইহার কারণ যমুনা প্রাচীনকালে গঙ্গার দিকে না আসিয়া সিন্ধুনদীর দিকে প্রবাহিত হইত। আরও বহু বছর আগে ব্রহ্মপুত্র পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশে নামিয়া পশ্চিম দিকে সুদীর্ঘ পথ চলিয়া সিন্ধু নদীর সহিত গিয়া মিলিত হইত। এই প্রাচীন নদীর নাম বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ প্যাসকো রাখেন ইন্দোব্রহ্ম। ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে বর্তমান ব্রহ্মপুত্রের গতিপথকে পশ্চিমদিকে কিছুদূর লইয়া গিয়া গঙ্গার সহিত মিলন করিয়া দিবার

যে প্রস্তাব ডঃ কে. এল. রাও করিয়াছিলেন তাহাকে কার্যে পরিণত করিতে পারিলে পশ্চিমবঙ্গের জলকষ্টের অনেকটা লাঘব হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অবশ্য ইহার জন্য প্রচুর খরচ হইবে; কয়েক জায়গায় সুড়ঙ্গ কাটিয়া নদীর গতিপথকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মত ধনী দেশে আর্দ্র মিসিসিপি অববাহিকার জলকে পশ্চিম দিকে পাহাড় পর্বতকে ভেদ করিয়া শুষ্ক ক্যালিফোর্ণিয়া রাজ্যে লইয়া যাওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। সোবিয়েৎ ইউনিয়নে সাইবেরিয়ায় উত্তর প্রবাহিনী নদী ইয়েনিসি, ওব ও লেনার গতিপথ দক্ষিণ-দিকে ঘুরাইয়া জনবহুল কৃষিপ্রধান অঞ্চলে জলসেচের ব্যবস্থা করার কথা চলিতেছে।

ভারতের মত কৃষিপ্রধান দেশে নদীর গতিপথকে আবশ্যক হইলে ঘুরাইয়া জলসেচের সম্যক ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী কয়েক বছর আগে এক কমিশন গঠন করেন এবং নদী সংক্রান্ত নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন উপত্যকার নদীগুলির গতিপথ দেখাইয়া কয়েকটি মানচিত্র তৈরী করিবার ভার আমাকে দেন। এই মানচিত্রগুলির মধ্যে কয়েকটি আমি আপনাদের জ্ঞাতার্থে আলোচনা করিতেছি।

প্রথম মানচিত্রে ভারতের প্রধানত ১৪টি নদীর অববাহিকা দেখান হইয়াছে। উত্তর ভারতের —গঙ্গা সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র, মধ্যভারতের সাবরমতি, মাহি, নর্মদা, তাপ্তি, সুবর্ণরেখা, ব্রাহ্মণী ও মহানদী এবং দক্ষিণ ভারতের গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী ও পেন্নার। ইহাদের মধ্যে গঙ্গার অববাহিকা সবচেয়ে বড়। ভারতের মধ্যে প্রবাহিত সিন্ধুনদীর অববাহিকা অপেক্ষা প্রায় ২½ গুণ, ভারতের মধ্যে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকা অপেক্ষা ৪½ গুণ, মধ্যভারতের সাতটি নদীর অববাহিকার মোট আয়তন অপেক্ষা ২ গুণ, এবং দক্ষিণ ভারতের গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী ও পেন্নার এর মিলিত আয়তন অপেক্ষাও বড়।

২নং মানচিত্রে গঙ্গা অববাহিকার নদীগুলির গতিপথ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য আরও বিশদভাবে দেখান হইয়াছে। প্রথমতঃ দেখা যায়, উত্তর প্রদেশে গঙ্গার অববাহিকার বেশীর ভাগ অংশ অবস্থিত, শতকরা ৩৪·২ ভাগ, মধ্যপ্রদেশে প্রায় এক চতুর্থাংশ, বিহারে প্রায় এক পঞ্চমাংশ, রাজস্থানে শতকরা ১৩ ভাগ এবং পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ৮ ভাগ।

গাঙ্গেয় সমভূমি ঃ উত্তরপ্রদেশ

গঙ্গা ও হিমালয় হইতে আসা তাহার পাঁচটি উপনদী—যমুনা, রামগঙ্গা, সারদা, গোমতী, ঘর্ঘরা ও গণ্ডক ও মধ্যভারত হইতে আসা শোন নদী উত্তর প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। গঙ্গা বেসিনের মধ্য দিয়া প্রবাহিত ৪৩২০০ কোটি কিউবিক মিটার জলের ৩০, ৮০০ কোটি কিউবিক মিটার জল উত্তর প্রদেশের জলসম্পদ হিসাবে ধরা যাইতে পারে। এলাহাবাদে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে যমুনা আসিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে পলিতে ভরা গঙ্গার ঘোলাজল ও যমুনার পরিষ্কার নীল জলের পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। এই দুইটি নদীর খাতের চেহারা বিভিন্ন। গঙ্গার খাতের মধ্যে ও তীরে বালির চড়া ও নদীর জল বেণীবন্ধনের মত পরস্পরের সঙ্গে জড়ানো। ইংরাজীতে ইহাকে ব্রেডেড নদী বলে। কিন্তু যমুনার খাতের দুকূল ভরিয়া জল সবসময় প্রবাহিত হয়। নদীর মধ্যে বালির চড়া কখনও পড়ে না। গঙ্গা-যমুনার দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল, দোআব, উত্তর প্রদেশের একটি বিশেষ প্রগতিশীল অঞ্চল। দিল্লী শহর ও তৎসংলগ্ন গ্রামাঞ্চলকে

লইয়া একটি কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল গঠিত হইলেও ইহা প্রকৃতপক্ষে গঙ্গা-যমুনা দোআবের অংশ বিশেষ। যমুনার জল বাড়িলে নয়াদিল্লীর যমুনার তীরে রাস্তায় জল উপচাইয়া পড়ে। গঙ্গা ও যমুনার দুই তীরে নূতন পলিমাটি, স্থানীয় নাম খাদড়, নদী হইতে একটু দূরে উঁচু জমি; স্থানীয় নাম ভাঙ্গড়। ভাঙ্গড় ভূমি গঙ্গা-যমুনার অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহাকে ধাপে ধাপে কাটিয়া ও জলসেচের বন্দোবস্ত করিয়া প্রচুর খাদ্য শস্য উৎপন্ন করা হয়। বিশেষতঃ গম ও ধান। গঙ্গা-যমুনা দোয়াবে ভারতের ছয়টি প্রসিদ্ধ শহর অবস্থিত, দিল্লী; কানপুর; আগ্রা, এলাহাবাদ, আলিগড় ও মথুরা।

খাল কাটিয়া জলসেচের এত ভাল বন্দোবস্ত এই রাজ্যের মত হয়তো অন্য কোন রাজ্যে করা হয় নাই—এখানকার পাঁচটি খালের জলে—প্রায় ২০ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ করা হয়।

গাঙ্গেয় সমভূমি : বিহার

ছাপরার কাছে গঙ্গা বিহারে প্রবেশ করে, ঐ স্থানে ঘর্ঘরা উহার উত্তর তীরে আসিয়া মিলিত হয়। নেপালের এক হিমবাহ হইতে ঘর্ঘরা উঠিয়াছে। ছাপরা ও পাটনার মধ্যে উত্তর দিক হইতে গন্ডক ও দক্ষিণ দিক হইতে শোন গঙ্গার সহিত মিলিত হয় গণ্ডকের উৎপত্তি নেপাল হিমালয়ে; সাতটি নদী মিলিয়া গণ্ডকের উদ্ভব হওয়ায় ইহা নেপালে সপ্তগন্ডকী নামে পরিচিত। শোন নদীর উৎসমুখ মধ্যপ্রদেশে বিন্ধ পর্বতে। শোননদী বৃষ্টির জলে পুষ্ট বলিয়া গ্রীষ্মকালে জল থাকে না। হিমালয়ের দক্ষিণ ঢাল হইতে আসিয়া চারটি নদী—বুড়ী গন্ডক, বাগমতী; কমলা ও কোশি আসিয়া পাটনা ও মণিহারীঘাটের মধ্যে গঙ্গার সহিত আসিয়া মিলিত হয়। ইহাদের মধ্যে কোশি প্রধান; নেপালের তিনটি নদী—সন কোশি, অরুণ ও তামুর মিলিয়া বিহারে আসিয়া প্রবেশ করে। এই নদীটির গতিপথ বিহারে প্রায়ই পরিবর্তিত হয়। সে কথা আগেই বলা হইয়াছে। ফলে বন্যায় বহু গ্রামের ক্ষতি হয়। পরে মহানন্দা দার্জিলিং হিমালয় হইতে আসিয়া বাম তীরে গঙ্গার সহিত মিলিত হয়। নদী কর্তৃক আনা বিহারের জল সম্পদ প্রায় ৩৬০০ কোটি কিউবিক মিটার,—ইহার অর্ধেক জল হিমালয়ের পাঁচটি নদী—কোশি, গন্ডক, কমলা, মহানন্দা ও বাগমতী; বহন করিয়া আনে বাকী অর্ধেক মধ্যভারত হইতে ৯টি নদী লইয়া আসে—কর্মনাশা শোন, পুনপুন, কিউল, বাদুরা, চন্দন, বেরুয়া, ভেলা ও কোয়া। বিহারে জলসেচের পরিকল্পনার কার্য চলিতেছে—গন্ডক পরিকল্পনা নেপালের সহযোগিতায় আরম্ভ করা হইয়াছে। ইহার খরচ পড়িবে প্রায় ১৬০ কোটি টাকা। তাহার বেশীর ভাগ ১২০ কোটি টাকা বিহার দেবে। কোশি পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে ১১০ কোটি হেক্টর জমিতে জলসেচ করা হইবে আশা করা যায়। এছাড়া ২০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইবে। তাহার অর্ধেক নেপাল পাইবে।

উত্তর বিহারে নদীতে প্রায়ই বন্যা নামে। তাহাতে দেশের প্রভূত ক্ষতি হয়, চাষের জমি নষ্ট হইয়া যায়, বহু লোক ও গবাদি পশু প্রাণ হারায়। উত্তর বিহারে গাঙ্গেয় ভূমির তিনটি অঞ্চল বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় বুড়ীগণ্ডক ও ঘর্ঘরার মধ্যবর্তী অঞ্চল, বুড়ীগণ্ডক ও কোশি নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল, কোশি অঞ্চল—(ভুটাহি বলন ও মহানন্দার মধ্যবর্তী অঞ্চল।

মধ্যপ্রদেশে গাঙ্গেয় অববাহিকার দক্ষিণাংশ ঃ

মধ্য ভারতের সব নদী ও তাহাদের শাখা মধ্যপ্রদেশের কোন না কোন অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয় ইহাদের মধ্যে বিন্ধ্যপর্বত হইতে নির্গত চম্বল ও বেতোয়া যমুনায় আসিয়া পড়ে এবং শোন গঙ্গার দিকে প্রবাহিত হয়। এখানকার সব নদীগুলি বৃষ্টির জলে পূর্ণ হয়, কাজেই বর্ষাকালে নদীতে প্রচুর জল থাকে। কিন্তু জানুয়ারী হইতে মে মাস পর্যন্ত নদীগুলিতে জল খুবই কম থাকে। মধ্যপ্রদেশে যমুনার পাঁচটি শাখা নদী চম্বল, পার্বতী, সিন্ধ, বেতোয়া ও কেন, ১৮৭,০০০ বর্গ কিলোমিটার স্থানের উপর দিয়া প্রবাহিত হয় এবং গড়ে বার্ষিক ৪০০০ কোটি কিউবিক মিটার জল বহন করিয়া চলে ; গঙ্গার তিনটি শাখা নদী—টোনস্, শোন ও রিহাবন ৫৬৬০০ বর্গ কিলোমিটার স্থানের উপর দিয়া প্রবাহিত হয় এবং গড়ে বার্ষিক ।২৮৪০ কোটি কিউবিক মিটার জল বহন করিয়া চলে। মধ্যপ্রদেশে গঙ্গা ও যমুনার শাখা নদীগুলি হইতে প্রায় ৭০০০ কোটি কিউবিক মিটার জলের কতকাংশকে নানাভাবে কাজে লাগান সম্ভবপর। তাহার জন্য কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে।

রাজস্থানে গাঙ্গেয় অববাহিকা ঃ

রাজস্থানের পূর্বাংশে আরাবল্লী পর্বতের পূর্বদিকে প্রায় ৮৬ হাজার বর্গ কিলোমিটার স্থানের জল চম্বল ও তাহার চারটি উপনদীর ভিতর দিয়া যমুনায় আসিয়া পড়িতেছে। কালিসিন্ধঃ পারওয়ান ও পার্বতী চম্বলের ডান তীরে, এবং বনাস তাহার চারটি উপনদীকে লইয়া—খাড়ি, মাসি, মোরেন ও রোচ, চম্বলের বাম তীরে আসিয়া পড়িতেছে। রাজস্থানের মত শুষ্ক রাজ্যে নদীর জলকে ভালভাবে কাজে লাগাইবার প্রচেষ্টা চলিতেছে, ইহাদের মধ্যে চম্বলের উপর গঙ্গাসাগর বাঁধ ও কোটার কাছে আড় বাঁধ প্রধান। আশা করা যায় যে কোটা ও বুন্দি জেলার প্রায় ২ লক্ষ হেক্টর কৃষিজমি এখন চম্বলের জল পাইবে। এ ছাড়া, গান্ধী-সাগরের জল বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র হইতে ১ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইতেছে।

হরিয়ানায় গাঙ্গেয় অববাহিকার জল ঃ

গাঙ্গেয় অববাহিকার প্রায় ৩২ হাজার কিলোমিটার ভূভাগ হরিয়ানার মধ্যে অবস্থিত। যমুনার জল হরিয়ানার প্রধান জল সম্পদ। পূর্ব ও পশ্চিম যমুনা খাল তাজেওয়ালার নিকট হইতে বহির্গত হইয়া হরিয়ানার অধিকাংশ স্থানে বিশেষতঃ কর্ণাল, জিন্দ ও হিসার জেলায় জলসেচের জন্য জল সরবরাহ করিতেছে। পশ্চিম যমুনা খালের একটি শাখা কর্ণাল শহর হইয়া ভারতের রাজধানী দিল্লী শহরের দিকে প্রসারিত হইয়া আছে।

গঙ্গা, যমুনার এতগুলি উপনদীর জল বহন করিয়া গঙ্গা রাজমহল পাহাড়ের গায়ে প্রতিহত হইয়া ধুলিয়ানের কাছে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে—এক অংশ ভাগীরথী নাম লইয়া পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়, এবং সাগর দ্বীপের পার্শ্বে বঙ্গোপসাগরে আসিয়া পড়ে ও অপর অংশ পদ্মা নাম লইয়া দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বাংলাদেশের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। ব্রহ্মপুত্রের (অধুনা যমুনা) সহিত রাজবাড়ীর নিকট ইহা প্রথমে মিলিত হয়, পরে দক্ষিণ-

পূর্বদিকে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া কীর্তিনাশার পথ ধরিয়া মেঘনার সহিত আসিয়া মিলিত হয়। পদ্মা-মেঘনা সঙ্গমের পর যুক্ত নদী মেঘনা নামে পরিচিত।

ভাগীরথী, গঙ্গা-পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা একত্রে পশ্চিমবঙ্গে ও বাংলাদেশে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ সৃষ্টি করিয়াছে।

গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ ঃ

গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্বের মূলে রহিয়াছে গঙ্গার ভূমি গঠনের অসীম ক্ষমতা ও ইহার সহিত গঙ্গার ঘন ঘন দিক পরিবর্তন জড়িত রহিয়াছে। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গা এক সময় সাগরে আসিয়া পড়িত। এখনও প্রতি বৎসর মকর সংক্রান্তিতে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় আবাল-বৃদ্ধবণিতা ধর্মের টানে ভারতের দূর-দূরান্ত হইতে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে স্নান করিতে ছুটিয়া আসে। সত্য বটে, আদিগঙ্গা আজ একটি ক্ষীণকায় নদীতে পরিণত হইয়াছে, এমন কি তাহার মহান নাম হারাইয়া কালীঘাটের মন্দিরের পাশ দিয়া 'টালার নালা' নামে সাধারণের কাছে পরিচিত। ইহার শেষপ্রান্ত সাগরদ্বীপ এখনও কোনরকমে বাঁচিয়া আছে, মোহানার তীরে গঙ্গাসাগরের মেলার জন্য স্থান সংরক্ষিত আছে, কাছেই কপিলমুনির মন্দির। এইভাবে গঙ্গার মহিমা ও পবিত্রতা অক্ষুন্নভাবে প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। গঙ্গা তাহার দিক পরিবর্তন করাকালীন পলি দিয়া একটি ত্রিভুজাকৃতি ভূমি গঠন করে; ইহার সহিত আমাদের বর্ণমালার ব-এর আকারের সাদৃশ্য থাকায় ইহাকে ব-দ্বীপ বলে। বড় বড় নদী তাহাদের মোহনার কাছে এই ধরনের দ্বীপ সৃষ্টি করিতে পারে সেকথা প্রায় ২৫০০ বছর আগে বিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোড্যাটস প্রথম বলেন। তিনি মিশরের নাইল নদীর মোহানার কাছে ত্রিভুজাকৃতি নূতন দ্বীপ কিভাবে সৃষ্ট হইতেছে, তাহা দেখিয়া উহার নামকরণ করেন ডেল্টা, কারণ উহা গ্রীক বর্ণমালার চতুর্থ অক্ষর ডেল্টার মত দেখিতে। তিনি নাইল ডেল্টার ভূ-দৃশ্যের বর্ণনা করিয়া দেখান যে প্রাচীন ভূমধ্যসাগরের তলা হইতে নাইল নদী দ্বারা বাহিত পলি দ্বারা ঐ ব-দ্বীপ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। নাইল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নদী, দৈর্ঘ্য ৬৩৫০ কিলোমিটার। কিন্তু ভূমধ্যসাগরের কাছাকাছি আসিয়া উহার গতিবেগ অনেক কমিয়া যায়, তখন তাহার বিপুল জলরাশি একটি খাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না, চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং কালক্রমে কয়েকটি নূতন খাত সৃষ্টি করিয়া তাহাদের মধ্য দিয়া সাগরে আসিয়া পড়ে।

খ্রীষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীতে গ্রীক ভৌগোলিক স্ট্রাবো নাইল ডেল্টাকে আরও বিশদভাবে বর্ণনা করেন; এবং তাঁহার বিবরণী হইতে বোঝা যায় যে নাইলের ব-দ্বীপের সহিত আমাদের গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের বহু বিষয়ে সাদৃশ্য আছে, গঙ্গা তাহার বিপুল জলরাশি ও পলিমাটি লইয়া বিহার হইতে পশ্চিমবঙ্গের দিকে অগ্রসর হইবার সময় সাহেবগঞ্জের কাছে রাজমহল পাহাড়ের ধাক্কা খাইয়া দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ঘুরিয়া যায়, সেকথা আগে বলা হইয়াছে। ইহার পরে তাহার গতিবেগ অনেক কমিয়া যাওয়ায় নদীবক্ষে চড়া (ব-দ্বীপ) পড়িতে আরম্ভ করে। ইহাই ব-দ্বীপ গঠনের প্রথম সূচনা। আরও ১০০ কিলোমিটার বিহার-পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত ধরিয়া তাহার প্রাচীন ব-দ্বীপের প্রান্ত দিয়া গঙ্গা তাহার নূতন সৃষ্ট ব-দ্বীপের মধ্যে প্রবেশ করে। অর্থাৎ নূতন ব-দ্বীপের আরম্ভ পশ্চিমবঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলায় জঙ্গিপুরের ১৫ কিলোমিটার উত্তরে

ধুলিয়ান বা ফারাক্কার সন্নিকটে। এখানে গংগা দুই ধারায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে—ভাগীরথী; ও গংগা (পদ্মা)।

গঙ্গার প্রাচীন ধারা ভাগীরথী দক্ষিণ দিকে পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়া প্রায় ৫২০ কিলোমিটার পথ চলার পর কলিকাতার প্রায় ১১০ কিলোমিটার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে আসিয়া পড়িয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে গংগার প্রথম বিভাজিকা নদী—জলাংগী মুর্শিদাবাদ জেলার পূর্বপ্রান্তে গঙ্গা হইতে বহির্গত হইয়া আঁকাবাঁকা পথে গাংগেয় ব-দ্বীপের প্রাচীন ভূভাগের উপর দিয়া নবদ্বীপের কাছে ভাগীরথীর সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ইহার পর হইতে ভাগীরথীকে হুগলী নদী বলা হয়। কারণ হুগলী ছিল পোর্টুগীজদের প্রধান নৌ-ঘাটি, যদিও জনসাধারণের কাছে গংগা নামই প্রিয়। পশ্চিমদিক হইতে যে কয়টি নদী ভাগীরথী হুগলীর সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অজয় দামোদর ও রূপনারায়ণ প্রধান। হুগলী-রূপনারায়ণ সংগমের পর ডায়মণ্ডহারবারের নিকট গংগার জল স্ফীত হইয়া বক্রাকারে বংগোপসাগরের দিকে চলার পথে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়—হুগলী ও মুড়িগংগা এবং মোহনার কাছে গাংগেয় ব-দ্বীপের আধুনিকতম দ্বীপ, সাগর-দ্বীপ গঠিত হইয়াছে. ইহার আকার স্পষ্টই ব-এর মত।

গংগার অপর-ধারা বয়সে নবীন হইলেও কার্যতঃ গংগার প্রধান ধারায় বর্তমানে পরিণত হইয়াছে। ইহা এখন গংগার অধিকাংশ জল বহন করিয়া মুর্শিদাবাদ-রাজশাহী জেলার সীমান্ত বরাবর প্রায় ১০০ কিলোমিটার চলার পর বাংলাদেশের মধ্যে প্রবেশ করে, এবং আরও পূর্বদিকে প্রায় ২২০ কিলোমিটার চলার পর গোয়ালন্দের কাছে তিব্বতের মানস সরোবরের নিকটস্থ একটি হিমবাহ হইতে নিঃসৃত ব্রহ্মপুত্রের (সাংপো) সহিত মিলিত হয়। এই সংগমের পর গংগাকে পদ্মা নাম দেওয়া হইয়াছে। পদ্মা প্রায় ১২৫ কিলোমিটার পূর্বদিকে চলার পর চেরাপুঞ্জির বৃষ্টি জলে পুষ্ট মেঘনার জলরাশির সহিত আসিয়া মিলিত হয় এবং দক্ষিণদিকে বংগোপসাগরে গিয়া পড়ে। গংগা-পদ্মার দৈর্ঘ্য বাংলাদেশে মাত্র ৩২৩ কিলোমিটার, ভারতে প্রবাহিত গঙ্গার দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অনেক কম, মাত্র এক দশমাংশ ; এই কথা ভারত ও বাংলাদেশের প্রাপ্য গংগাজলের পরিমাণ নির্ধারণ করিবার জন্য এই দুই দেশের প্রতিনিধিদের মনে রাখিতে হইবে। বাংলাদেশে গংগা-পদ্মা হইতে পাঁচটি উল্লেখযোগ্য জল বিভাজিকা নদী বাহির হইয়া বাংলাদেশের দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইতেছে ; মাথাভাংগা, ভৈরব, কপোতাক্ষী, গড়াই, (মধুমতী) ও আড়িয়াজল খাঁ।

গংগা ব-দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত সাগর দ্বীপের পশ্চিমে প্রবাহিত হুগলী নদীর পশ্চিম তট হইতে দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত বাংলাদেশের নোয়াখালি জেলায় মেঘনা নদীর পূর্ব তট পর্যন্ত ছোট বড় বহু দ্বীপ তাহাদের স্বাতন্ত্র বজায় রাখিয়া অবস্থান করিতেছে। *বঙ্গোপসাগরের তীর বরাবর ইহাদের একটানা দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০০ কিলোমিটার।* ত্রিভুজাকৃতি গাংগেয় ব-দ্বীপের ইহাকে 'ভূমি' (base) হিসাবে ধরা যাইতে পারে। গাংগেয় ব-দ্বীপের শীর্ষভাগ ফারাক্কা হইতে ব-দ্বীপের ভূমির উপর ৩০০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি লম্ব টানিলে ত্রিভুজাকার গাংগেয় ব-দ্বীপের আয়তন দাঁড়ায় ($\frac{1}{2}$ × ৪০০ × ৩০০) = ৬০,০০০ বর্গকিলোমিটার। পৃথিবীর ২৭টি বড় ব-দ্বীপের মধ্যে গাংগেয় ব-দ্বীপ-যে আয়তনে সব চেয়ে বড় তাহা ভূগঠনবিদেরা স্বীকার করিয়াছেন।

গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের মধ্যে প্রবাহিত গঙ্গার বিভাজিকা ও সহকারী নদীগুলির মাত্র কয়েকটির এখনও বঙ্গোপসাগরের সহিত যোগাযোগ আছে। জলের অভাবে অধিকাংশ নদী গঙ্গা-পদ্মা হইতে বাহির হইয়া মাঝপথে শুকাইয়া যায় এবং মোহানার কাছে বঙ্গোপসাগর হইতে জোয়ারের জল দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নোনাজলে চারিদিক প্লাবিত করিয়া ফেলে। পশ্চিমবঙ্গে ও বাংলাদেশে সুন্দরবন অঞ্চলে গঙ্গার ১৫টি মোহনার মধ্যে আটটি পশ্চিমবঙ্গে- হুগলী, মুড়িগঙ্গা, সপ্তমুখী, ঠাকুরুন বা জামিরা, মাতলা, গোসবা হড়িয়াভাঙ্গা রায়মঙ্গল ও সাতটি বাংলাদেশে—মালঞ্চ, কুনগা, পাসুর, বাঙ্গরা, হরিণঘাটা, বুড়ীশ্বর, ও রবুনাবাদ সমুদ্রের খাঁড়িমত দেশের অভ্যন্তরে কিছুদূর পর্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে। এতগুলি মোহানা, পরস্পরের সহিত জড়াজড়ি করিয়া থাকায় সুন্দরবনের চারিদিকে জল থইথই করে। স্ট্রাবোর সময় নাইল নদীর মাত্র সাতটি বিভাজিকা নদী ছিল। এখন পাঁচটি খাতকে বন্ধ করিয়া নাইলের জলকে মাত্র দুইটি খাতের মধ্য দিয়া—রোজেটা ও ডামিয়েটা—বাহির করিয়া দেওয়া হইতেছে; ফলে জলপথ ও কৃষিকার্য হিসাবে নাইল ডেলটার অনেক উন্নতি সাধন করা হইয়াছে। ঐভাবে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের উন্নয়ন করিতে পারিলে সুন্দরবনের আগেকার চেহারা ফিরাইয়া আনিতে পারা যাইবে। একসময় সুন্দরবন সত্যই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর ছিল। ঘন বসতিপূর্ণ গ্রামের আশেপাশে পরিপাটিভাবে সাজান গাছপালা সুন্দরবনের বৈশিষ্ট্য ছিল। পরে কতকটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে আর কতকটা মানুষের নিজ দোষে সুন্দরবনের আজ এই দুর্দশা। মূল্যবান গাছের বদলে সুঁদরি গাছের প্রাধান্য দেখা যায়। সুঁদরি গাছ হইতে এই অঞ্চলের নাম সুন্দরবন হইয়াছে একথার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।[১]

পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের বহুস্থান ঘুরিয়া দেখি—গ্রামাঞ্চলে ভাল ভাল গাছ কাটিয়া, আর নদীর চারিদিকে ক্ষণভঙ্গুর বাঁধ দিয়া চাষবাসের কাজ আরম্ভ করা হয় কিন্তু সে বাঁধ বেশী দিন টেঁকে নাই। উপরন্তু নদী পলিমাটি ফেলিয়া নীচু জমিকে উঁচু করিবার প্রয়াসে বাধা পায়। এইভাবে সুন্দরবনের বহু অঞ্চল মনুষ্যবাসের অযোগ্য হইয়া পড়ে।[২]

অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে প্রায় ৪ লক্ষ হেক্টর জমি এখনও সুন্দরবনের গভীর জঙ্গল অধিকার করিয়া আছে; অধিকাংশ সংরক্ষিত ও কিছুটা সুরক্ষিত। এই বন হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ৮০ হাজার কিউবিক মিটার মূল্যবান কাঠ ও প্রায় ১ লক্ষ কিউবিক মিটার জ্বালানি কাঠ কাটা হয়; ইহা বিক্রয় করিয়া বন বিভাগের প্রায় ১০ লক্ষ টাকা আয় হয়। সমুদ্রের ধারে ও বড় নদীর তীরে গেঁয়ো গাছের অধিকাংশ শিকড় মাটির উপরে থাকে। সুন্দরবন হইতে গোলপাতা, মধু, বাঁশ ও মোম সংগ্রহ করা হয়। জমির উপরে আগাছা ও ঝোপঝাড় এবং ঘন ঘাস থাকায় সূর্যের কিরণ সুন্দরবনের মধ্যে বিশেষ প্রবেশ করিতে পারে না। সদ্য উন্মুক্ত জমি ধান চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সুন্দরবনের উত্তরে খাল কাটিয়া জল নিকাশের ভাল বন্দোবস্ত করিতে পারিলে আমন, আউশ

১. Encyclopaedia geomorphology, 1967.

২. Land utilisation in the District of 24 Parganas, Bengal. B. C. Law Volume, Part 2, 1946.

বোরো তিন প্রকার ধান উৎপন্ন করা সম্ভবপর। হুগলী-মাতলা দোআব এই প্রকার কৃষি প্রধান অঞ্চল। ইহার পূর্বদিকে খাল, বিল নদী হইতে প্রচুর মাছ ধরিবার সুযোগ আছে। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের উত্তরাংশে ও ভাগীরথীর পূর্বতীরে অবস্থিত অঞ্চল—গঙ্গা ইহার উত্তর ও পূর্ব দিক দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এখন বঙ্গোপসাগর হইতে জোয়ারের জল এখানে প্রবেশ করিতে পারে না। কাজেই ব-দ্বীপের গঠন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই অঞ্চলে নূতন পলিমাটি প্রতি বৎসর বর্ষাকালে জমে ও কৃষিজমির উর্বরতা অক্ষুণ্ণ রাখে, ফলে প্রচুর পরিমাণে আমন ধান জন্মে। গবাদি গৃহপালিত পশুর সংখ্যা এখানে বেশী, তবে তৃণভূমির অভাব। গঙ্গার উত্তরে মালদহ জেলায় মহানন্দার পূর্ব তীরে গঙ্গার পুরাতন ব-দ্বীপের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়; ইহার নাম বরেন্দ্রভূমি, চলতি কথায় বারিন্দ। ছোট ছোট টিলা ও ঢেউখেলানো পলি পুরাতন ব-দ্বীপের বৈশিষ্ট্য।

পশ্চিমবঙ্গের মত বাংলাদেশে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ তিন ভাগে বিভক্ত ঃ (১) সক্রিয় ব-দ্বীপ—ধলেশ্বরী পাবনা দোআব এবং উপকূলবর্তী দ্বীপগুলি—পশ্চিমে খুলনা জেলায় পুসুর নদী হইতে পূর্বদিকে চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপ পর্যন্ত প্রসারিত। (২) পূর্ণাঙ্গ ব-দ্বীপ—বঙ্গোপসাগরের উপকূল হইতে উত্তরদিকে প্রসারিত হইয়া প্রায় ৮ হাজার বর্গকিলোমিটার স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে। ইহার মধ্যে সুন্দরবন ও আবাদী জমি ধরা হয়। দক্ষিণ খুলনা ও দক্ষিণ-পশ্চিম বাকরগঞ্জ জেলার ছোট ছোট নদীগুলি পরস্পরের সহিত কোথাও এক হইয়া আর কোথাও পৃথকভাবে বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইতেছে। (৩) মধ্য ব-দ্বীপ—গঙ্গা ব-দ্বীপের মধ্যভাগে ফরিদপুর জেলায় ছোট ছোট হ্রদ মধ্য ব-দ্বীপের চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে।

পশ্চিমবঙ্গের মত বাংলাদেশে পুরাতন ব-দ্বীপের এক অংশ মধুপুরের জঙ্গলা ভূমিতে (এখন মধুপুর জাতীয় উদ্যান বলিয়া পরিচিত) আর দুইটি অংশ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যস্থিত রাজসাহী জেলায় বরেন্দ্রভূমিতে ও ত্রিপুরা জেলায় দেখা যায়। ১৯৪৮ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে অবিভক্ত বাংলা বিশেষ করিয়া গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 'মানচিত্রে বাংলাদেশ'—পুস্তকে এই সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করি। পরে ইহার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে প্রকাশিত হয়। সেই সময়ে আঁকা এক মানচিত্র দেখিলে স্পষ্টই বোঝা যাইবে যে সুন্দরবনের এক ক্ষুদ্র অংশ ভারতের মধ্যে রাখা হয়। উহার সহিত বাংলাদেশের সুন্দরবনকে একত্র উন্নয়নের পরিকল্পনা না করিতে পারিলে সুন্দরবনের সমস্যা থাকিয়া যাইবে। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের প্রধান সমস্যা জলের অভাব আর বাংলাদেশের সুন্দরবনে জমি এতই সমতল যে জলের অভাব অপেক্ষা জল নিকাশের ব্যবস্থা প্রধান সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সারা ব-দ্বীপের বিচ্ছিন্ন মোহানাতে সংস্কার করিবার এক আন্তর্জাতিক পরিকল্পনার কথা ভাবা উচিত।

গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ ও গাঙ্গেয় সমভূমির উৎপত্তি ও বর্তমান প্রাকৃতিক ঘটনার উপর তাহার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া আমার বক্তৃতা শেষ করিব। প্রথমতঃ, গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ আজ গাঙ্গেয় সমভূমির এক অচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া ধরা হইলেও উহাদের সৃষ্টির মূলে দুইটি বিভিন্ন প্রাকৃতিক আধার ছিল—গাঙ্গেয় বেসিন ও বঙ্গীয় বেসিন;

এই দুইটি বেসিনকে আগ্নেয় পাথরে গঠিত রাজমহল পাহাড় যুগ যুগান্তর ধরিয়া পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল। বঙ্গীয় বেসিনের উত্তরে মেঘালয় ও পূর্বদিকে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পাহাড় ছিল। ইহার মধ্যে সঞ্চিত বালি, মাটি ও পাথরচূর্ণ এক ভিন্ন প্রকৃতির সমতল সৃষ্টি করে যাহার উপর পরে গঙ্গার পলি আসিয়া গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের সূচনা করে। মূল গাঙ্গেয় সমভূমিতে ওপর থেকে নীচে বহুদূর পর্যন্ত একই উপাদানে গঠিত পলি পাওয়া যায়; ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে এখানে পলি ধীরে ধীরে বহুদিন ধরিয়া বসিয়া যাইতেছে, এবং ভারসাম্য (isostatic equilibrium) রাখিবার জন্য উত্তরে হিমালয় একটু একটু করিয়া উপরে উঠিতেছে এবং ইহাতে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ উত্তর ভারতে মধ্যে মধ্যে ভূমিকম্প হওয়া স্বাভাবিক।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রদত্ত নির্মলকুমার বসু স্মারক বক্তৃতা, ১৩৮৭

ঊনবিংশ শতকে ফ্রান্সে রামমোহন-চর্চা

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

[পাশ্চাত্য সারস্বত সমাজে রামমোহনের খ্যাতির প্রসার শুরু হয় ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। এই বছর তাঁর বাংলা গ্রন্থ 'বেদান্তসার' (১৮১৫)-এর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় কলিকাতা থেকে ; এবং জার্মান অনুবাদও মুদ্রিত হয় জেনা (Jena) থেকে। এর পরবৎসর রামমোহনের সরকারী মনিব ও অনুরাগী বন্ধু জন ডিগবী 'বেদান্তসার'-এর ইংরেজি অনুবাদ ও (রামমোহন কৃত) 'কেনোপনিষৎ'-এর ইংরেজী অনুবাদের (প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮১৬) এক মিলিত সংস্করণ দীর্ঘ ভূমিকাসহ লণ্ডন থেকে প্রকাশ করেন।[১] ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মবাদ-সংক্রান্ত এই গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশে-বিদেশে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। সমসাময়িক 'গভর্ণমেণ্ট্ গেজেট,' 'ক্যালকাটা মন্থলি জার্নাল,' লণ্ডনস্থ 'মিশনারী রেজিস্টার,' 'এসিয়াটিক জার্নাল' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় তার যথেষ্ট নিদর্শন ছড়িয়ে আছে।[২] গ্রন্থপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রামমোহন তাঁর মতানুবর্তীদের নিয়ে একটি সংস্থা গঠন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় স্থাপন করেন 'আত্মীয় সভা।' পাশ্চাত্য সুধীসমাজ যেমন রামমোহনের গ্রন্থের মাধ্যমে উপনিষদ বা বেদান্তদর্শন সম্পর্কে কৌতূহলী হতে আরম্ভ করলেন তেমনি রামমোহনের ব্যক্তিগত জীবন ও তার প্রতিষ্ঠিত সংস্থা সম্পর্কেও স্বভাবতঃ তাঁদের মনে জিজ্ঞাসার উদয় হল। এই কারণে দেখা যায় মোটামুটি ১৮১৬ থেকে ১৮২০র মধ্যে চিন্তাশীল ও শিক্ষিত ইউরোপীয় সমাজে এই ভারতীয় মনীষী ও সংস্কারক সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ করবার একটি ক্রমবর্ধমান আগ্রহ ও প্রচেষ্টা। এই উদ্যম কেবলমাত্র ইংলণ্ডে বা ইংরেজিভাষী জগতে (যেমন আমেরিকায়) সীমিত থাকে নি, ইউরোপ খণ্ডে (Continent of Europe) ও ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করেছিল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে ফ্রান্সেই এই অনুসন্ধিৎসার সর্বাধিক নিদর্শন পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে আমি তৎসাময়িক ফরাসী পত্রিকা থেকে এই জাতীয় দুটি নিবন্ধের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছি। এর মধ্যে প্রথমটি আদৌ প্রকাশিত হয় ফরাসী এসিয়াটিক সোসাইটির (Socie'te' Asiatique) মুখপত্র 'জুর্ণাল আসিয়াতিক্' (*Journal Asiatique*)-এর অক্টোবর ১৮২৩ সংখ্যায়, লেখক ম. লাজুয়ানে ;[৩] অপরটি রামমোহনের গ্রন্থাবলীর উপর ম. পাথিয়ে লিখিত এক সমালোচনা-প্রবন্ধ—মুদ্রিত হয়েছিল 'রেভ্যু আঁসিক্লোপেদিক্' (*Revue Encyclopedique*)-এর ডিসেম্বর ১৮৩২ সংখ্যায়)।[৪] দুটি প্রবন্ধই রামমোহনের জীবদ্দশায় রচিত। কিন্তু যতদূর জানা যায় ফ্রান্সে সর্বপ্রথম ছাপার অক্ষরে রামমোহন সংক্রান্ত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল উক্ত দুটি প্রবন্ধেরও পূর্বে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে। সম্ভবতঃ ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভে কলিকাতার তদানীন্তন *The Times* পত্রিকার সম্পাদক ম. দা'কোস্তা তাঁর নিজের রচিত রামমোহনের এক সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী ও তৎসহ রামমোহনের কয়েকখানি গ্রন্থ ব্লোয়া (Blois)-র বিশপ আবে গ্রেগোয়ারকে পাঠিয়ে

দেন। এই তথ্যাদি ও গ্রন্থাবলীর ভিত্তিতে উক্ত ধর্মযাজক রামমোহনের জীবন ও কীর্তি-কাহিনী-সংক্রান্ত এক পুস্তিকা ফরাসী ভাষায় সংকলন করে প্রচার করেন। এই পুস্তিকাটি ১৮১৯-এ তৎকালীন ফরাসী সাময়িক পত্র 'লা ক্রোণিক্ রেলিজিউজ' (*La Chronique Religieuse*)-এ মুদ্রিত হয়েছিল[৫] ; এবং এর একটি ইংরেজি সারানুবাদ ইংলণ্ডের 'দ্য মন্থ্‌লি রিপোজিটরি অব্ থিয়লজি অ্যান্ড জেনারাল লিটেরেচার' (*The Monthly Repository of Theology and General Literature*) পত্রিকায় পর বৎসর (১৮২০) প্রকাশিত হয়। *Monthly Repository* (১৮২০)-তে প্রকাশিত অনুবাদের কয়েকটি অনুচ্ছেদ মেরি কার্পেন্টার তাঁর *The Last Days in England of the Rajah Rammohan Roy* গ্রন্থে (প্রথম প্রকাশ London 1866) উদ্ধৃত করেছেন।[৫ক] ১৮২৩-এ 'জুর্ণাল আসিয়াতিক'এ মু, লাজুয়ানে রামমোহনের যে পরিচিতিটি লেখেন সেখানে 'ক্রোণিক রেলিজিউজ'এ পূর্বপ্রকাশিত এই মূল প্রবন্ধের উল্লেখ আছে। এ পর্যন্ত রামমোহন-সংক্রান্ত আলোচনায় 'মান্থ্‌লি রিপোজিটরি'তে মুদ্রিত এর ইংরেজি অনুবাদের মেরি কার্পেন্টার উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ ক'টির উল্লেখ অনেকে করেছেন, দীর্ঘ মূল রচনাটির আধুনিক কালে কেউ অনুসন্ধান ও ব্যবহার করেছেন বলে বর্তমান লেখকের জানা নেই। সম্প্রতি আমার অনুরোধে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়স্থ 'স্কুল অব্ ওরিয়েণ্টাল য়্যান্ড্ আফ্রিকান স্টাডিজ্'এর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় অনুগ্রহপূর্বক ব্রিটিশ ম্যুজিয়াম গ্রন্থাগার থেকে ক্রোণিক রেলিজিউজ্'এ প্রকাশিত আবে গ্রেগোয়ারের মূল প্রবন্ধটির চিত্র-প্রতিলিপি আমাকে পাঠিয়েছেন। ফলে সমস্ত রচনাটি পাঠ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

ম. দা' কোস্তা সংকলিত রামমোহনের জীবন সম্পর্কিত যে তথ্যাবলীর উপর গ্রেগোয়ার নির্ভর করেছিলেন তা সংগৃহীত হয়েছিল সম্ভবত ১৮১৪-১৫ সালে রামমোহন কলিকাতায় এসে বসবার অনতিপরে কোন সময়ে। সুতরাং আমরা এই সংগ্রহকালকে ১৮১৬-১৮ বলে অনুমান করতে পারি। ইংরেজিতে রামমোহনের 'বেদান্তসার', 'কেনোপনিষৎ' ও 'ঈশোপনিষৎ' এর অনুবাদ (১৮১৬) এবং *A Defence of Hindoo Theism* (১৮১৭) এবং *A Second Defence of the Monotheistical System of the Vedas* (১৮১৭) তখন প্রকাশিত হয়েছে। ১৮১৮ সালের শেষপ্রান্তে (সম্ভবতঃ ডিসেম্বর মাসে) প্রকাশিত হয় তাঁর 'সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' এবং এর ইংরেজি অনুবাদ *Translation of a Conference between an advocate for and an opponent of, the Practice of Burning Widows Alive*। 'কেনোপনিষৎ' এর ইংরেজি অনুবাদ ছাড়া আর সব ক'খানি গ্রন্থই গ্রেগোয়ারের প্রবন্ধে উল্লিখিত। এগুলি তিনি ম. দা'কোস্তার কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। অতএব মোটামুটি ধরে নেওয়া চলে ১৮১৯ সালের একেবারে প্রথম দিকে এই তথ্যপঞ্জী ও গ্রন্থাবলী পাঠানো হয়েছিল।[৬] রামমোহনের জীবন সংক্রান্ত তথ্য যা কিছু *The Times* পত্রিকার সম্পাদক সংগ্রহ করেছিলেন তার মধ্যে বেশ কিছু ভুল ও অসম্পূর্ণতা যে ছিল; তা তদ্‌ভিত্তিক গ্রেগোয়ারের প্রবন্ধ পাঠ করলে বোঝা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও রামমোহনের জীবদ্দশায় একজন শিক্ষিত বুদ্ধিমান সমকালীন ব্যক্তি কর্তৃক সংগৃহীত রামমোহন জীবনীর উপাদান হিসাবে এই বিবরণের একটি বিশেষ মূল্য আছে। কয়েকটি

দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে। সমসাময়িক কোন আকরেই রামমোহনের কৌলিক উপাধি 'বাঁড়ুয্যা' (সংস্কৃত রূপান্তর 'বন্দ্যোপাধ্যায়') উল্লিখিত হয় নি। রামমোহন ও তাঁর বংশ সাধারণ্যে 'রায়বংশ' বলেই পরিচিত। 'রায়' (বা 'রায় রায়ান') খেতাব এই বংশে এসেছিল মুর্শিদাবাদ নবাবসরকারে চাকরী সূত্রে। উত্তরকালে রামমোহনের দুই বংশধর নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি এ সম্পর্কে দুই ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। প্রথম জনের মতে রামমোহনের প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্রই সর্বপ্রথম কৌলিক ব্রাহ্মণবৃত্তি পরিত্যাগ করে নবাব-সরকারে কর্মগ্রহণ করেন ও সেইসূত্রে 'রায়' পদবী পান। কিন্তু পণ্ডিত বিদ্যা-নিধির মতে এ বংশের প্রথম সরকারী কর্মচারী এবং 'রায়' পদবীধারী কৃষ্ণচন্দ্র নন, তাঁর পিতামহ, অর্থাৎ রামমোহনের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ পরশুরাম। সেই সময় থেকে কৌলিক 'বাঁড়ুয্যা'র পরিবর্তে এই বংশের সকলে 'রায়' পদবীতে পরিচিত। আমি অন্যত্র আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়েছি এই ব্যাপারে মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি সংগৃহীত পারিবারিক ঐতিহ্যই অধিকতর নির্ভরযোগ্য।[৭] সে যাই হোক গ্রেগোয়ারের প্রবন্ধের আরম্ভেই দেখা যায় রাম-মোহন উল্লিখিত হয়েছেন 'Rammohon-Roe-Banoudjia' অর্থাৎ 'রামমোহন রায় বাঁড়ুয্যা' বলে। মূলের 'বানুজিয়া' (Banoudjia) যে 'বাঁড়ুয্যা'রই যৎসামান্য উচ্চারণবিকৃতি এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। রামমোহনের সমকালে এটিই তাঁর প্রকৃত কৌলিক উপাধির এ পর্যন্ত জানিত সম্ভবতঃ একমাত্র উল্লেখ। রামমোহনের অধ্যয়ন অনুশীলন সম্পর্কে দা' কোস্তা সংগৃহীত তথ্যে কিছু বিশেষ সংবাদ আছে। বলা হয়েছে, রামমোহন প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন তাঁর পিতার তত্ত্বাবধানে নিজগ্রামে। এই সময়েই তিনি ফার্সী ভাষাও শিক্ষা করেন। তার পরে তাঁকে বিশেষ করে আরবী শিক্ষার জন্য পাটনায় পাঠানো হয়েছিল (Il y recut les premiers e'le'mens de l'e'ducation aupre's de son pere, et y apprit aussi le persan ; puis fut envoye' a Patna, pour y apprendre l'arabe)। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলতেন, রামমোহনের আরবী শিক্ষার জন্য পাটনা গমনের কাহিনী উত্তরকালে রচিত কিংবদন্তী মাত্র, তার কোন সমসাময়িক প্রমাণ নেই। দেখা যাচ্ছে সমকালীন বিবরণে পাটনা প্রবাসের কাহিনী সমর্থিত হচ্ছে। ফার্সী স্বগ্রামে আয়ত্ত করে কেবলমাত্র আরবী শিখতে পাটনা যাওয়ার মধ্যেও কোন অস্বাভাবিকত্ব নেই। ফার্সী সেকালকার রাজভাষা, বহু হিন্দুসন্তান সাংসারিক কারণে তা শিক্ষা করতেন। বর্ধিষ্ণু গ্রামসমূহে সে ব্যবস্থারও অভাব ছিল না। রামমোহনের পিতৃকুলে ফার্সী শিক্ষার রেওয়াজ পুরুষানুক্রমে ছিল। রামমোহনকেও সেই ধারানুসারে ফার্সীতে তালিম দেওয়া হয়ে থাকবে। কিন্তু আরবী শিক্ষার পশ্চাতে এমন কোনও সাংসারিক তাগিদ নিশ্চয় ছিল না। সেকালে অমুসলমানরা ফার্সী চর্চা করলেও বড় একটা আরবীর দিকে ঘেঁষতেন না। রামমোহন আরবী অনুশীলন করেছিলেন আপন অন্তরের অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞানস্পৃহা চরিতার্থ করবার প্রেরণায়। এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়েছিল পূর্বভারতে ইসলামীয় বিদ্যাচর্চার তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ কেন্দ্র পাটনায়, এমন অনুমান করতে কোন বাধা নেই। পাটনাতে তাঁর আরবী পাঠ্যসূচীর মধ্যে কি কি ছিল তারও কিছু ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যাচ্ছে। মূল ইসলামীয় ধর্মশাস্ত্র ছাড়া আরবী অনুবাদে আরিস্টটলের দর্শন ও ইউক্লিডের জ্যামিতির সঙ্গেও সেখানে তাঁর পরিচয় হয় (Ses maitres de Patna fui firent etudier quel-

ques-uns des ecrits d' Aristote et d' Euclide traduits en arabe)। পাটনার পর্ব শেষ করে অবশেষে কলিকাতায়—এসে রামমোহন সংস্কৃত শেখেন (···enfin a Calcutta pour y apprendre la langue sanscrite)। লক্ষ্য করবার বিষয়; লেখকের মতে রামমোহনের সংস্কৃতশিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয় কলিকাতায় —কাশীতে নয়। প্রবন্ধে কুত্রাপি রামমোহনের কাশীপ্রবাসের উল্লেখ নেই। অথচ রামমোহন যে ১৭৯৯ থেকে ১৮০৩-০৪ এর মধ্যে কাশীতে বেশ কিছুদিন বাস করেছিলেন সরকারী কাগজপত্রে তার উল্লেখ আছে। এখানে থাকাকালীন সংস্কৃত চর্চা বিশেষতঃ উপনিষদ-বেদান্তের অনুশীলন তিনি নিশ্চয় করেছিলেন। কলিকাতায় পূর্বার্জিত সংস্কৃতজ্ঞান কাশীতে বেদান্তপাঠে তাঁর অবশ্য সহায়ক হয়ে থাকবে। এ ক্ষেত্রে দা' কোস্তার প্রতিবেদন যে কিছুটা অসম্পূর্ণ তা মানতেই হবে। তবে রামমোহনের সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ হয় কলিকাতায়, এই অতিরিক্ত সংবাদ তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গেল। কলিকাতায় স্থায়ী হবার আগে রামমোহন নিজের চেষ্টায় খানিকটা ইংরেজি শিখেছিলেন ; লেখকের মতে ১৮১৪ থেকে কলিকাতাবাস আরম্ভ করবার পর তিনি অধ্যয়ন কথোপকথন ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁর ইংরেজিজ্ঞানকে পাকা করে নেন (A Calcutta, Rammohon-Roc se mit a perfectionner ses conaissances dans la langue anglaise, par la lecture et la conversation)। তা ছাড়া লেখক জানাচ্ছেন এই সময় তিনি প্রিচার্ড (Pritcherd) নামক এক ইংরেজ স্কুল শিক্ষকের কাছে কিছু ল্যাটিন এবং ম্যাকে (Makay) নামক দার্শনিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন জনৈক জার্মানের নিকট গণিতবিদ্যা শিক্ষা করেন।[৮] দুটি তথ্যই অজ্ঞাতপূর্ব। রামমোহন উত্তরকালে গ্রীক ও হিব্রু শিখেছিলেন কিন্তু তা ১৮২০ র পরে খ্রীষ্টীয় বিতর্কে জড়িত হয়ে পড়বার সময়। সুতরাং ১৮১৯ সালে সংকলিত আলোচ্য বিবরণে স্বভাবতঃ সে প্রসঙ্গের উল্লেখ নেই।

লেখকের উক্তিগুলি যে সর্বত্র সতর্ক বা নির্ভুল তা নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে তিনি রামমোহনের জন্মসাল উল্লেখ করেছেন ১৭৮০ এবং তাঁর পিতা রামকান্ত রায়ের (নামটি অশুদ্ধভাবে উচ্চারিত Ram-Hant-Roc) মৃত্যুবৎসর সম্পর্কেও সুনিশ্চিত নন। রামকান্তর মৃত্যু তাঁর মতে ১৮০৪ কিংবা ১৮০৫ সালের ঘটনা (পৃঃ ৩৮৯)। সম্ভবতঃ এই সূত্র থেকেই কোন কোন সমসাময়িক পাশ্চাত্য লেখকের ধারণা জন্মেছিল, রামমোহনের জন্ম ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু এই তারিখটি বিশ্বাসযোগ্য নয়, কেননা রামমোহনের জীবনের পরবর্তী যে সব ঘটনার তারিখ আমরা নিশ্চিত জানি সেগুলির সঙ্গে এটির সামঞ্জস্য করা যায় না। বর্তমানে এ মত বর্জিত। রামমোহনের জন্মসাল হিসাবে ১৭৭২ বা ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যে কোন একটিকেই বেছে নিতে হবে।. রামকান্ত রায়ের মৃত্যু যে ১৮০৩ সালে হয়েছিল তা নিশ্চিত ভাবে জানা গিয়েছে। মুর্শিদাবাদ থেকে প্রকাশিত রামমোহনের আরবী-ফার্সীতে লিখিত পুস্তিকা 'তুহ্‌ফাৎ-উল মুওহ্‌হিদিন্'-এর নামটি লেখক অনুবাদ করেছেন 'সর্বধর্মের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে' (*Contre l' Idolaitre de toutes les Religions*) ; প্রকৃতপক্ষে তা হবে 'একেশ্বরবাদীগণের প্রতি উপহার'। এই জাতীয় কিছু কিছু ত্রুটি থাকলেও সমগ্রভাবে প্রবন্ধটির মধ্যে সমসাময়িক দৃষ্টিতে রামমোহনের ব্যক্তিত্ব ও কীর্তির যে ছবি ফুটে উঠেছে তার মূল্য কম নয়।

একটি কথা মনে রাখতে হবে, গ্রেগোয়ার ছিলেন খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক। উনবিংশ

শতাব্দীর প্রথমার্ধের খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকগণের অনেকের মনেই এমন আশা ছিল যে রামমোহনের প্রচেষ্টায় হিন্দুধর্মের প্রচলিত কুসংস্কারগুলি দূর হলে বা দুর্বল হয়ে পড়লে ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের পথ সুগম হবে। একেশ্বরবাদ ও ব্রহ্মবাদের ভিত্তিতে বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মকেও যে নবযুগের উপযোগী রূপ দেওয়া চলে এই বিশ্বাস রামমোহনকে অনুপ্রাণিত করেছিল। কিন্তু হিন্দুধর্মের বিশুদ্ধ ও উন্নত স্তর এবং প্রচলিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্তরের মধ্যে পার্থক্যজ্ঞান মিশনারীদের ছিল না। তাঁদের মধ্যে যাঁরা প্রথমে রামমোহনের সংস্কারপ্রচেষ্টা সম্পর্কে উৎসাহিত হয়েছিলেন তাঁদের ধারণা ছিল রামমোহন এর দ্বারা সমগ্র হিন্দুধর্মকেই ধ্বংস করতে চলেছেন এবং হিন্দুদের খ্রীষ্টধর্মান্তরিত হওয়ার পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। গ্রেগোয়ারও এ বিষয়ে ব্যতিক্রম ছিলেন না। প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে তিনি স্পষ্টই বলেছেন একবার যদি হিন্দুদের মনে এই কথাটা ঢুকিয়ে দেওয়া যায় যে ঈশ্বর এক এবং সকলেই সেই এক পিতার সন্তান, তাহলে ব্রাহ্মণ্য পৌত্তলিক কুসংস্কারের উচ্ছেদ হবে এবং খ্রীষ্টধর্মের জয় যাত্রার পথ প্রশস্ত হবে (Si une fois on parvient a inculquer aux Hindous qu'il n'y a qu'un Dieu, et que tous ils sont enfans du meme pere…alors la chute des prejuges braminiques et de l'idolaitrie aplamront la route pour le triomphe de l' Evangile)। উত্তরকালে মিশনারীদের এ মোহভঙ্গ হয়েছিল।

আলোচ্য প্রবন্ধটির পাঠকমাত্রই জানতে কৌতূহলী হবেন, ম. দা'কোস্তা রামমোহনকে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন কি না এবং রামমোহনের জীবন-সংক্রান্ত তথ্যসমূহ তিনি প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ভিত্তিতে সংগ্রহ করেছিলেন কিনা। দুঃখের বিষয় প্রবন্ধে কোথাও এ সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। আমরা অনুমান করেছি ১৮১৬-১৮র মধ্যে ম. দ'কোস্তা রামমোহন সম্পর্কে জিজ্ঞাসু হয়ে তাঁর জীবনীর উপকরণগুলি সংগ্রহ করেন। ১৮১৬ থেকে রামমোহনের ইংরেজি গ্রন্থগুলির প্রকাশ শুরু হয় এবং মুখ্যতঃ এগুলির মাধ্যমেই তিনি দেশে-বিদেশে সমসাময়িক ইউরোপীয় মহলে পরিচিত হয়েছিলেন। সুতরাং এইসময় কলিকাতার এক ইংরেজি সংবাদপত্রের ইউরোপীয় সম্পাদক ম. দা'কোস্তার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় হওয়া অসম্ভব নয়; বিশেষতঃ যেখানে 'ক্রোণিক রেলিজিউজ'এ প্রকাশিত প্রবন্ধের ভূমিকায় বলা হচ্ছে ম. দা'কোস্তা ছিলেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষা ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বে বিশেষ পারদর্শী (tre's verse' dans les langues, l,histoire, les antiquites de l'Imde)। তবে এই পরিচয় যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ ছিল এমন কথা জোর করে বলা যায় না। দেখা যাচ্ছে দা'কোস্তার কিছু কিছু বক্তব্য অসম্পূর্ণ, ভাসা-ভাসা, অথবা ভ্রান্ত। রামমোহনের সঙ্গে পরিচয় থাকলেও তিনি সব কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেন নি, প্রচলিত ধারণা বা কিংবদন্তীর উপর একাধিক স্থলে নির্ভর করেছেন। তা ছাড়া এটুকুও মনে রাখতে হবে কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকার-এর সাহায্যে তাঁর নাড়ীনক্ষত্রের খবর নিয়ে প্রকাশ করবার বর্তমানে প্রচলিত সাংবাদিক রীতি সেকালে চালু হয়নি।

'লা ক্রোণিক্ রেলিজিউজ'এ প্রকাশিত সমগ্র ফরাসী প্রবন্ধটির বঙ্গানুবাদ নীচে দেওয়া গেল। অনুবাদ যথাসম্ভব মূলানুগ রাখবার চেষ্টা করেছি। স্থানে স্থানে পাঠকের বোধ-

সৌকর্যের জন্য যে দু একটি অতিরিক্ত শব্দ যোগ করতে হয়েছে তা বন্ধনীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট হল। কোনো কোনো স্থলে অর্থবিস্তারের নিমিত্ত প্রদত্ত অনুবাদকের নিজস্ব টীকাটিপ্পনীগুলি পাওয়া যাবে উপসংহারে সংযোজিত প্রামাণপঞ্জীর মধ্যে।]

সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ রামমোহন রায়ের জীবন ও গ্রন্থাবলী এবং ভারতবর্ষে তৎকর্তৃক স্থাপিত নবসম্প্রদায় সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

['ক্রোণিক-রেলিজিউজ'এ উক্ত সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি সম্পর্কে একটি অতি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ প্রকাশিত হল। বঙ্গদেশ থেকে ব্লোয়ার বর্ষীয়ান বিশপ ম. গ্রেগোয়ারকে তাঁর রচিত কিছু পুস্তক ও জীবনসংক্রান্ত যে বিবরণটি পাঠানো হয়েছে তার থেকে বিষয়টি আরও একটু বিস্তারিতভাবে জানা যায়। (জীবনীসংক্রান্ত) এই আলোচনাটি ম. দা'কোস্তা কর্তৃক ফরাসী ভাষায় লিখিত। ইনি এশিয়াবাসী, ভারতবর্ষের ভাষা, ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বে বিশেষ পারদর্শী এবং বর্তমানে কলিকাতার 'টাইমস' পত্রিকার সম্পাদক।)

রামমোহন রায় বানুজিয়া[৯] রামকান্ত রায়ের[১০] পুত্র ও ব্রজবিনোদ রায়ের[১১] পৌত্র। শেষোক্ত জন মুর্শিদাবাদে বাস করতেন। ইনি মোগলদের অধীনে[১২] উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু জীবনের শেষের দিকে এই স্বেরাচারী শাসকদের কাছে ভাল ব্যবহার পান নি। এই কারণে তাঁর পুত্র রামকান্ত রায় (মুর্শিদাবাদ থেকে) চলে এসে বর্ধমান জেলায়[১৩] স্থায়ীভাবে বাস করেন। এখানে ইংরেজ সরকারের অধীনে তিনি চার-পাঁচ লক্ষ (বিঘা?) জমি ইজারা নিয়েছিলেন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি বর্ধমানে রামমোহনের জন্ম হয়। এখানে তাঁর পিতার তত্ত্বাবধানে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং ফার্সীভাষাও শেখেন। তারপর তাঁকে আরবী ভাষা আয়ত্ত করবার জন্য পাটনায় পাঠানো হয়; এবং শেষে তিনি কলিকাতায় আসেন সেখানে সংস্কৃত শিখবার জন্য। তাঁর পাটনার অধ্যাপকেরা তাঁকে আরবী অনুবাদে আরিস্টটল ও ইউক্লিডের কিছু কিছু রচনা পড়িয়েছিলেন। সম্ভবতঃ এই সব গ্রন্থের বিশিষ্ট ভাবধারা মুসলমানদের সঙ্গে থেকে (জীবনে) অতি শীঘ্র তিনি অন্তরঙ্গভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। যতদূর মনে হয় এই মুসলমান শিক্ষকবৃন্দই তাঁকে এবিষয়ে শ্রদ্ধাবান করে তোলেন এবং ব্রাহ্মণ্য (হিন্দু) ধর্মে তাঁর বিশ্বাসের ভিত্তি টলিয়ে দিতে সহায়তা করেন। আবার এঁরাই অন্যান্য ধর্মকেও (যুক্তির আলোকে) বিশ্লেষণ করবার মনোভাব এবং পদ্ধতি তাঁকে যুগিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষকদের উদ্দেশ্য এই রকম ছিল একথা অবশ্য বিশ্বাস-যোগ্য নয়; কেননা যদিও ভারতবর্ষে ধর্মপ্রাণ ও বিদ্বান মুসলমানের সংখ্যা প্রচুর, তাঁদের মধ্যে এমন একজনও নেই ধর্মবিষয়ে যিনি অত্যধিক সংকীর্ণমনা নন। উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে যে তিনটি ধর্মের সঙ্গে রামমোহনের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল, তিনি তার একটিতেও বিশ্বাস করতেন না—অর্থাৎ মুসলমানধর্মেও না, খ্রীষ্টধর্মেও না বা হিন্দুধর্মেও না। সে সময় তিনি ইংরেজি যৎসামান্য জানতেন এবং সেটুকুও নিজের চেষ্টাতে শিখেছিলেন। পিতার শাসনের ভয়ে তখন পর্যন্ত তিনি তাঁর চিন্তাধারাকে অবাধে বিস্তারিত করতে পারেন নি। কিন্তু যদিও পিতার সন্দেহ উদ্রিক্ত হওয়ায় তাঁকে কিছু পরোক্ষ তিরস্কারের ভাগী হতে হয়েছিল, তাঁর নিজের বিশ্বাস সে-হেতু কিছু হ্রাস পায়নি। কিন্তু উক্ত সরলহৃদয় মানুষটি (রাম-মোহনের পিতা) অতি আন্তরিক বিশ্বাসী হিন্দু ছিলেন; পুত্রের ধর্মীয় অবিশ্বাস যে

কিসের ভিত্তিতে কতদূর এগিয়েছে তা ধারণা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি ; তিনি পুত্রের তথাকথিত অনাচারগুলিকে নিঃসন্দেহে যৌবনের অব্যবস্থিতচিত্ততাপ্রসূত মনে করেছিলেন। এখানে প্রসঙ্গতঃ বলা উচিত, তিনি পুত্রকে যে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন দেশকালগত পরিপ্রেক্ষিতে তা অতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল। তিনি স্বয়ং মুসলমান দরবারী আবহাওয়ায় লালিত হয়েছিলেন, তাই তরুণ পুত্রের জন্য এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন যা ভারতের আধুনিক বিজেতৃগণ (ইংরেজ শক্তি) অপেক্ষা পূর্বতন বিজয়ী শক্তির (মুসলমান রাজশক্তির) অনুকূল। প্রথমোক্ত রাজশক্তির ভাষা (ইংরেজি) পর্যন্ত তিনি পুত্রকে শেখান নি। যেটুকু সংস্কৃত তাকে তিনি শিখিয়েছিলেন তা কেবলমাত্র তার ব্রাহ্মণ্য কুলমর্যাদা বজায় রাখবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল[১৪]। অল্প কিছুদিন পরেই, অর্থাৎ আন্দাজ ১৮০৪ কি ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে রামকান্ত রায়ের মৃত্যু হয়। পুত্রগণের মধ্যে যাতে বিরোধ না ঘটে এই উদ্দেশ্যে তিনি মৃত্যুর দু'বছর পূর্বে তিন পুত্রের মধ্যে তাঁর বিষয়সম্পত্তি ভাগ করে দেন।[১৫] এর অনতিপরে তার জ্যেষ্ঠ পুত্রেরও মৃত্যু হয়[১৬]। রামমোহন রায় যিনি দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন এখন (জীবিত) প্রথম হলেন এবং শীঘ্র একমাত্র সন্তানে দাঁড়ালেন। সম্ভবতঃ এই সময় থেকেই সংস্কার-পরিকল্পনা তাঁর মনে উদয় হয় এবং এই সূত্রে তিনি বর্ধমান পরিত্যাগের সংকল্প করেন। বর্ধমানে (এরপর) তিনি অতি অল্পই থেকেছেন। তিনি মুর্শিদাবাদ গেলেন এবং এখান থেকে আরবী ভূমিকাসহ ফার্সীতে "সর্বধর্মের প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে" শীর্ষক এক গ্রন্থ প্রকাশ করলেন[১৭]। এই গ্রন্থের বক্তব্য কেউ খণ্ডন করতে চেষ্টা করেননি;[১৮] কিন্তু এর দ্বারা মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর একদল শত্রু সৃষ্টি হল এবং ফলে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অবশেষে কলিকাতায় চলে আসতে বাধ্য হলেন। তাঁর এই পদক্ষেপ ভারতে তৎকালীন ইংরেজ শাসনের নিরিখটি বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। কারণ রামমোহন এ পর্যন্ত যতগুলি স্থানে বাস করে এসেছিলেন তার সবগুলিই রীতিমত ইংরেজ শাসিত, কিন্তু ইংরেজশাসনের নৈতিক প্রভাব এর সর্বত্র সমান ছিল না। কলিকাতায় রামমোহন অধ্যয়ন, কথোপকথন প্রভৃতি দ্বারা তাঁর ইংরেজীজ্ঞানকে পাকা করে নেবার কাজে নিযুক্ত হলেন। প্রিচার্ড নামক জনৈক ইংরেজ স্কুলশিক্ষকের কাছে তিনি কিছু লাটিনও আয়ত্ত করলেন। ম্যাকে নামক এক দার্শনিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন জার্মান তাঁকে গণিত শিক্ষা দেন। তিনি শহরের পূর্বসীমান্তে সার্কুলার রোডের উপর ইউরোপীয় পদ্ধতিতে নির্মিত এক বাড়ী ও বাগান কিনে বর্তমান সেখানে বাস করছেন। পদমর্যাদা ও বিত্তের জন্য খ্যাতিসম্পন্ন তাঁর বারজন স্বদেশীয়কে তিনি তাঁর ধর্মীয় মতবাদের গুণগ্রাহী করে তুলেছেন, এবং তাঁদের সাহায্যে তিনি একটি সম্প্রদায় স্থাপন করেছেন যার অনুবর্তীদের সংখ্যা প্রায় এক হাজার ধরা যেতে পারে। তিনি যে কেবলমাত্র অত্যন্ত কুশলতা সহকারে এই সম্প্রদায়কে একেশ্বরবাদী আখ্যা দিয়েছেন তাই নয়, ইউরোপীয়গণের মনস্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এ কথাও ঘোষণা করেছেন খ্রীষ্টীয় নীতিশাস্ত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কোন নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই[১৯]। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রতি রবিবার রামমোহনের গৃহে সমবেত হন ; এখানে তাঁরা পানভোজন করেন এবং সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় একমাত্র সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের বন্দনা গান করেন। এঁদের মধ্যে রামমোহন রায়ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত এবং সম্ভবত প্রকৃত অর্থে তিনিই একমাত্র তাই। 'কামো' নামক অতি ধনবান ও মদ্যপিপাসু ব্যক্তিটিকে বাদ দিলে দলের অন্য সকলেই অত্যল্প-

পরিচিত।[২০] যেসব হিন্দুরা বেদে বিশ্বাসী তাঁরা যে এই নূতন প্রচেষ্টার বিরোধিতা করবার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন তা স্বচ্ছন্দে ধরে নেওয়া যেতে পারে। বহু বিচিত্র উপায়ে রামমোহনকে আক্রমণ করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর মনোবল, দৃঢ়তা, পাণ্ডিত্য এবং আর্থিক সাচ্ছল্য তাঁকে জাতিচ্যুতির হাত থেকে রক্ষা করেছে। এটা এক ধরনের বহিষ্কারদণ্ড যা তার দেশবাসীরা তাঁকে ভোগ করাতে চেয়েছে; ব্যাপারটি ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক, কেননা এর ফলে মানুষ তার স্ত্রীপুত্রদের সঙ্গ থেকেও বঞ্চিত হয়। অবশ্য এটুকুও যোগ করতে হয়, তাঁর সংস্কারপ্রেরণার অনুষঙ্গরূপে যে আচরণবিধি তিনি অবলম্বন করেছেন তদনুসারে তিনি কিছুসংখ্যক ব্রাহ্মণের প্রতি সর্বদা সম্মানসূচক ব্যবহার করতে কার্পণ্য করেন নি, এবং এর ফলে তাঁরাও সর্ববিধ আক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁকে রক্ষা করতে উদ্যোগী হয়েছেন। কেননা একটিবার তাঁরা যখন রামমোহনের সঙ্গে একত্র ভোজন করলেন, তখনি তাঁরাও—যা রামমোহনের প্রাপ্য ছিল—সম্পূর্ণভাবে সেই বহিষ্কারদণ্ডের চৌহদ্দির মধ্যে এসে পড়লেন।[২১] এর দ্বারা প্রমাণ হয়,—যে সব প্রতিষ্ঠান প্রাকৃতিক নিয়ম বা যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সেগুলি পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে কতদূর পর্যন্ত ফাঁকিতে পরিণত হয়ে যেতে পারে এবং কিভাবে এ-সবের অন্তর্নিহিত চাতুরী এগুলির নিজেদের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হয়ে থাকে। যদি ভারতবর্ষের পক্ষে—তার প্রাচীন সমস্ত বিধিব্যবস্থাসম্পর্কে—যেগুলির আদিম অনড় অবস্থা আজও অটুট—একথা সত্য হয়, তাহলে অন্যান্য সব দেশ সম্পর্কে তা আরো কতদূরেই না যথার্থ।

রামমোহন চরিত্রে অবিমিশ্র প্রশংসনীয় যাই থাকুক না, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে, বর্তমানে ভারতবর্ষে এমন কোন ব্রাহ্মণ নেই ব্রাহ্মণত্ব ও হিন্দুত্বের আদর্শ থেকে যিনি তাঁর চেয়ে দূরবর্তী। একথাও সমানভাবে সত্য, হাজার হাজার প্রবঞ্চিত ব্যক্তি যাঁরা জাতিচ্যুত হয়েছেন, রামমোহন অপেক্ষা নিজ নিজ বিশিষ্ট ধর্মমতের বিরুদ্ধে তাঁদের অপরাধ অনেক কম। তরুণ বয়সই ভাল বা মন্দ নূতন ভাবধারা গ্রহণ করবার পক্ষে উপযুক্ত কাল একথা বিবেচনা করে রামমোহন নিজব্যয়ে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন যেখানে পঞ্চাশটি ছেলেকে ইংরেজি, ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষা দেওয়া হয়।[২২] সংস্কারের এই আরম্ভ ও ভিত্তি আপাতদৃষ্টিতে যত দুর্বলই মনে হোক না কেন সম্ভবতঃ অল্পাধিক দ্রুতগতিতেই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে; কেননা তা ইউরোপীয় প্রভাব ও মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যপুষ্ট। প্রচলিত জাতিভেদপ্রথারূপ পাপের উচ্ছেদই রামমোহন রায়ের সংস্কারপ্রচেষ্টার প্রধান লক্ষ্য, এবং এই ব্যাপারেই তাঁর বিচারশক্তির বলিষ্ঠতা সুপ্রতিভাত। এই জাতিবিভাগপ্রথাকেই ভারতবর্ষের বহুদেববাদ ও অন্যান্য ভ্রান্তবিশ্বাসের ভিত্তিস্বরূপ বলা যেতে পারে। একবার এটি অন্তর্হিত হোক, হিন্দুসমাজের অন্যান্য কুসংস্কারগুলি তৎক্ষণাৎ মানুষের স্বাধীন বিচারবুদ্ধির সংস্পর্শে এসে ধ্বসে পড়বে। এই জাতিভেদপ্রথার নিষ্ঠুর আতিশয্যই একান্ত পারিবারিক জীবনের দৈনিক আচারসমূহকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আপনার মধ্যে কেন্দ্রীভূত করে হিন্দুসমাজজীবনের ভিত্তি রচনা করেছে। বস্তুতঃ ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানসমূহও যে এই বিশিষ্ট পাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এমনও বলা যায় না। অমোঘ নিয়মরূপে গৃহীত বৈধাধিকার স্বত্বনীতি (la légitimité), উত্তরাধিকারভিত্তিক অভিজাততন্ত্র, জ্যেষ্ঠপুত্রের বিশেষ অধিকারসমূহ (**les majorats**) প্রভৃতি জাতিভেদ থেকে কিছু ভিন্ন জিনিস নয়; অথবা তারই কিছু অবশিষ্টাংশ যা উচ্ছেদ করা কঠিন।

রামমোহন রায় তাঁর (সংস্কারমূলক) ব্যবস্থাগুলি নিজ দেশ, কাল এবং যে ধরনের মানুষকে তিনি শিক্ষাদান করতে ইচ্ছুক—তাদের উপযোগী করে গ্রহণ করেছেন। এইজন্য তিনি বিশুদ্ধ যুক্তি দ্বারা জাতিভেদ খণ্ডন করবার চেষ্টা করেন নি (কেননা তাতে কোনই ফল হবে না)। তার পরিবর্তে তিনি এই প্রথার বিরুদ্ধতা করেছেন বেদপ্রমাণের দ্বারা। তিনি সর্বদাই সতর্ক থাকেন, বেদের যেন কোথাও অসম্মান না হয় এবং বেদের মাত্র ব্যাখ্যাতা রূপে নিজের পরিচয় দিয়ে থাকেন।[২৩] এ বিষয়ে তাঁর আচরণ যে পরিমিতিবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তদনুসারে এমন কোনও কাজ তিনি করেন না যা তাঁর নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের সংস্কারে আঘাত করতে পারে এবং তাঁর জাতিচ্যুতির যথেষ্ট কারণ হতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বহু ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে উঠতে সমর্থ হয়েছেন। একজন ভোজনরত ইউরোপীয়ের নিকট আসন গ্রহণ করতে তাঁর কোনই আপত্তি নেই। এমন কি কখনো কখনো তিনি ইউরোপীয়গণকে নিজভবনে নিমন্ত্রণ পর্যন্ত করেন এবং তাঁদের নিজস্ব রুচি অনুযায়ী তাঁদের আহারের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু স্বীয় ব্রাহ্মণ্য মর্যাদা থেকে চ্যুত হওয়া দূরে থাক, তার উপরেই তিনি তাঁর সমস্ত (সংস্কারমূলক) উদ্যমের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর বলবার কথা এই যে একজন ব্রাহ্মণ হিসাবে তাঁর কর্তব্য তাঁর স্বদেশীয়গণকে তাদের শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায় ও যথার্থ বিধানসমূহে শিক্ষা দেওয়া। বস্তুতঃ তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে সেই কুসংস্কারের ধ্বংস যা বিভিন্ন জাতির একত্র আহারের পক্ষে বাধাস্বরূপ। তাঁর বিবেচনায় এই আচারগত উৎকর্ষ সর্বাধিক প্রয়োজনীয় এবং এর থেকেই অন্য সর্ববিধ উন্নতির সূচনা হবে—এমনকি তাঁর দেশবাসীর রাজনৈতিক উন্নতিরও। এই রাজনৈতিক উন্নতির আদর্শটি সর্বদা তাঁর মনে জাগরূক। প্রতি ছয় মাস অন্তর তিনি বাংলা বা ইংরেজিতে তাঁর একেশ্বরবাদের ব্যাখ্যাসংবলিত এক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে থাকেন। কলিকাতায় বা মাদ্রাজে তাঁর বিরুদ্ধে যে সব পুস্তিকা প্রকাশিত হয়[২৪] সেগুলির উত্তর দেবার জন্য তিনি সর্বদা প্রস্তুত। এই ধরনের বিতর্কে তিনি আনন্দ পান ; কিন্তু যদিও দর্শনশাস্ত্রে তিনি অপারদর্শী নন বা তাঁর বিদ্যারও অভাব নেই তবু (এ সব ক্ষেত্রে) ব্যাপক পর্যবেক্ষণগত বিচার অপেক্ষা তর্কশাস্ত্রসম্মত যুক্তিবিন্যাসেই তাঁর প্রতিভা সমধিক উদ্ভাসিত হতে দেখা যায়। মেথডিস্টগণের সঙ্গে (তর্কদ্বন্দ্বে) এই পদ্ধতিতে কতটা সুবিধা পাওয়া যায় তা সম্ভবতঃ তিনি অনুভব করতে পারেন। মেথডিস্টগণের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে তাঁদের ধর্মে দীক্ষিত করতে চেষ্টা করছেন।[২৫] এই তর্কযুদ্ধের প্রণালী তিনি সম্ভবতঃ আরবদের ন্যায়শাস্ত্র থেকে গ্রহণ করেছেন ; এই শাস্ত্রকে তিনি সকল ন্যায়শাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করেন। তেমনি তিনি বলেন, ইউরোপীয় গ্রন্থরাজিতে তিনি হিন্দুদের প্রাচীন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ববিদ্যার (philosophie scholastique) সমতুল্য কিছু দেখতে পাননি। সহজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে, এমন একজন মানুষ—যিনি মনীষায় তাঁর স্বদেশীয়গণের অনেক ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন—দৈনন্দিন আচার ব্যবহারে তাদের সম্পূর্ণ অনুরূপ হবেন না। তিনি যে কেবল তাদের কুসংস্কারাত্মক আচরণগুলি বর্জন করেছেন তাই নয় (এটুকু বললে যথেষ্ট বলা হল না, কেন না এমন কাজ নানা কারণেই করা সম্ভব যার সবগুলি হয়তো প্রশংসনীয় নাও হতে পারে) ; এ সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, তাঁর বাক্যালাপ, আচার-ব্যবহার সব কিছুর মধ্য দিয়ে সর্বদা একটি আন্তরিক আত্মমর্যাদার ভাব প্রকাশ পায়, যেখানে সাধারণভাবে দুর্বলতা ও নীচতাই হিন্দুর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য।[২৬]

তাঁর চতুষ্পার্শ্বস্থ সকলের মতই তিনি একই নিয়মনীতি, একই হিসাবী গার্হস্থ্যব্যবস্থা এবং অর্থকে পরমার্থ জ্ঞান করবার একই ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির আবহাওয়ায় লালিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করাকেই তিনি জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করেন না। পিতৃ-পিতামহের নিকট থেকে (উত্তরাধিকার সূত্রে) তিনি যা পেয়েছেন তাঁর স্থাবর সম্পত্তি বলতে তাই। কোনরকম ব্যবসায়িক ঝুঁকি নেওয়ার দিকে তার প্রবণতা নেই। জীবনে এই ধরনের রীতি অবলম্বনকে তিনি মর্যাদাহানিকর ও নিজ ব্রাহ্মণ্য কর্তব্যকর্মের অযোগ্য মনে করেন।[২৭] তাঁর গ্রন্থাদি থেকে তিনি কোনো আর্থিক লাভ রাখেন না। ক্ষমতা ও যশ লাভেচ্ছু হলেও নিছক অর্থোপার্জনের জন্য তিনি সম্ভবতঃ কোন সরকারী পদ গ্রহণ করবেন না; এবং এ ধরনের যে কোনও পদ ভিক্ষা করবার মত হীনতা স্বীকারে সম্মত হবেন না। অবশ্য, মনে হয় না সরকার কখনো তাঁর এই মনোভাব পরীক্ষা করে দেখবেন। এমন একজন উচ্চমনা প্রজাকে—যিনি প্রায়ই তাঁর অকপট কথোপকথন প্রসঙ্গে কখনো গভীরভাবে কখনো বা ঠাট্টার ছলে দেশবাসীর কি কি কল্যাণসাধন করতে চান তা খুলে বলেন,—উৎসাহ দেওয়া তাঁর দেশের বর্তমান শাসকগণের পক্ষে নীতিহিসাবে সুবিধাজনক মনে হতে পারে না। তা বলে অবশ্য পদমর্যাদা ও যোগ্যতা সম্পন্ন বহু ইউরোপীয়ের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতার কোনো অভাব নেই। মনে হয় তিনি অন্য কোন ধরনের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে খুব ইচ্ছুক নন। গত দু'এক বছরের মধ্যে তাঁকে লোকসমাজে যেন পূর্বাপেক্ষা কিছু কম দেখা গেছে।

এ পর্যন্ত যা বলা হয়েছে তার থেকে দেখা যাবে, রামমোহন রায়ের বয়স এখনো চল্লিশ বছর পূর্ণ হয় নি।[২৮] তিনি দীর্ঘদেহী ও বলিষ্ঠ; তার আকৃতি যথোচিত সৌষ্ঠবমণ্ডিত এবং যখন কোনো কারণে তিনি উৎসাহিত হন তখন তাঁর স্বভাবগম্ভীর মুখশ্রী অতি মনোরম দেখায়। মনে হয় তাঁর অন্তরে ঈষৎ পরিমাণে একটি স্বাভাবিক বিষণ্ণতা আছে।[২৯] তাঁর সমস্ত ব্যবহার ও কথোপকথন থেকে প্রথম দর্শনেই ধারণা হয় যে মানুষটি সাধারণ স্তরের ঊর্ধ্বে। তিনি প্রায়ই ইউরোপযাত্রার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন; কিন্তু মনে হয় তার পূর্বে তিনি তাঁর স্বদেশীয়গণের কুসংস্কার যথেষ্ট পরিমাণে দূর করতে চান যাতে নিষিদ্ধরূপে গণ্য এই সমুদ্রযাত্রার জন্য তাঁকে জাতিচ্যুতিরূপে দণ্ড না ভোগ করতে হয়।[৩০] এই ব্যাপারে তাঁর উদ্দেশ্য সফল হবে কিনা তাতে ঘোর সন্দেহ আছে। কিন্তু তিনি যে এ বিষয়ে আশা পোষণ করে চলেছেন তা যথার্থই তাঁর দৃঢ় মনোবলের পরিচায়ক। এ সম্পর্কে বলবার কথা এই যে, দুনিয়ায় এমন কিছু মানুষ থাকেন যাঁদের প্রায় সকলেই নিছক জন্মানো, জীবনধারণ ও মৃত্যুর বাঁধা রাস্তার বাইরে স্বনির্বাচিত এই শ্রেণীর কোনো আদর্শের বেদীমূলে উৎসর্গীকৃত; উক্ত আদর্শ দুরধিগম্য ও দূরস্থিত হতে পারে কিন্তু অলীক কল্পনা নয়। এই আদর্শই অবিরাম তাঁদের কর্মের প্রেরণা যোগায়, দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ জীবনযাত্রার পথে এই মহৎ আত্মচেতনা দ্বারা তাঁদেরকে আশ্বসিত রাখে যে সংসারে তাঁরা বৃথা জীবনধারণ করেন নি; তাঁদের আকস্মিক হতাশার মুহূর্তগুলি এই সান্ত্বনা দ্বারা উৎসাহিত ও মধুর করে তোলে যে উত্তরকালের জন্য তাঁরা অন্ততঃপক্ষে কিছু করে গেলেন।

বর্তমান ক্ষুদ্র নিবন্ধের সাক্ষ্য অনুসারে দেখা যাচ্ছে, এই ভারতীয় দার্শনিক তাঁর দেশের পুরুষসম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে তাঁর মতামত যথেষ্ট সম্প্রসারিত করেছেন; আশ্চর্যের

বিষয় নারীজাতির অনুরূপ সংস্কার সম্পর্কে তাঁর ন্যূনতম ধারণাও নেই ; এমন কি নারীদের প্রসঙ্গ পর্যন্ত তিনি উত্থাপন করেন না।[৩১] ধরে নেওয়া যায়, যদিও এই ধরনের বিরুদ্ধ মনোভাব শাস্ত্রভিত্তিক এবং হিন্দুদের মধ্যে সাধারণ, রামমোহনের মত এমন বুদ্ধিমান ব্যক্তির মনে এর রেশ রয়ে গেছে কেবলমাত্র তাঁর পারিবারিক পরিস্থিতির দরুণ। একথা সুবিদিত যে, তাঁর পরিবারের প্রতিটি ব্যক্তি প্রথম এবং প্রবলতমভাবে তাঁর সর্ববিধ সংস্কারকার্যে বাধা দিয়ে এ বিষয়ে প্রচলিত প্রবাদের সত্যতা প্রমাণ করেছেন। পরিবারভুক্ত কেউই এমন কি তাঁর স্ত্রী পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কলিকাতায় আসতে ইচ্ছুক নন ; কাজেই তিনিও কদাচিৎ বর্ধমানে তাঁদের কাছে গিয়ে থাকেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রদের শিক্ষার তত্ত্বাবধানকার্যেও তাঁরা তাঁকে বাধা দিয়েছেন। তিনি হিন্দু প্রতিমাপূজার অবসান ঘটাতে যে শক্তি নিয়োগ করেছেন তাঁর ধর্মান্ধ জননী তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে তাপেক্ষা কিছু কম করেন নি।

কলিকাতা ৮ নভেম্বর, ১৮১৮

বাংলাদেশ থেকে পাঠানো (রামমোহনের) গ্রন্থগুলির মধ্যে ১৮১৮ সালে মুদ্রিত, বিধবাদের মৃত পতির চিতায় জীবন্ত দাহ করবার প্রথার বিরুদ্ধে আদৌ বাংলায় লিখিত একটি সন্দর্ভের ইংরেজি অনুবাদ আছে।[৩২] যে সমস্ত অঞ্চলে এই জঘন্য আচার প্রচলিত সেখানে এই বেনামী পুস্তিকাটি বহুল প্রচারিত—যেটির লেখক নিঃসন্দেহে রামমোহন রায়। অন্যান্য যেসব রচনার কথা বলা হচ্ছে সেগুলিতে তাঁর নাম আখ্যাপত্রেই আছে ; এগুলি প্রথম বাংলা ও হিন্দুস্থানীতে লেখা হয়, পরে ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে।[৩৩] সবগুলিরই উদ্দেশ্য তাঁর দেশবাসীর বহুদেববাদের সঙ্গে তাদেরই পবিত্র ধর্মগ্রন্থের সাহায্যে সংগ্রাম করা, ঈশ্বর-সত্তার একত্ব প্রতিষ্ঠা করা ও প্রতিমাপূজা এবং জাতিভেদ সংক্রান্ত কুসংস্কারের উচ্ছেদ ঘটানো।

এর প্রথমখানির শিরোনাম "Translation of the Ishopanishad, etc." by Rammohon-Roe ; in-8°, Calcutta 1816। গ্রন্থখানি একটি দীর্ঘ ও সুলিখিত ভূমিকা-সংবলিত। বেদ, যা হিন্দুদের মধ্যে চিরায়ত প্রামাণিকতায় মহিমান্বিত, পুরাণ, তন্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থাদি,—এক কথায় সারা ভারতে প্রচারিত হিন্দু ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের শ্রেষ্ঠ লেখকদের রচনাবলীর গ্রন্থকার এখানে এক সমীক্ষা করেছেন ; এবং রাশীকৃত উদ্ধৃতির দ্বারা প্রমাণ করেছেন, ঈশ্বরসত্তার একত্ব সর্বশাস্ত্রেই স্বীকৃত। সত্য বলতে কি আপাতদৃষ্টিতে এমন মনে হতে পারে, উক্ত গ্রন্থরাজির কোন কোনটি বহু দেবদেবীর উল্লেখ করে স্ববিরোধিতা দোষদুষ্ট হয়ে পড়েছে ; কিন্তু সেগুলি পাঠকদের এই বলে সান্ত্বনা দেয় যে জড়বস্তুর উপাসনা কেবল তাদেরই জন্য বিহিত যাদের মানস নিরাকার পরমেশ্বরের ধারণা করতে অক্ষম। এই উপাসনা স্থূল হলেও, কুপ্রবৃত্তিসমূহের দমনকারী ; কিন্তু যাঁরা জ্ঞানাংশে অপেক্ষাকৃত উন্নত, তাঁরা দেবপ্রতিমাকে শ্রদ্ধা করেন না।

ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁরা শিক্ষিত তাঁদের অনেকেই বহুদেববাদের আজগবীত্ব সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু এর সঙ্গে জড়িত ক্রিয়াকর্ম, উৎসবাদি, হিন্দুসমাজের দুর্বলতা, বিশ্বাস-প্রবণতা ও ধৈর্যকে মূলধন করে তাঁদের ধনসম্পদের অন্যতম উৎসরূপে বর্তমান। সুতরাং এই কুসংস্কারের উচ্ছেদ করা দূরে থাক, এঁরা একে উৎসাহই দিয়ে থাকেন এবং সত্যধর্মকে জনসাধারণের থেকে আড়াল করে রাখেন।

আবার অন্যদিকে এইসব ক্রিয়াকর্মের সমর্থকগণের নিশ্চিন্ত বিশ্বাস যে জীবন্ত মানুষের মধ্যে যেমন ভগবৎসত্তা বিরাজমান, মানুষ সদৃশ কল্পিত দেবতাদের মধ্যেও তাই থাকবে।

সেই হেতু তাঁরা ধরে নেন, (জন্ম, আকৃতি ও ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তির ভূমিতে) মানবজাতির সামান্য-লক্ষণের অনুরূপ দেবতারাও জন্ম, আকৃতি ও ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তিসম্পন্ন। প্রবৃত্তির অনুকূলে এই কুসংস্কার নীতিবোধের নাশক। একজন হিন্দু যিনি কোন দেবপ্রতিমা নির্মাণ করেন বা বাজার থেকে ক্রয় করেন, বিশেষ অনুষ্ঠানের দ্বারা সেটির অভিষেক বা উৎসর্গ না করে তাঁর গত্যন্তর নেই; তাঁর বিশ্বাস এই উপায়ের দ্বারা তাঁর প্রতিমাখানিতে সেই বিশিষ্ট দেবতার আবির্ভাব ঘটবে এবং শূন্য মূর্তিতে এক অলৌকিক শক্তি সঞ্চারিত হবে। পুত্তলীটি যদি পুরুষজাতীয় হয় তাহলে স্ত্রীজাতীয় অন্য কোন মূর্তির সঙ্গে তিনি বিরাট সমারোহ ও আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান সহকারে তার বিবাহ দেন। এই মুহূর্ত থেকে আলোচ্য প্রতিমাটিকে সকলের ভাগ্যবিধাতা মনে করা হয়; তিনি এঁর উপাসনা করেন, সকাল-সন্ধ্যা এঁকে ভোগ-নিবেদন করেন। যদি এঁর গরম লাগে ইনি পাখা দিয়ে এঁকে ব্যজন করেন; ঠাণ্ডা লাগলে সন্ধ্যায় উত্তম শয্যায় শয়ন করান।

রামমোহন বলেছেন, কিছু ইউরোপীয়, যাঁদের জ্ঞান অল্প, বিশ্বাস করেন এবং প্রচার করে থাকেন যে, হিন্দুদের কাছে তাদের দেবপ্রতিমাগুলি প্রতীকস্বরূপমাত্র, এবং ব্রহ্মের বিবিধ গুণসমূহ চিন্তনের উপায় হিসাবে কল্পিত। এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে পড়াশুনা করলে দেখা যায় সিদ্ধান্তটি কতটা ভ্রমাত্মক। তবুও বহু হিন্দু, যাঁরা তাঁদের ধর্মবিশ্বাসের অসংগতি সম্পর্কে সচেতন হতে আরম্ভ করেছেন, উক্ত কৌশলের দ্বারা এর হাস্যকর ও লজ্জাকর দিকটি চাপা দেবার জন্য উন্মুখ। রামমোহন বলেন, (হিন্দুসমাজের একাংশের) এই দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর এ প্রত্যাশাকে দৃঢ় করেছে যে কোনো না কোনো দিন তাঁরা কুসংস্কার বর্জন করে বেদ বিহিত ও সহজ প্রত্যয় সমর্থিত একমাত্র পরমেশ্বরের উপাসনাকে বরণ করে নেবেন।

তাছাড়া হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসে পরিবর্তন ঘটেছে গত শতাব্দীর মধ্যভাগ অপেক্ষা খুব বেশী দিন আগে নয়। বিশেষতঃ বাংলাদেশে; যার ফলে ধর্মীয় মূল তত্ত্ব সম্পর্কে বঙ্গবাসীরা বিহার, ত্রিহুত বা বারাণসীর অধিবাসীদের থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন; এবং তাঁরা তাঁদের প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসকে যথেষ্ট সম্প্রসারিত করে বেদবিরুদ্ধ তন্ত্রধর্ম সম্মত পৌত্তলিকতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। এই বহুলাংশে আধুনিক পৌত্তলিকতা গ্রীক এবং রোমান পৌত্তলিক উপাসনার চেয়েও ঘৃণ্য; কেন না তা সেগুলির মতই তুচ্ছ ও অপবিত্র এবং অধিকন্তু সর্বপ্রকার সৎনীতির বিরোধী। এর কারণ হিন্দুদের এই পুরাণ সাহিত্য অবিরাম সেই সব কলঙ্কিত কাহিনীই প্রকাশ করে চলেছে যার বিষয়বস্তু লাম্পট্য, ব্যভিচার, অকৃতজ্ঞতা, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, ইত্যাদি। এই হল (বর্তমানে) ব্রাহ্মণদের শাস্ত্র এবং তাঁরা এই পাপরাশিকে টিকিয়ে রাখতে আগ্রহী যেহেতু এগুলি তাঁদের কাছে অর্থোপার্জনের উপায়স্বরূপ।

বেশ বোঝা যায়, গ্রন্থকার (রামমোহন রায়) এই রক্ষণশীলগোষ্ঠীর বিদ্বেষের পাত্র হয়ে উঠেছেন, এবং তাঁর অর্থসম্পদ, প্রতিভা ও গুণাবলী জনসাধারণের যে সমীহ আকর্ষণ করেছে একমাত্র তা-ই এই প্রতিপক্ষদের ষড়যন্ত্র ও নির্যাতনের হাত থেকে এতাবৎ কাল তাঁকে রক্ষা করে এসেছে। প্রতিমাপূজার সমর্থনে এ পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে মাত্র দুখানি পুস্তক লেখা হয়েছে ঃ প্রথমখানি (প্রকাশিত হয়) মাদ্রাজ-পত্রিকায় (le Journal de Madras); রামমোহন রায় এর একটি উত্তর দিয়েছেন[৩৪]। দ্বিতীয়টি হিন্দুধর্মের প্রচলিত বাস্তবরূপের পক্ষ সমর্থনে কলিকাতার এক ব্রাহ্মণ কর্তৃক লিখিত, যিনি তেত্রিশ কোটি দেবদেবীপূজাকে

সত্য বিবেচনা করেন ; উক্ত দেবমণ্ডলীর মধ্যে আবার শিব, বিষ্ণু, কালী (? কালী ?), গণেশ, সূর্য, চন্দ্র ও পঞ্চভূত প্রধান। আমাদের গ্রন্থকার (রামমোহন) *A Second Defence of the Monotheistical System of the Vedas* শীর্ষক একখানি ইংরেজি পুস্তকে তাঁর মত খণ্ডন করেছেন।

এই গ্রন্থে তিনি উক্ত ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধে নূতন এবং সম্পূর্ণ অকাট্য যুক্তি উপস্থিত করেছেন এবং তাদের শঠতা, নীচতা ও নির্বুদ্ধিতার মুখোস খুলে দিয়েছেন। অন্যান্য কারণের মধ্যে এই সব মনোবৃত্তিই জাতিভেদপ্রথা ও জাতিচ্যুতিসংক্রান্ত বিধিবিধানের জন্য দায়ী। প্রাচীন বৌদ্ধদের মতই তিনি প্রমাণ করেছেন বর্তমানে অলংঘনীয় এই প্রথার কোনো অস্তিত্ব প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসে ছিল না, এবং এটি পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত। বর্ণ-প্রথার শিরোভাগে ব্রাহ্মণশ্রেণী অধিষ্ঠিত যাঁরা তাঁদের কাল্পনিক জন্মগত মর্যাদা ও গুণাবলীকে যত দূর সম্ভব ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নিজেদেরকে ভূমণ্ডলের দেবতা পর্যন্ত বলে থাকেন ; ভারতবর্ষে এঁরা হলেন, ইউরোপের অভিজাত সম্প্রদায় বা ফিউডাল সামন্ত-প্রভুদের তুল্য,—অবশ্য বহুগুণে নিকৃষ্ট ; এটুকু বললে যথেষ্ট বলা হল। এরা সামাজিক সংহতি শিথিল করে দিয়েছেন—কেবলমাত্র বিভিন্ন জাতির মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেই নয়, বলতে কি এক পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদেরও একের অপরের কাছ থেকে সরিয়ে এনে। এই ভাবে, প্রকাশ্যে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলতে চাইলে কোন হিন্দুর পক্ষে তার ভাইএর বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হয়ে ভাইএর সঙ্গে একত্র ভোজন করবারও উপায় নেই, এবং যদি তার ভাই অতিথিকে পরিবেশিত আহার্যের কোনটি ছুঁয়ে ফেলে অতিথিকে বাকী সব এমন কি ভোজনপাত্রগুলিও ফেলে দিতে হয়।

হিন্দুধর্ম কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রথমা স্ত্রী জীবিত থাকতেও মানুষকে এক বা একাধিক পত্নী গ্রহণ করবার অনুমতি দেয়, যেমন পত্নী দুশ্চরিত্রা হলে বা সুরাসক্তা হলে, অমিতব্যয়ী হলে, দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্তা হলে, বন্ধ্যা হলে, ইত্যাদি। কিন্তু এই অধিকারকে তুচ্ছ খুঁটিনাটি যোগ করে এত বাড়ানো হয়েছে যে কখনো কখনো পুরুষরা শুধুমাত্র তাদের পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য তিশ কি চল্লিশটি পর্যন্ত নারীকে বিবাহ করে থাকে।

স্বাভাবিক নীতিবিধান অপেক্ষা বৃথা আচারের উপর অধিক গুরুত্ব অর্পণ করার ফলেও (হিন্দুদের) নৈতিক সংস্কারে পরিবর্তন ঘটেছে। এইভাবে আমরা দেখতে পাই, ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রানুসারে কিছু কিছু আচার লংঘন করলেই সর্ববিধ অধিকার সমেত জাতিচ্যুত হতে হয়, কিন্তু খুন বা চুরি করলে, অথবা মিথ্যাসাক্ষ্য দিলে তা হয় না। সে সব ক্ষেত্রে শুদ্ধি ও প্রায়শ্চিত্তের বেশ সহজ উপায় আছে এবং তার অধিকাংশতেই ব্রাহ্মণরা দক্ষিণা পেয়ে থাকেন বলে যেগুলি তাঁদের পক্ষে বেশ লাভজনক। এই শুদ্ধিপ্রক্রিয়া ও প্রায়শ্চিত্তবিধি সংক্রান্ত বিষয়বস্তু ও পদ্ধতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভেদাভেদ, মালাজপের কার্যকারিতা, আবৃত্তি-পদ্ধতি —সব মিলিয়ে এক বিপুল শাস্ত্র গড়ে উঠেছে। এ নিয়ে এক বিরাট গ্রন্থাগার নির্মাণ করা যেতে পারে।

শিবপত্নী কালী বা পার্বতীর অপর নাম দুর্গা যে উচ্চারণ করে সে আজীবন ব্যভিচারে লিপ্ত থাকলেও দোষ হয় না ; এমন কি অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে হরিনাম নেয় বা অন্যচিন্তায় মগ্ন থেকে গঙ্গাদর্শন করে সে সর্বপাপ থেকে উদ্ধার পায়। বস্তুতঃ এই বিশ্বাসের, অর্থাৎ বিশেষ শক্তিসম্পন্ন জপমালার তথাকথিত পাপনাশক শক্তির সঙ্গে তুলনা করা চলে পোপ-

স্বাক্ষরিত পাপমুক্তিপত্রের যা কোনো কোনো ক্ষুদ্র পুস্তিকা বা কোনো পাদ্রীর মাধ্যমে ফ্রান্সে প্রচারিত হয়েছে।

বেদ বা পবিত্র গ্রন্থাবলী যার মধ্যে (হিন্দু) ধর্মতত্ত্ব নিহিত, আকারে বিপুল এবং এর আলোচ্য বিষয় সাধারণতঃ বিশৃঙ্খলভাবে ও রূপকরীতিতে বিবৃত। গ্রন্থকারের মতে দু'-হাজার বছরেরও আগে মহাত্মা ব্যাস এগুলিকে কতকটা বর্ণানুক্রমিক সূচীর মত সংক্ষিপ্তাকারে সজ্জিত করেন। এই সংক্ষিপ্তসারের নাম বেদান্ত,[৩৬] এবং এর প্রামাণ্য বেদের চেয়ে বিশেষ কম নয়। ঈশ্বর সত্তারএকত্বের স্বপক্ষে এতে সবরকম যুক্তিই আছে। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ এই বেদান্তব্যাখ্যার অধিকার সম্পূর্ণ নিজেদের হাতে রেখেছেন বলে, রামমোহন বাংলা ও হিন্দুস্তানীতে এর অনুবাদ করে স্বদেশীয়দের মধ্যে তা বিতরণ করেছেন; এবং তারপর, বর্তমান হিন্দু ধর্মের গ্লানিকর কুসংস্কারাত্মক আচারগুলি যে এর আদি রূপ হতে পৃথক,—তাঁর ইউরোপীয় বন্ধুদের কাছে তা প্রমাণ করবার জন্য গত বৎসর ইংরেজিতে বেদান্তের সংক্ষিপ্তসার প্রণয়ন করেছেন; তাঁর মূল প্রতিপাদ্য—ঈশ্বর বাক্যমনের অগোচর, সত্যস্বরূপ ও সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়কর্তা।

ঈশোপনিষদের অনুবাদে, হিন্দুদের এই পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্য থেকে উদ্ধৃত অংশগুলির মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে 'সোঽহমস্মি'।[৩৭] সেখানে এটি স্পষ্টতঃ (খ্রীষ্টীয়) পবিত্র গ্রন্থের মূল বচন ego sum qui sum এর সঙ্গে অভিন্ন। আমরা জানি, ভারতবর্ষে আজ পর্যন্ত সুপ্রচুর ঐতিহ্য বর্তমান যার সঙ্গে বাইবেলে বর্ণিত ঘটনাবলী, নীতিবাক্য ও আচার-ব্যবহারের মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। উইলিয়াম জোন্স্ এর অনেক উদাহরণ দিয়েছেন; মরেস কর্তৃক দুই খণ্ডে প্রকাশিত এক গ্রন্থের এটিই প্রধান আলোচ্য বিষয়; এবং সম্প্রতি ওয়ার্ড এ বিষয়ে বিস্তারিত ও অতীবচিন্ত্য তুলনাত্মক আলোচনা করেছেন।[৩৮] ম. দা' কোস্তা রামমোহনের যে বইগুলি পাঠিয়েছেন তার সব কখানিই ইংরেজিতে লিখিত। জীবন অতিমাত্রায় ক্ষণস্থায়ী, সময় অত্যন্ত মূল্যবান; অপর পক্ষে অন্তরে ধর্মের প্রেরণা দেয় এমন সব কিছুই অতিমাত্রায় আমাদের সমাদরের যোগ্য; সুতরাং আমাদের পক্ষে আলোচ্য গ্রন্থগুলির ফরাসীতে অনুবাদ করবার অবসরের অভাবের জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। যদি (আমাদের এই আলোচনার ফলে) কোনো সুপণ্ডিত ও উৎসাহী খ্রীষ্টান এই পরিকল্পনাকে রূপ দিতে আগ্রহী হন তাহলে আমরা খুবই সুখী হব। আবার রামমোহনপ্রসঙ্গে ফিরে আসি।

তিনি যে সাফল্য অর্জন করেছেন সেগুলি তার মনে (সংস্কারের) অন্যান্য ক্ষেত্রে গভীরতর সাফল্যের প্রত্যাশা জাগিয়েছে, এবং এ পর্যন্ত তাঁর প্রচেষ্টায় এই উৎসাহ অব্যাহত থাকায় তিনি একই উদ্দেশ্যে রচিত পরবর্তী অন্যান্য পুস্তকের প্রকাশও বিজ্ঞাপিত করেছেন। প্রতিপক্ষের আক্রমণ খণ্ডনে তাঁর সংযম, তাঁর দেওয়া যুক্তিসমূহের অকাট্যতা, হিন্দুশাস্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞান, তাঁর ক্ষমতার পরিচায়ক; অপরপক্ষে (এই সংগ্রামে) তিনি যে ভাবে (অকাতরে) নিজ অর্থ ব্যয় করে থাকেন তার মধ্যে তাঁর একান্ত নিঃস্বার্থপরতাই প্রকাশ পায়; সেটিও সর্বোচ্চ প্রশংসার ও উৎসাহপ্রদানের যোগ্য।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত জাতিবিভাগ তাদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হবার পথে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল। এই বাধা দুর্লংঘ্য নয়, এবং এর সঙ্গে অনুরূপভাবে যে বহুদেববাদ জড়িত হয়ে আছে তার অন্তর্নিহিত অসঙ্গতির জন্য তা কোনো সভ্যজাতির

মধ্যে দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারে না। একবার যদি হিন্দুদের বুঝিয়ে দেওয়া যায় ঈশ্বর মাত্র একজনই আছেন এবং সকল মানুষই সেই এক পিতার সন্তান যিনি সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখেন, তৎক্ষণাৎ পৌত্তলিকতা ও তৎসংক্রান্ত সর্ববিধ ব্রাহ্মণ্য কুসংস্কারের অবসান ঘটবে এবং খ্রীষ্টধর্মের জয়যাত্রার পথ সুগম হবে।

প্রমাণপঞ্জী :

১. *Translation of an Abridgment of the Vedant, or Resolution of all the Veds ; the most celebrated and revered work of Brahminical Theology. Likewise a Translation of the Cena Upanishad, one of the chapters of the Sama Veda ; according to the gloss of the celebrated Shancarach-arya establishing the unity and sole omnipotence of the Supreme Being ; and that He alone is the object of worshtp.* By Rammohun Roy. London : Printed for T. and J. Hoitt ; 1817

২. J. K. Majumder *Raja Rammohun Roy and Progressive Movements in India : A Selection from Records (1775-1845)* Calcutta 1941, pp.3-18.

৩ 'Observations sur quelques ouvrages de Rammohun Roy' *Journal Asiatique* I Ser. Tome III (October, 1823) pp.243-49 ; বঙ্গানুবাদের জন্য দ্রষ্টব্য বর্তমান লেখকের 'রামমোহন রায় ও ফরাসী বিদ্বন্মণ্ডলী,' বিশ্বভারতী পত্রিকা, পঞ্চদশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, পৃঃ ৬২-৭৪।

৪. *Revue Encyclope'dique* December 1832,pp.694-706 ; বঙ্গানুবাদের জন্য দ্রষ্টব্য 'ফ্রান্সে সমকালীন রামমোহন গ্রন্থ-সমালোচনা', তত্ত্বকৌমুদী, পরিশিষ্ট-১, ১৩৮৪, পৃঃ ২২-৪১।

৫. *Chronique Religieuse* Vol III (1819) pp 388-403

৫ক. Mary Carpenter *The Last Days in England of the Rajah-Rammohun Roy* (Reprinted Calcutta 1915) pp. 49-51।

৬ 'Chronique Religieuse' এ মুদ্রিত প্রবন্ধটির ৩৯৬ পৃষ্ঠায় প্রথম অনুচ্ছেদের নীচে ৮ নভেম্বর ১৮১৮ তারিখ দেওয়া আছে। মনে হয়, ৩৮৮ পৃষ্ঠা থেকে ৩৯৬ পৃষ্ঠার ঐ তারিখ চিহ্নিত অংশটুকু প্রথম কিস্তিতে ঐ তারিখে পাঠানো হয়েছিল। পরবর্তী অংশ (পৃঃ ৩৯৬-৪০৩) ঐ তারিখের মধ্যে পাঠানো হতে পারে না ; কেননা কলিকাতা থেকে রামমোহনের যে বইগুলি গ্রেগোয়ার পেয়েছিলেন তার মধ্যে ছিল রামমোহনের সতীদাহ বিষয়ক প্রথম ইংরেজি গ্রন্থ যার ভূমিকাটির রামমোহন প্রদত্ত তারিখ ৩০ নভেম্বর ১৮১৮ ; সুতরাং বইখানি জনসাধারণের সামনে আসে নিঃসন্দেহে ঐবছরের ডিসেম্বর মাসে (**Parmi les ouvrages envoye's du Bergale, se trouve la traduction anglaise, imprime'e en de'cembre 1818, d'une confe'rence...contre l'usage de bruler, vivantes, les veuves sur le bucher de leurs maris**)। তাই মনে হয় প্রবন্ধের পরবর্তী অংশের উপকরণ গ্রেগোয়ার পেয়েছিলেন দ্বিতীয় কিস্তিতে। ৮ নভেম্বর ১৮১৮ এর পরে কোনো সময়ে

তা প্রেরিত হয়েছিল। দুটি কিন্তু অবশ্য ১৮১৯ সালের প্রথম দিকে বিভিন্ন সময়ে তাঁর হস্তগত হয়ে থাকবে।

৭। এ সম্পর্কে দ্রষ্টব্য, বর্তমান লেখকের 'রামমোহনের বংশপরিচয়'—কালি ও কলম, ষষ্ঠ বর্ষ, নবম সংখ্যা (বৈশাখ, ১৩৮০), পৃঃ ১২৮৯-১৩০০।

৮. রামমোহন যে ইউরোপীয় উচ্চ গণিতশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এমন পরোক্ষ ইঙ্গিত সমসাময়িক সূত্রে পাওয়া যায়। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের কার্যবিবরণে তাঁর সম্পর্কে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ভিত্তিতে লেখা হয়েছে : "Rama-Mohana-Raya a very rich Rarhee Brahman of Calcutta, is a respectable Sanskrit scholar, and is so well versed in Persian that he is called Mouluvee Rama-Mohana-Raya ; he also writes English with correctness and reads with ease English mathematical and metaphysical works" *Periodical Accounts relative to the Baptist Missionary Society* Vol VI, No. 31 (From June 1815 to January 1 16). Bristol 1817, pp. 106-07 ; এ বিষয়ে রামমোহনের কিছু খ্যাতিও ছিল, কেননা স্কুল বুক সোসাইটি ফার্গুসন রচিত Introduction to Astronomyর যে বাঙলা অনুবাদ প্রস্তুত করেন সেখানি পরিমার্জন করবার ভার তাঁরা রামমোহন ও মিঃ গর্ডনের উপর দিয়েছিলেন (*The Third Report of the School Book Society's Proceedings : Third Year 1819-20* Baptist Mission Press, Calcutta 1820-21, pp. 7-8)। তাছাড়া দেখা যায় রামমোহন আইজাক নিউটনের রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং এই মহামনীষীকে one the greatest mathematicians.. that ever existed বলে উল্লেখ করেছেন ('Second Appeal to the Christian Public' *English Works of Raja Rammohun Roy* Sadharan Brahmo Samaj. Part VI, Calcutta 1951, pp 8?-90)। আলোচ্য নিবন্ধে তাঁর গণিতশিক্ষা সংক্রান্ত একটি নির্ভরযোগ্য বাস্তব তথ্য সর্বপ্রথম পাওয়া গেল।

৯. লেখক রামমোহনের বংশগত সরকারী খেতাব 'রায়' এর সঙ্গে কৌলিক উপাধি 'বাঁড়ুয্যা'-রও উল্লেখ করেছেন। তাঁর প্রদত্ত সম্পূর্ণ নাম 'রামমোহন রায় বাঁড়ুয্যা'। 'Banoudjia' শব্দটি 'বাঁড়ুয্যার' ঈষৎ উচ্চারণবিকৃতি।

১০. 'রামকান্ত রায়' নামটি প্রবন্ধে দুবার উল্লিখিত হয়েছে (পৃঃ ৩৮৮,৩৮৯) ; দুই স্থানেই বানান দেখা যায় 'Ram-hant-Roe'।

১১. 'ব্রজবিনোদ রায়' নামটি ভুল বানানে লেখা হয়েছে 'Roe-Bry-Binad' (পৃ ৩৮৮)।

১২. রামমোহনের পিতামহ ব্রজবিনোদ রায় মোগলদের অধীনে চাকরী করেন নি ; তিনি বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁর অধীনে মুর্শিদাবাদ নবাব-সরকারের কর্মচারী ছিলেন। তবে মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম (১৭৫৯-১৮০৬) ভাগ্যবিপর্যয়হেতু যখন পূর্বভারতে অবস্থান করছিলেন সে-সময় তিনি সম্রাটের কিছু উপকার করেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনকে লিখিত এক পত্রে তৎকালীন মোগলসম্রাট দ্বিতীয় আকবর শাহকে রামমোহনের পিতামহ কর্তৃক দ্বিতীয় শাহ আলমকে প্রদত্ত এই সাহায্যের

সপ্রশংস উল্লেখ করতে দেখা যায় (Brajendra Nath Banerji *Rajah Rammohun Roy's Mission to England* pp. 3-4 ; J.K Majumdar *Raja Rammohun Roy and the Last Moghuls* p. 331)।

১৩. রামমোহনের পৈত্রিক নিবাস বর্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রাম। সে সময়ে এটি বর্ধমান চাকলার অন্তর্গত ছিল। লেখক রাধানগর গ্রামের উল্লেখ কোথাও করেন নি, সাধারণভাবে সর্বত্র রামমোহনকে বর্ধমানের অধিবাসী বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন (পৃ: ৩৮৮,৩৯৬)।

১৪. রামমোহনের সংস্কৃতশিক্ষার ইতিহাস ভালভাবে জানা যায় না। তাঁর পিতৃকুলে সংস্কৃতের চেয়ে সাংসারিক প্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তৎকালীন রাজভাষা ফার্সী শিক্ষার উপরই ঝোঁক ছিল বেশী। তদনুসারে তাঁর পিতার ব্যবস্থায় মাতৃভাষার সঙ্গে রামমোহনকে ফার্সী পড়ানো হয়। অবশ্য নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হিসাবে কুলাচারের জন্য যেটুকু সংস্কৃতশিক্ষা আবশ্যক তার ব্যবস্থাও পৌত্রিক তত্ত্বাবধানে গ্রামেই নিশ্চয় হয়েছিল। কিন্তু আরবী ও সংস্কৃত রামমোহন ভাল করে শেখেন নিজের একান্ত আগ্রহে—হিন্দু ও মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতির মর্মবাণী আয়ত্ত করবার উদ্দেশ্য নিয়ে। আরবী শিক্ষা সম্পন্ন হয়েছিল পাটনায়। তাঁর সংস্কৃত শিক্ষার ইতিহাসে সম্ভবতঃ তিনটি পর্যবিভাগ করা যায় ঃ (১) বাল্যে ও কৈশোরে স্বগ্রামে ব্রাহ্মণ-সন্তানের পক্ষে আবশ্যক প্রাথমিক শিক্ষা ; (২) কলিকাতাবাসের প্রথম পর্বে (১৭৯৬-৯৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ) লব্ধ উচ্চতর শিক্ষা, লেখক যার উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ৩৮৮) ; (৩) কাশীতে উপনিষদ বেদান্ত অনুশীলন (লেখক যার উল্লেখ করেন নি)। রামমোহনের সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থগুলিতে সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও শাস্ত্রে তাঁর যে গভীর ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায় তা দীর্ঘকালের সাধনায় অর্জিত। সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র অধ্যয়ন-অনুশীলনে তাঁর প্রেরণার উৎস সম্ভবতঃ দুটি ঃ (১) শাস্ত্রব্যবসায়ী মাতৃকুলের প্রতি শ্রদ্ধা ; (২) আকৈশোর সুপণ্ডিত তান্ত্রিক সন্ন্যাসী হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর সঙ্গলাভ।

১৫. রামকান্ত রায়ের মৃত্যু হয় ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের মে-জুন মাসের (জ্যৈষ্ঠ ১২১০ বঙ্গাব্দ) কোনো সময়ে। প্রকৃতপক্ষে রামকান্ত রায় তার মৃত্যুর সাত বৎসর পূর্বে ১ ডিসেম্বর ১৭৯৬ (১১ অগ্রহায়ণ ১২০৩ বঙ্গাব্দ) তারিখে তাঁর স্থাবর সম্পত্তির অধিকাংশ তিন পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দেন। লেখক রামকান্তর মৃত্যুর সালটি ঠিক জানতেন না, আন্দাজে ১৮০৪ কিংবা ১৮০৫ বলে উল্লেখ করেছেন।

১৬. রামকান্ত রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র জগমোহনের মৃত্যু হয় রামকান্তর মৃত্যুর নয় বছর পরে, ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল (চৈত্র ১২১৮ বঙ্গাব্দ) মাসে। সে-হিসাবে লেখকের উক্তি son fils aine' mourut aussi bientot apres বিভ্রান্তিকর।

১৭. গ্রন্থখানি রামমোহন রচিত 'তুহফাৎ-উল্-মুওয়াহহিদিন'। এখানি মুর্শিদাবাদ থেকে আনুমানিক ১৮০৩-০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। লেখকপ্রদত্ত গ্রন্থ-শিরোনামের অনুবাদটি যথাযথ নয়, ভূমিকাতে উল্লেখ করেছি।

১৮. এই গ্রন্থের বক্তব্য কেউ খণ্ডন করবার চেষ্টা করেন নি একথা ঠিক নয়। জরথুষ্ট্রীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে সে চেষ্টা হয়েছিল। প্রতিপক্ষের বক্তব্য কি ছিল তা সঠিক

জানা না গেলেও রামমোহনের পক্ষ থেকে তার উত্তরে আনুমানিক ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে "জবাব-ই-তুহ্ফাৎ-উল-মুওহ্হিদিন" শীর্ষক এক ফার্সী পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। বর্তমান লেখক ব্রিটিশ মিউজিয়ম গ্রন্থাগারে রক্ষিত সেই পুস্তিকার নকল আনিয়ে সেটি সর্বপ্রথম টীকাটিপ্পনী সহ বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। দ্রষ্টব্য তত্ত্ব-কৌমুদী ১-১৬ শ্রাবণ, ১৩৭৬, পৃঃ ৮১-৮৪; ১-১৬ ভাদ্র, ১৩৭৬, পৃঃ ১০৬-০৯; ১-১৬ আশ্বিন, ১৩৭৬, পৃঃ ১২২-২৯; অনুবাদের ভূমিকায় পুস্তিকাটির অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করে অনুবাদক সিদ্ধান্ত করেছেন, এটি রামমোহনের নিজ রচনা নয়, সম্ভবতঃ তাঁর কোনো অনুরাগী মুসলমান বন্ধু 'তুহ্ফাৎ' এর পক্ষ অবলম্বন করে এই জবাব দিয়েছিলেন।

১৯ ইউরোপীয়দের মনস্তুষ্টির জন্য রামমোহন খ্রীষ্টীয় নীতিশাস্ত্রের প্রশংসা করেন নি। খ্রীষ্টের নীতি উপদেশগুলিকে তিনি আন্তরিকভাবেই অতি উচ্চশ্রেণীর মনে করতেন। আলোচনা-প্রসঙ্গে শিষ্য চন্দ্রশেখর দেবকে তিনি বলেছিলেন খ্রীষ্টের নীতিবাক্যা-মৃতের অনুরূপ শিক্ষা বৈদিক সাহিত্যেও আছে—কিছুটা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আকারে ("The Vedas contain the same lessons of morality but in a scatt red form ...". চন্দ্রশেখর দেব 'Reminiscences of Rammohun Roy' তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৭৯৪ পৃঃ ১৪০)। ১৮২০ সালে রামমোহন The Precepts of Jesus প্রকাশ করে সুখ-শান্তির আকররূপে খ্রীষ্টনীতির শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে দেখা যাচ্ছে অন্ততঃ এর দু'বছর আগেই তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন।

২০. এই 'কামো' নামক রহস্যময় মদ্যপিপাসু ব্যক্তিটি কে তা জানা যায় না। লেখক এখানে স্পষ্টতঃ রামমোহন কর্তৃক ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় স্থাপিত 'আত্মীয় সভা'র অধিবেশনের উল্লেখ করেছেন। 'আত্মীয় সভা'র প্রথম যুগের সভ্যগণের মধ্যে এমন কোনো নাম আমাদের জানা নেই যার বিকৃত বিদেশী উচ্চারণ 'কামো (Kamo) হতে পারে। 'আত্মীয় সভা'র অধিবেশন প্রতি সপ্তাহে একবার হত, হয় রামমোহনের মানিকতলার বাড়ীতে, না হয় অন্য কোনো সভ্যের বাড়ীতে—প্রতিবারই রামমোহনের বাড়ীতে নয়। সমসাময়িক বর্ণনায় এই অধিবেশনগুলিতে সভ্যগণ পানভোজন করতেন এমন উল্লেখ নেই। সভ্যগণ সকলে সমাজে অল্পপরিচিত বা অখ্যাতনামা ছিলেন না। সভায় বেদ-উপনিষদ্ পাঠ, সঙ্গীত ও সামাজিক নানা কুসংস্কারজনিত সমস্যা ও তার প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা হত। ১৮ মে, ১৮১৯ তারিখের 'এসিয়াটিক জার্নাল' ইণ্ডিয়া গেজেট থেকে একটি তৎসাময়িক অধিবেশনের বর্ণনা এইভাবে দিয়েছেন: **At the meeting in question, it is said, the absurdity of the prevailing rules respecting the intercourse of the several casts (sic.) with each other and of the restrictions on diet etc. was freely discussed and admitted—the necessity of an infant widow passing her life in a state of celebacy—the practice of polygamy and of suffering widows to burn with the corpse of their husbands were condemned—as well as the superstitious**

ceremonies in use amongst idolaters. Select passages from the Oppunishuds of the Veds—were read and explained ; and hymns were sung expressive of the faith of the audience in the doctrines there taught." । উপস্থিত সদস্যগণ সম্পর্কে উক্ত বর্ণনায় পাওয়া যায় ঃ "The meeting was attended by some of the members of many of the families most eminent for wealth or learning amongst the Hindoo inhabitants." । দেখা যাচ্ছে আলোচ্য ফরাসী প্রবন্ধের লেখকের রামমোহনের 'আত্মীয় সভা' সম্পর্কে খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল না, এবং এর বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি রামমোহনের বিরুদ্ধপক্ষীয়গণ প্রচারিত গুজবের দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রথম পর্বে যাঁরা 'আত্মীয় সভা'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁদের মধ্যে গোপীমোহন ঠাকুর, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, জয়কৃষ্ণ সিংহ, ব্রজমোহন মজুমদার, কৃষ্ণমোহন মজুমদার, কাশীনাথ মল্লিক, হলধর বসু, রাজনারায়ণ সেন, নন্দকিশোর বসু, রামনৃসিংহ মুখোপাধ্যায়, ব্রজমোহন সেন, ভৈরবচন্দ্র দত্ত, লক্ষ্মীনারায়ণ সরকার, দেওয়ান মোতিচাঁদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শাস্ত্রপাঠ করতেন প্রধানতঃ পণ্ডিত শিবপ্রসাদ মিশ্র, প্রধান গায়ক ছিলেন গোবিন্দ মালা। দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি নিয়মিত যোগ দিতে আরম্ভ করেন সম্ভবতঃ কিছুকাল পর থেকে।

২১· রামমোহন ব্রাহ্মণ্য বর্ণসংস্কারে বিশ্বাস না করলেও প্রকাশ্যে ব্রাহ্মণ্য আচার লংঘন করতেন না। তাই তাঁর প্রতিপক্ষগণও অনেকদিন পর্যন্ত প্রকাশ্যভাবে তাঁকে জাতিচ্যুত করতে পারেন নি। তাছাড়া তাঁর মণ্ডলীর মধ্যেও সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশীয় বেশ কিছু উদারপন্থী এবং শিবপ্রসাদ মিশ্র, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ প্রমুখ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। তবে সামাজিকভাবে তাঁকে প্রকাশ্যে জাতিচ্যুত না করলেও কলিকাতার রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ জনজীবনে একাধিক কর্মক্ষেত্রে তাঁর প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ সভা, গৌড়ীয় সমাজ প্রভৃতি থেকে তাঁকে অতি সুপরিকল্পিতভাবে বর্জন করা হয়েছিল ; কিন্তু রামমোহনের অন্তরঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির এসব প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদলাভে বাধা সৃষ্টি করা হয় নি।

২২ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেই রামমোহন শুঁড়াপল্লীতে নিজব্যয়ে ইংরেজি শিক্ষার জন্য এই বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন। ১৮২২ সালে তিনি এটিকে এ্যাংলো-হিন্দু স্কুলে রূপান্তরিত করেন। রামমোহনের জীবনীকার শ্রীমতী কলেট এমনভাবে এ্যাংলো-হিন্দু স্কুলের উল্লেখ করেছেন যার থেকে মনে হতে পারে ১৮২২-এই রামমোহন এটি প্রথম স্থাপন করেছিলেন (*Life and Letters of Raja Rammohun Roy* ed. Dilip Kumar Biswas and Prabhat Chandra Ganguli, Calcutta 1962 ; p. 184)। কিন্তু এমন ধারণা করলে ভুল হবে। এই বিদ্যালয়ের পূর্বেতিহাস সম্পর্কে দ্রষ্টব্য, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "Rammohun Roy as an Educational Pioneer" *Journal of the Bihar and Orissa Research Society* Vol. XVI Pt. II pp. 154-75। বর্তমান নিবন্ধে

১৮২২এর বহু পূর্বেই রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত উক্ত বিদ্যালয়ের একটি অজ্ঞাতপূর্ব নির্ভরযোগ্য সমসাময়িক উল্লেখ পাওয়া গেল।

২৩. এখানে 'বেদ' বলতে 'বেদান্ত' বুঝতে হবে। রামমোহন বেদান্তের শ্রুতিপ্রস্থান 'উপনিষদ্', ন্যায়প্রস্থান 'ব্রহ্মসূত্র' এবং স্মৃতিপ্রস্থান 'গীতা'—এই প্রস্থানত্রয়ের ব্যাখ্যাতা। এ ক্ষেত্রে তিনি শংকর রামানুজ প্রভৃতি পূর্বাচার্যদের প্রবর্তিত ধারাকেই অনুসরণ করেছিলেন এবং শ্রুতিপ্রামাণ্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এই দৃষ্টিতে ভাষ্যকারগণ শাস্ত্রের প্রবর্তক নন, নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা মাত্র। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, রামমোহন 'বেদ' অর্থে সর্বদা বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষদ্‌ভাগকে বুঝতেন। বৈদিক কর্মকাণ্ডে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল না।

২৪. কলিকাতায় রামমোহনের প্রথম ও প্রধান প্রতিপক্ষ ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি রামমোহনের 'বেদান্তগ্রন্থ' (১৮১৫)-এর বিরুদ্ধে লেখেন 'বেদান্তচন্দ্রিকা'। জনৈক ইউরোপীয় (সম্ভবতঃ স্যার ফ্রান্সিস্ ম্যাকনাটেন) কৃত তার ইংরেজি অনুবাদ *An Apology for the Present system of Hindoo Worship*ও তৎসহ প্রকাশিত হয়। রামমোহন এই আক্রমণের প্রত্যুত্তরে দুখানি গ্রন্থ রচনা করেন, 'বাংলায় ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' (১৮১৭) ও ইংরেজিতে *A Second Defence of the Monotheistical System of the Vedas (1817)*। মাদ্রাজে রামমোহনের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণা করেন মাদ্রাজ সরকারী কলেজের ইংরেজী শিক্ষক শংকর শাস্ত্রী। ডিসেম্বর ১৮১৬ সংখ্যা *The Madras Courier*এ তিনি একটি দীর্ঘ পত্র প্রকাশ করে রামমোহনের বেদান্তমতকে আক্রমণ করেন। এর প্রত্যুত্তরে রামমোহন কলিকাতা থেকে ১৮১৭ সালে প্রকাশ করেন *A Defence of Hindoo Theism in reply to the attack of an Advocate of Idolatry at Madras.*

২৫. খ্রীষ্টীয় মেথডিস্ট সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে ১৮১৮র মধ্যে কোনো সময় রামমোহনকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করবার চেষ্টা হয়েছিল এটি একটি নূতন সংবাদ। এই সংক্রান্ত কোনো সমসাময়িক স্পষ্ট উল্লেখ এ পর্যন্ত কোথাও পাওয়া যায় নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জন ও চার্লস ওয়েসলী ভ্রাতৃদ্বয় এ্যাংলিকান চার্চের মধ্যে জনসেবামূলক এই বিরাট মেথডিস্ট্ আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই গোষ্ঠীর সঙ্গে রামমোহনের কোনো তর্কবিতর্ক হয়েছিল কিনা জানা যায় না। উইলিয়ম এ্যাডামের সাক্ষ্যানুসারে এ্যাংলিকান চার্চের পক্ষ থেকে বিশপ মিড্‌লটন একবার রামমোহনকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছিলেন। রামমোহন অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করেন। লেখক এই ঘটনাকে মেথডিস্টগণের প্রচেষ্টা মনে করেছেন কিনা সঠিক জানবার উপায় নেই। ব্যাপটিস্ট্‌দের সঙ্গে রামমোহনের তর্কযুদ্ধ হয় ১৮২০র পর।

২৬. তৎকালীন ইউরোপীয়গণের মধ্যে সচরাচর আত্মশ্রেষ্ঠত্বে নিঃসংকোচ বিশ্বাস ও অখ্রীষ্টান ভারতীয় বিশেষতঃ হিন্দুগণের প্রতি যে অবজ্ঞা ও ঘৃণার প্রকাশ দেখা যেত, লেখক তার থেকে মুক্ত নন।

২৭. রামমোহন সরকারী চাকরী বা ব্যবসায় দ্বারা অর্থোপার্জনকে কখনো নিজের পক্ষে মর্যাদাহানিকর গণ্য করেন নি।

২৮. রামমোহনের জন্ম-বৎসর লেখক ১৭৮০ ধরেছিলেন, সে হিসাবে ১৮১৮-১৯এ তাঁর বয়স ৩৮-৩৯ হয়। এ হিসাব অবশ্যই ভ্রমাত্মক। রামমোহনের বয়স এই সময় (জন্মসাল ১৭৭২ বা ১৭৭৪ ধরলে) ৪৬ অথবা ৪৪।

২৯. রামমোহনের মুখমণ্ডলে যে ঈষৎ-বিষণ্ণতার একটি আভাস ছিল এমন সাক্ষ্য কোনো কোনো প্রত্যক্ষদর্শী দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে তাঁর পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে এ কথা শুনেছিলেন। নিজের বাল্যবয়সে রামমোহনকে অনেকবার দেখবার সৌভাগ্য দেবেন্দ্রনাথের হয়েছিল ('ভারতপথিক রামমোহন রায়'—রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী সংস্করণ, ১৩৬৬, পৃঃ ৮১)।

৩০. এটি লেখকের অলস কল্পনা। কলিকাতায় স্থায়ী হবার পর থেকেই রামমোহন ইউরোপ যাত্রার আয়োজন করতে থাকেন। ১৮১৬ বা ১৮১৭ সালের প্রথম দিকে তিনি ইংলন্ডে তাঁর মনিব ও বন্ধু জন ডিগবীকে এক পত্রে লেখেন, "This engagement [ধর্মপ্রচার] has prevented me from proceeding to Europe as soon as I could wish. But you may depend upon my setting off for England within a short period of time, and if you do not return to India before October next, you will most probably receive a letter from me, informing you of the exact time of my departure for England, and of the name of the vessel on which I shall embark." (Collet *op. cit.* p. 72)। কর্মবিপাকে তাঁর ইউরোপযাত্রায় বিলম্ব হয়েছিল, পতিতাপ্রীতির জন্যে নয়।

৩১. এই উক্তিও আশ্চর্যজনক। সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে রামমোহনের সংগ্রামের কথা লেখক যে শুধু জানতেন তাই নয়, ১৮১৮ সালে প্রকাশিত সতীদাহের বিরুদ্ধে রামমোহনের প্রথম গ্রন্থখানির উল্লেখও তাঁর বর্তমান প্রবন্ধেই আছে। বইখানি (ইংরেজি অনুবাদে) তিনি ম. দা' কোস্তার কাছ থেকে পেয়েছিলেন (Parmi les ouvrages envoye's du Bengale, se trouve la traduction anglaise, imprime'e en decembre 1818 d'une confe'rence originairement e'crite en bungla, contre l'usage de bru'ler, vivantes, les veuves sur le bucher de leurs maris)। এই বিপদ থেকে ভারতীয় নারীজাতিকে উদ্ধার করবার সংগ্রাম অবশ্যই নারীমুক্তি আন্দোলনের পর্যায়ভুক্ত। 'সহমরণের বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সংবাদ' এর ইংরেজি অনুবাদ (১৮২০) লেখকের তখনো পড়বার সুযোগ হয় নি, নতুবা তিনি দেখতে পেতেন এর শেষ কয়েকটি অনুচ্ছেদে সমাজে নারীজাতির দুর্দশা বর্ণনা করতে গিয়ে রামমোহনের ভাষা আবেগপূর্ণ হয়ে পড়েছে। তেমনি হিন্দু উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী হিন্দু নারীর দায়াধিকারের দাবী রামমোহনই এ যুগে প্রথম তোলেন। এ বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮২২ সালে আলোচ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার তিন বছর পরে। কুলগুরুপ্রথা উঠিয়ে দিয়ে স্বীয় পরিবারের মহিলাদের গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত করে রামমোহন ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারও নারীজাতির নিকট উন্মুক্ত করেছিলেন (হেমলতা দেবী, 'ঘরোয়া ব্যাপারে

রামমোহন' *Father of Modern India : Co nmemoration Volume of the Rammohun Roy Centenary Celebrations 1933*; Calcutta 1935, pt. II p. 283)। দেশী, বিদেশী সমসাময়িক সূত্রে জানা যায় নারীজাতিকে রামমোহন সর্বদা অতিশয় শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখতেন।

৩২. বাংলা গ্রন্থখানি 'সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদ' ১৮১৮); এর ইংরেজি অনুবাদ *Translation of a Conference between an Advocate for, and an Opponent of, the Practice of Burning Widows Alive* (1818).

৩৩. রামমোহন তাঁর 'বেদান্তগ্রন্থ' (১৮১৫) ও 'বেদান্তসার' (১৮১৫) গ্রন্থদ্বয়ের প্রথমখানিতে মূল সংস্কৃতে যথাক্রমে বঙ্গানুবাদ সহ সমগ্র ব্রহ্মসূত্র এবং দ্বিতীয়টিতে তার সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করেন। দুখানি গ্রন্থের হিন্দুস্তানী অনুবাদও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। ১৮১৬ তে 'বেদান্তসার' এর ইংরেজি অনুবাদ *Translation of an Abridgement of the Vedant* প্রকাশিত হয়। এর ভূমিকাতেই বাংলা ও হিন্দুস্তানী সংস্করণ-দ্বয়ের উল্লেখ আছে। লেখক 'বেদান্তসার'এর ইংরেজি অনুবাদখানিই পেয়েছিলেন এবং তার ভূমিকা থেকে বাংলা ও হিন্দুস্তানী অনুবাদের কথা জেনেছিলেন। 'বেদান্তগ্রন্থ' ইংরেজিতে অনূদিত হয় নি।

৩৪ *Madras Courier* এ প্রকাশিত পূর্বোল্লিখিত শংকর শাস্ত্রীর পত্র (১৮১৬) ও তদুত্তরে রামমোহন কর্তৃক *A Defence of Hindoo Theism* (১৮১৭) প্রকাশ।

৩৫. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক 'বেদান্তচন্দ্রিকা' (১৮১৭) ও জনৈক ইউরোপীয় কর্তৃক তার ইংরেজি অনুবাদ (১৮১৭) প্রকাশ।

৩৬. ব্যাসকৃত 'ব্রহ্মসূত্র' এখানে উল্লিখিত।

৩৭. ঈশোপনিষৎ, ১৬ ঃ 'যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি'।

৩৮. উল্লিখিত গ্রন্থ দু'খানি (১) S. Bruder *Oriental Customs*, etc. (London 1802); (২) W. Ward *Account of the Writings, Religion and Manners of the Hindoos* Four Volumes (Scrampore, 1811)।

পরিষদ্-সংবাদ

শোকসংবাদ ঃ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি গত ২৮শে মাঘ, ১৩৮৭ তারিখের অধিবেশনে পরিষদের অন্যতম হিতৈষী কালিদাস মল্লিক এবং কবি গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের জীবনাবসানে শোকজ্ঞাপক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। প্রয়াত কালিদাস মল্লিক আরতি মল্লিক ট্রাস্ট নামে পরিষদে যে স্থায়ী অনুদান তহবিল গঠন করিয়াছেন তাহার দ্বারা দীর্ঘকাল পরে সাহিত্য সাধক চরিতমালার নূতন নূতন গ্রন্থ প্রকাশ হইতেছে। প্রয়াত ব্যক্তিদ্বয়ের প্রতি কার্যনির্বাহক সমিতি যথোচিত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।

বিশেষ অধিবেশন ঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ প্রকাশ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের যৌথ উদ্যোগে গত ৩রা মাঘ, ১৩৮৭ (ইং ১৭ জানুয়ারী, ১৯৮১) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ প্রকাশ উপলক্ষে এক বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডঃ সুকুমার সেন এই উপলক্ষে পরিষদের রমেশভবনে শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, চিঠিপত্র ও গ্রন্থাদির পাণ্ডুলিপির একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা করা হয়।

স্বাগত ভাষণে পরিষদের সম্পাদক শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস পরিষদের সঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয়ের গভীর সংযোগের এক দীর্ঘ তথ্যপূর্ণ বিবরণ দেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক শম্ভু ঘোষ পঃ বঃ সরকারের সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক পর্ষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহের ১ম খণ্ড আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হইল বলিয়া ঘোষণা করেন। নৈহাটীর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১২৫তম জন্মোৎসব কমিটির সভাপতি শ্রীদীনেশচন্দ্র তপাদার বিশেষ অতিথি হিসাবে ভাষণ দেন। শ্রীসত্যজিত চৌধুরী হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাঁহার জীবনের সামাজিক দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভাপতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে একজন সত্যকার ভারত তত্ত্ববিদ্ বলিয়া ঘোষণা করেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদের সচিব শ্রীদিব্যেন্দু হোতা উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

রাজশেখর বসুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন ঃ

গত ৩০শে ফাল্গুন, ১৩৮৭ (ইং ১৪. ৩. ১৯৮১) পরিষদ ভবনে রাজশেখর বসুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এক বিশেষ অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য।

পরিষদের সম্পাদক তাঁহার স্বাগত ভাষণে রাজশেখর বসুর বহুমুখী প্রতিভার উৎস সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি পারিবারিক ও ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রাজশেখর বসুর প্রতিভার বিকাশ বিষয়ে আলোকপাত করেন। এই অধিবেশনের মূল বক্তা ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার হাস্যরস সৃষ্টিতে রাজশেখর বসুর অবদান বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ডঃ সরোজমোহন মিত্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় রাজশেখর বসুর ঐতিহাসিক অবদান

সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভাপতি শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য বিজ্ঞানী, ভাষাতত্ত্ববিদ রাজশেখর এবং হাস্যরস স্রষ্টা পরশুরাম এই দুই জনে তাঁহার আলোচনাকে বিস্তারিত করিয়া রাজশেখরের সামাজিক অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভাশেষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পরিষদের সহ সম্পাদক শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী।

নির্মলকুমার বসু স্মারক বক্তৃতা ঃ

গত ২১ শে চৈত্র, ১৩৮৭ (ইং ৪টা এপ্রিল, ১৯৮১) শনিবার পরিষদ ভবনে নির্মলকুমার বসু স্মারক বক্তৃতাদান অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীনীহাররঞ্জন রায়। সম্পাদক শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস স্বাগত ভাষণে নির্মলকুমার বসুর কর্মনিষ্ঠ জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জন্য তিনি কি ভাবে অমূল্য সময় ব্যয় করিয়াছিলেন তাহা আলোচনা করেন।

বর্তমান বৎসরে স্মারক বক্তৃতা দেন অধ্যাপক শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার পঠিত প্রবন্ধের বিষয় ছিল "গাঙ্গেয় ভূমি ও ব-দ্বীপের বৈশিষ্ট্য ও ভৌগোলিক গুরুত্ব"। সভাপতি প্রথমে নির্মলকুমার বসু সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তারপর বক্তার পাণ্ডিত্য ও বক্তব্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সাংগঠনিক সংবাদ ঃ

(ক) গত ২৪ ফাল্গুন, ১৩৮৭ তারিখের অধিবেশনে কার্যনির্বাহক সমিতি ১৩৮৮ বঙ্গাব্দের জন্য নিয়মাবলী অনুযায়ী ১৭ জন কর্মাধ্যক্ষের নাম সর্বসম্মতভাবে মনোনীত করিয়াছেন।

(খ) গত ২৪ ফাল্গুন তারিখের অধিবেশন কার্যনির্বাহক সমিতি পরিষদের জন্য একটি মাইক্রোফোন ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

(গ) ২২ চৈত্র, ১৩৮৭ এর মাসিক অধিবেশনে অধ্যাপক নরেশচন্দ্র জানা, অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভৌমিক, অধ্যাপক পাঁচুগোপাল দত্ত এবং অধ্যাপক বিষ্ণু বসু ১৩৮৮ বঙ্গাব্দের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যগণের নির্বাচনের ভোট পরীক্ষক নির্বাচিত হইয়াছেন। উক্ত অধিবেশনেই এই ভোট গণনার তারিখ স্থির হয় ৫ই বৈশাখ, ১৩৮৮।

পত্রিকা প্রসঙ্গ ঃ

পরিষদের নিয়মাবলী অনুযায়ী প্রতি বৎসর পরিষৎ পত্রিকার চারিটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। কার্যনির্বাহক সমিতি এই নিয়ম পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল পরে বৎসরে নিয়মানুযায়ী চারিটি সংখ্যা পত্রিকাই এই বৎসর প্রকাশিত হইল।

...ত্রৈমাসিক পরিষৎ পত্রিকা যাহাতে চতুর্থ মাসেই প্রকাশিত হয় অতপর তাহার জন্য চেষ্টা করা হইবে।

পরিষৎ পত্রিকার ৮৭ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের 'গিরিশোত্তর যুগে নাট্য প্রয়োগ' প্রবন্ধটি 'রামকমল সিংহ স্মারক বক্তৃতা ১৩৮৭' হিসাবে গত ১৭ জ্যৈষ্ঠ এবং ১৮ জ্যৈষ্ঠ পরিষদ ভবনে পঠিত হয়। অনবধানতাবশত মুদ্রিত প্রবন্ধের শেষে ইহা উল্লিখিত হয় নাই।

১৩৮৭ বঙ্গাব্দে উপহৃত পুস্তকের তালিকা

অচল ভট্টাচার্য ; ১০/১ হেম ব্যানার্জী লেন, শিবপুর, হাওড়া-২

১। হাওড়া জেলার ইতিহাস, ১ম খণ্ড—অচল ভট্টাচার্য

অনাদিভূষণ দাস ; ২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬

১। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার পুস্তক তালিকা

অনিলকুমার মুখোপাধ্যায় ; "ডক্টরসক্লিনিক" ৮৮/১ ওয়েলেসলি স্ট্রীট। কলিকাতা।

১। সীতারাম—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২। গড্ডালিকা—পরশুরাম

৩। স্বর্ণলতা—তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৪। মেবারপতন—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৫। বলাকা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬। বিস্মরণী—মোহিতলাল মজুমদার

৭। সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা—সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য

অনুপকুমার মাহিন্দর ; পুস্তক বিপণি ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৯

১; এলোমেলো—উমা মৈত্র

অবনীকুমার মুখোপাধ্যায় ; ৪০ বাচস্পতিপাড়া রোড, দক্ষিণেশ্বর

১। কৃষ্ণকান্তের উইল—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২। রক্তকরবী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩। সাহিত্য—ঐ

৪। চিত্রা—ঐ

৫। ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি—শ্রী অরবিন্দ

অমিয় ভট্টাচার্য ; ডেপুটি আর্ট ডাইরেক্টর, আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ কলি-১

১। Economic offences—S. K. Ghosh

২। Police leadership & man management—ঐ

৩। Freedom from fear—ঐ

অরুণ পুরকায়স্থ ; ৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

১। সম্বর্ধনাপত্র : "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীকরকমলেষু"। নিবেদক করিমগঞ্জ নগরের জনসাধারণ, ১৩২৬ (২খানি)

২। Bengali Morse code, designed by Kshirode Chandra Purakayastha (2 copy)

৩। রেখা ও দলিল পরীক্ষা—শীতলপ্রসাদ সরকার

অরুণচাঁদ দত্ত ; ৩৯ ফিয়ারলেন, কলি-৭৩

১। স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী উৎসব ঃ—ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ড, ৯ই—২৭ আগষ্ট, ১৯৭২—পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেস

২। মহানায়ক উত্তমকুমার—বিমল চক্রবর্তী, সং

অর্দ্ধেন্দুভূষণ রায়চৌধুরী ; ২৫৯/২এ এস. কে. দেব রোড, কলি-৪৮

১। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুথি (প্রাচীন) ২খানি

অলকেন্দুশেখর পত্রী ; "মহাপৃথিবী", ১১এ, ঠাকুরদাস দত্ত প্রথম লেন, হাওড়া-১

১। সরস্বতীর গল্প—অলকেন্দুশেখর পত্রী

অলোককুমার মিত্র ; ৪বি মন্মথ ভট্টাচার্য স্ট্রীট, কলি-৪

১। পত্র-সম্পুট—অলোককুমার মিত্র

অশোক উপাধ্যায় ; ১৩ লক্ষ্মীনারায়ন মুখার্জী রোড, কলি-৬

১। Glimpses of the older times : Indian under East India Company—C. R. Wilson & W. H. Carey, ed. by Amarendranath Mookerji

২। The Story of Bengali Literature—Pramatha Chaudhuri

৩। সত্যু সেন ঃ আত্মস্মৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ—অমিতাভ দাশগুপ্ত সং

৪। আসামে চা-কুলি আন্দোলন ও দ্বারকানাথ—অমর দত্ত

৫। মির্জাগালিবের চিঠি—উর্দু থেকে অনুবাদ—পুষ্পিত মুখোপাধ্যায়

৬। রবীন্দ্রনাথের চেনাশোনা মানুষ—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

৭। পরিজন-পরিবেশে রবীন্দ্র-বিকাশ—সুকুমার সেন

৮। আশুতোষ চৌধুরীর প্রবন্ধ সঙ্কলন—দেবীপদ ভট্টাচার্য

৯। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের দিনগুলি—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১০। অন্তরালের শিশিরকুমার—তারাকুমার মুখোপাধ্যায়

১১। মনীষী জীবন ও বিচিত্র প্রসঙ্গ—শৈলেনকুমার দত্ত

১২। হৃৎপিণ্ডে দারুণ দামামা—সুনীল বসু

১৩। অতুলপ্রসাদ—বিনয়েন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

১৪। ফুলমণি ও করুণার বিবরণ—হানা ক্যাথেরীন ম্যালেন্স। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সং

১৫। স্মৃতি ভারে—জনার্দন চক্রবর্তী

১৬। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ গল্প—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুব্রত রুদ্র, সং

১৭। ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ—শঙ্খ ঘোষ

১৮। লোলিটা—ভ্লাদিমির নভোকভ/ভাষান্তর—প্রবীর ঘোষ

১৯। ভারত কি করে ভাগ হলো—বিমলানন্দ শাসমল

২০। বাদশাহী আমলে বিদেশী পর্যটক—প্রদ্যোৎ গুহ

অশোক কুমার কুণ্ডু ; বোড়হল, পোঃ জঙ্গিপাড়া, হুগলী

১। বঙ্কিম অভিধান (৩য় খণ্ড)—অশোককুমার কুণ্ডু

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড ঃ ১ম পর্ব, ২য় সং—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২। সাহিত্য জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ, ২য় খণ্ড—ঐ

অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় ; ৫৫সি শ্যামপুকুর স্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলি-৪

১। শাক্ত পদাবলী—অমরেন্দ্র রায়, সম্পাদিত

২। রজনী—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩। ইংরেজী সাহিত্যে ধারা—ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

৪। আনন্দমঠ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৫। আরণ্যক—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আশা গঙ্গোপাধ্যায় ; কলিকাতা

১। পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (জীবনালেখ্য)—আশা গঙ্গোপাধ্যায়

আশুতোষ দাস ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১। দ্বিজ রামদেব-বিরচিত অভয়ামঙ্গল—আশুতোষ দাস

উত্তম দাশ ; C/o কবি ও কবিতা প্রকাশন, ১০ রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলি-৬

১। কবিতার সেতুবন্ধ—উত্তম দাশ

২। জ্বালামুখে কবিতার—ঐ

এ. কে. সরকার অ্যান্ড কোং ; ১/১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-৭৩

১। বৈষ্ণব রসপ্রকাশ—ডঃ ক্ষুদিরাম দাস

২। মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্য শিল্প—ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত

৩। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ—ডঃ ধীরেন্দ্র দেবনাথ

এ. পি. গোস্বামী ; C/o উড়িষ্যা সিমেন্ট লিঃ, স্টিফেন হাউস ; ৪বি. বা. দী. বাগ কলি

১। নীলাচল লীলা—হরিদাস গোস্বামী

২। নবদ্বীপ লীলা—ঐ

কমল সমাজদার ; ৫ মুরারী মিত্র রোড, কলি-৫৮

১। আন্তর্জাতিক, ২৮ বর্ষ, ১৯৮০

২। কালোত্তীর্ণ সম্পদ—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

৩। কালান্তর, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৮৭

করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় ; ৫৫সি শ্যামাপুকুর স্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলি-৪

১। করকমলেষু—বনফুল

২। পুনশ্চ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩। সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা—বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য

৪। রাজসিংহ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৫। যুগমানব শ্রী অরবিন্দ—মণি বাগচি

কুমারেশ ঘোষ ; ২৮।৩। আর, রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কলি-৫৪

১। দেখা অদেখা—কুমারেশ ঘোষ

২। ছোটদের মজার গল্প—ঐ

৩। যষ্টি মধু, ১৩৮৬

গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সম্মিলনী ; সি৩১-এ কলেজ স্ট্রীট, কলি-১২

সাংস্কৃতিক আন্দোলন, অতীত ও বর্ত্তমান ঃ সংকলন

গণেশ লালওয়ানী ; জৈন ভবন, পী-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলি-৭

১। নিগ্রন্থ—শ্রী কনহৈয়ালাল সেঠিয়া, অনুবাদ ঃ গণেশ লালওয়ানী

গুরু বিশ্বাস ; ৬৪ স্ট্র্যান্ড রোড, কলি-৬

১। মতিন মিয়ার মরিফত—গুরু বিশ্বাস

গোপালচন্দ্র রায় ; ২৬ সদন বড়াল লেন, কলি-১২

১। রবীন্দ্রনাথের ছিন্ন পত্রাবলী, ১৩৮৭—গোপালচন্দ্র রায়

২। সঞ্জীবচন্দ্র ও কিছু অজ্ঞাত তথ্য, ১৩৮৬—ঐ

জগদীশ ভট্টাচার্য ; ১০ রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট কলি-৬

১। রবীন্দ্র কবিতা শতক (২য় দশক)—জগদীশ ভট্টাচার্য

জিজ্ঞাসা ; ১৩৩ এ রাসবিহারী এভিনিও, কলি-৯

১। উত্তর-শরৎ বাংলা উপন্যাস—নারায়ণ চৌধুরী

২। ভারতীয় দর্শন—হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। ভারতে ইতিহাসরচনা প্রণালী—রমেশচন্দ্র মজুমদার ও কল্যাণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৪। শব্দের জগৎ—পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য

৫। কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি—নীহাররঞ্জন রায়

৬। সিন্ধু সভ্যতার স্বরূপ ও অবদান—অতুল সুর

৭। উপসর্গের অর্থবিচার—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮। উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে কেশবচন্দ্র—ঝরা বসু

৯। শ্রী অরবিন্দ—মণি বাগচী

১০। জীবন কথা—সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

তপন কর ; গ্রাম ও ডাকঘর ঃ কুলগাছিয়া। জেলা—হাওড়া

১। অনুবিন্ধ ঋতম্ভরা—তপন কর

২। বিবেক বিভাগ—ঐ

তপন বসু ; ২৬ বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলি-৯

১। বেদান্ত দর্শন—স্বামী সন্তদাস বাবাজী

২। শিবানন্দ বাণী (১ম খণ্ড)—স্বামী অপূর্বানন্দ

৩। মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান—মহেন্দ্রনাথ দত্ত

৪। বাঙ্গলার তীর্থ—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য

৫। কর্মযোগ—অশ্বিনীকুমার দত্ত
স্বামীজীর কথা—শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ মঠ
শ্রী শ্রী মহাপুরুষজীর পত্র—বেলুড় মঠ
সনাতন হিন্দু—মহামহোপাধ্যায় শ্রী প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৯ মহাবাক্য—রত্নাবলী ও তাহার সরল বঙ্গানুবাদ—ত্রৈলঙ্গ স্বামী
১০ হিন্দু ধর্ম পরিচয়—সনৎকুমার রায় চৌধুরী
১১। স্বামী তুরিয়ানন্দের পত্র (১ম ভাগ)—উদ্বোধন গ্রন্থাবলী
১২। ঐ (২য় ভাগ)— ঐ
১৩। স্বামী বিবেকানন্দের সহিত কথোপকথন
১৪। ধর্ম জীবন (১ম খণ্ড)—শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত উপদেশাবলী
১৫। ভারতের শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ
১৬। পত্রমালা (উত্তরাংশ)— ঐ
১৭। পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, সং (২ কপি)
১৮। ব্রহ্মচর্য (মহাত্মা গান্ধী)—বিনয়কৃষ্ণ সেন
১৯। ব্রহ্মচর্য শিক্ষা—সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য বেদান্ত শাস্ত্রী
২০। গুরু শিষ্য সংবাদ (ব্রহ্মবিদ্যা)—সুধীর গোপাল মুখোপাধ্যায়, সং
২১। রামদাস কাঠিয়া বাবাজীর জীবন চরিত—সন্তদাস বাবাজী
২২। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ
২৩। ধর্ম জীবন (৩য় খণ্ড)—শিবনাথ শাস্ত্রী
২৪। স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী (১ম ভাগ)
২৫। ঐ (২য় ভাগ)
২৬। ঐ (৩য় ভাগ)
২৭। ঐ (৪র্থ ভাগ)
২৮। ঐ (৫ম ভাগ)
২৯। পূজনীয় গুরুদাস—জ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী
৩০। বিদ্যাসাগর চরিত—শরৎকুমার রায়
৩১। A Life of Anandamohan Bose—Hemchandra Sarkar
৩২। দেশবন্ধু স্মৃতি—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
৩৩। বাংলার ঋষি—অনিলচন্দ্র ঘোষ
৩৪। স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ—জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার, সং
৩৫। বঙ্গ গৌরব স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—শরৎকুমার রায়
৩৬। কাব্য-মঞ্জুষা—মোহিতলাল মজুমদার
৩৭। স্বর্ণ-কণা—ভূপেন্দ্রলাল দত্ত
৩৮। বিজ্ঞানে বাঙালী—অনিলচন্দ্র ঘোষ
৩৯। ব্যায়ামে বাঙালী—অনিলচন্দ্র ঘোষ
৪০। বীর আশানন্দ—চণ্ডীচরণ দে
৪১। গান্ধীজীর আত্মকথা (১ম খণ্ড)—সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, অনু

৪২। গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ
৪৩। মহাপুরুষ প্রসঙ্গ—স্বামী বিবেকানন্দ
৪৪। চিকাগো বক্তৃতা—ঐ
৪৫। স্বামী ব্রহ্মানন্দ
৪৬। গীতার ভূমিকা—অরবিন্দ ঘোষ
৪৭। ব্রহ্মানন্দ লীলাকথা—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য
৪৮। জাতীয় সমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী সুন্দরানন্দ
৪৯। আত্মচরিত—কৃষ্ণকুমার মিত্র
৫০। পথের ইঙ্গিত—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ
৫১। আত্ম প্রতিষ্ঠা—অশ্বিনীকুমার দত্ত
৫২। আত্মবিকাশ—স্বামী অভেদানন্দ
৫৩। শতজীবনী, (১ম খণ্ড)—চণ্ডীচরণ বসাক, স°
৫৪। ঐ (২য় খণ্ড)—ঐ
৫৫। বিবিধ প্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ
৫৬। আগে চলো—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ
৫৭। রবীন্দ্রনাথ—গায়ত্রীদেবী
৫৮। কণিকা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫৯। শিশুরবি বিমল ঘোষ
৬০। Life of the Pearycharan Sircar—M. N. Sircar
৬১। রামকৃষ্ণ মনঃশিক্ষা—অন্নদা ঠাকুর
৬২। স্বামী সারদানন্দ—স্বামী ভূমানন্দ
৬৩। সাধুনাগ মহাশয়—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী
৬৪। নিবেদিতা—সরলাবালা দাসী
৬৫। গুরু বাক্য বা যৌগিক পন্থা ৪র্থ ভাগ)—যোগপ্রকাশ ব্রহ্মচারী
৬৬। গান্ধীজীর আত্মকথা (২য় খণ্ড)—শতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত,অনু°
৬৭। মহাকবি কালিদাস—ক্ষেত্রমোহন ঘোষ, স°
৬৮। বঙ্গের রত্নমালা (১ম ভাগ)—কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
৬৯। নূতন যুগের নূতন মানুষ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
৭০। বাংলার নবরত্ন—অমরেন্দ্রনাথ বসু
৭১। বাংলার মনীষী - অনিলচন্দ্র ঘোষ
৭২। বাংলার গৌরব—রায় বাহাদুর জলধর সেন
৭৩। মনীষী জীবন কথা (১ম খণ্ড)—সুশীল রায়
৭৪। মহাপুরুষ আশুতোষ—রাখালদাস কাব্যানন্দ
৭৫। আশুতোষের ছাত্রজীবন -দীনেশচন্দ্র সেন
৭৬। কারা কাহিনী—অরবিন্দ ঘোষ
৭৭। চারিত্র পূজা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৭৮। আত্ম চরিত—শিবনাথ শাস্ত্রী
৭৯। রাজ যোগ—স্বামী বিবেকানন্দ

৮০। ভারতীয় নারী—স্বামী বিবেকানন্দ
৮১। দেববাণী—ঐ
৮২। পরিব্রাজক—ঐ
৮৩। কালীপ্রসন্ন সিংহ—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৮৪। পরমহংস দেব—দেবেন্দ্রনাথ বসু
৮৫। শ্রীশ্রীমৎ অশ্বিনীকুমার পরমহংসদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী
৮৬। কর্মযোগ—অশ্বিনীকুমার দত্ত
৮৭। ধর্মপ্রসঙ্গে—স্বামী ব্রহ্মানন্দ
৮৮। শ্রীশ্রীসদ্গুরু সঙ্গ (১ম খণ্ড)—কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী
৮৯। A Study of Religion—Swami Vivekananda
৯০। Rig-Veda-Sanhita (Vol. I)—H. H. Wilson
৯১। তত্ত্ববোধ—উমাচরণ মুখোপাধ্যায়
৯২। দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা (১ম খণ্ড)—মোহন্ত শ্রীস্বামী সন্তদাসজী ব্রজবিদেহী
৯৩। ঐ (২য় খণ্ড)— ঐ
৯৪। ভক্তি রহস্য—স্বামী বিবেকানন্দ
৯৫। মদীয় আচার্যদেব—ঐ
৯৬। ধর্মবিজ্ঞান—ঐ
৯৭। ভাববার কথা—ঐ
৯৮। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—ঐ
৯৯। ভারতে বিবেকানন্দ
১০০। স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে—সিস্টার নিবেদিতা
১০১। স্বামী শিষ্য সংবাদ (পূর্বকাণ্ড)—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী
১০২। ঐ (উত্তরকাণ্ড)— ঐ
১০৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত—রামচন্দ্র প্রণীত
১০৪। বিবেকানন্দের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ
১০৫। স্বামী বিবেকানন্দের সহিত কথোপকথন
১০৬। ছেলেদের বিবেকানন্দ—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
১০৭। যুগাচার্য বিবেকানন্দ ও ও রামকৃষ্ণসঙ্ঘ—মতিলাল রায়
১০৮। কর্মযোগী—অরবিন্দ ঘোষ
১০৯। গীতার গান্ধীভাষ্য—সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, সঙ্ক°
১১০। ভক্ত মনোমোহন
১১১। বাঙ্গলার দুই ঠাকুর—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য
১১২। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী (১ম ভাগ)—মহেন্দ্রনাথ দত্ত
১১৩। ঐ (২য় ভাগ)—ঐ
১১৪। ঐ (৩য় ভাগ)—ঐ
১১৫। শ্রীঅরবিন্দ—প্রমোদকুমার সেন
১১৬। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনালোকে—স্বামী নির্লেপানন্দ
১১৭। শ্রীরামকৃষ্ণ দেব—শশিভূষণ ঘোষ

১১৮। Twelve men of Bengal in the Nineteenth Century—
F. B. Bradley Birt

১১৯। Life and Experiences of a Bengali Chemist (Vol I)—
Prafulla Chandra Roy

১২০। ঐ (Vol. II)—ঐ

১২১। Character—Samuel Smiles

১২২। English etiquette for Indian gentlemen—W. T. Webb

১২৩। দেব-বালকের অমিয় ভোগ (১ম ভাগ)—কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

১২৪। দশাবতার চরিত—ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য

১২৫। ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত—শ্রী ১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী

১২৬। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র —অনিলচন্দ্র ঘোষ

১২৭। Philsophy of work—Swami Abhedananda

১২৮। Spiritual Teachings—Swami Brahmananda

১২৯। Divine heritage of man—Swami Abhedananda

১৩০। The Master as I saw him

১৩১। Ramakrishna—F. Maxmuller

১৩২। Studies from an Eastern home—Sister Nivedita

১৩৩। The life Ramakrishna—Romain Rolland

১৩৪। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য

১৩৫। সাধনা প্রাণায়াম— স্বামী শিবানন্দ

১৩৬। পন্ডিচেরীর পত্র—অরবিন্দ ঘোষ

১৩৭। My Master—Swami Vivekananda

১৩৮। The Time's message—ঐ

১৩৯। রামমোহন রায়ের পঞ্চোপনিষদ—সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪০। নূতন সমাজের ইতিহাস—রবীন্দ্রকুমার ঘোষ

১৪১। শ্রীশ্রীবদরী নারায়ণের পথ —বিধুভূষণ দত্ত

১৪২। ধর্মের পথে —ইন্দুবালা রায়চৌধুরী

১৪৩। সদ্গুরু কে ?—অপূর্বেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৪৪। মল্লবীর গোরা যদুনাথ মজুমদার

১৪৫। শ্রীশ্রীশিবপূজা পদ্ধতি—অজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ

১৪৬। ছোটদের শিশিরকুমার—বিমল সেন

১৪৭। সরল ব্রহ্মচর্য—স্বামী স্বরূপানন্দ

১৪৮। আনন্দ রসোদ্গার

১৪৯। শ্রীশ্রীলক্ষ্মী দেবীর ব্রতকথা—নিবারণচন্দ্র দে

১৫০। মোহমুদ্গর—শ্রীশ্রীরমাশাস্ত্রী, সং

১৫১। বঙ্গীয় হিন্দু মিলন মন্দির—স্বামী প্রণবানন্দজী

১৫২। শ্রীজগন্নাথ-ক্ষেত্র মাহাত্ম্য

১৫৩। কেশরী-নিনাদ—স্বামী বিবেকানন্দ

১৫৪। গোপালের মা—স্বামী সারদানন্দ
১৫৫। মহামন্ত্র
১৫৬। সন্ন্যাসীর গীতি—স্বামী বিবেকানন্দ
১৫৭। স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী শুদ্ধানন্দ
১৫৮। ছোটদের শ্রীগৌরাঙ্গ—হরিনাথ নন্দী
১৫৯। কবিতা মালা (১ম ভাগ)—সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র
১৬০। তারকেশ্বর মাহাত্ম্য গীতাবলী (১ম ভাগ)—যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
১৬১। যুগবাণী—নিত্যনিরঞ্জন সান্যাল
১৬২। রাজা রামমোহন ও স্বাধীন ভারত—কুমুদবন্ধু সেন
১৬৩। স্বদেশের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দ—শশীভূষণ ঘোষ
১৬৪। Sociology—D. C. Bhattacharya
১৬৫। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬৬। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য—ঐ
১৬৭। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—ঐ
১৬৮। রামরাম বসু—ঐ
১৬৯। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ঐ
১৭০। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার—ঐ
১৭১। রামনারায়ণ তর্করত্ন—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৭২। আখ্যান মঞ্জরী (১ম ভাগ)—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সঙ্ক
১৭৩। সাহিত্য-সম্পুট—প্রমথনাথ বিশী ও বিজিতকুমার দত্ত
১৭৪। Gullivers Travels—Bimalbihari Banerjee
১৭৫। দুর্নীতির পথে—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
১৭৬। পওহারী বাবা—স্বামী বিবেকানন্দ
১৭৭। হিন্দু ধর্মের নবজাগরণ—ঐ
১৭৮। বীরবাণী—ঐ
১৭৯। ৺কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ—মহেন্দ্রলাল দত্ত ও স্বামী সদাশিবানন্দ
১৮০। অনাসক্তিযোগ—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
১৮১। অনুরাধা সতী ও পরেশ—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৮২। বিশ্বের দরবারে বাঙ্গালী—অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও দক্ষিণারঞ্জন বসু
১৮৩। খাদ্য—চুনীলাল বসু
১৮৪। ভারতপথিক রামমোহন রায়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৮৫। In Defence of Hinduism—Swami Vivekananda
১৮৬। শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—অমৃতলাল সেনগুপ্ত
১৮৭। বুদ্ধদেব চরিত—কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন
১৮৮। ওঁ ব্রহ্মচর্য্যম্—স্বামী বেদানন্দ
১৮৯। শঙ্করাচার্য্য—রাখালদাস কাব্যানন্দ
১৯০। শ্রীগৌরাঙ্গ—শ্যামলাল গোস্বামী ও রেবতীমোহন হালদার

১৯১। আখ্যান মঞ্জরী (২য় ভাগ)—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সঙ্ক°
১৯২। শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিকথা —লক্ষ্মীমণি দেবী ও যোগীন্দ্রমোহিনী বিশ্বাস
১৯৩। রবীন্দ্রনাথ—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
১৯৪। হরিদাসী—জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
১৯৫। শ্রীশ্রীমৎঅশ্বিনীকুমারপরমহংসদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী
১৯৬। হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন – তারাচাঁদ দাস, স°
১৯৭। রচনাদর্শ (২য় ভাগ) কালিদাস রায়
১৯৮। স্বামী বিবেকানন্দ—মনোরম গুহঠাকুরতা
১৯৯। Modern Geography—D. M. Preece and H. R. B. Wood
২০০। Gulliver's Travels—Dean swift
২০১। পত্রাবলী—স্বামী প্রেমানন্দ
২০২। খাদ্য বিজ্ঞান—প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও হরগোপাল বিশ্বাস
২০৩। স্বামী সারদানন্দের জীবনী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য
২০৪। Visit of N. A. Bulganin and N. S. Khrushchev to India
২০৫। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবত—রাজেন্দ্রনাথ রায়
২০৬। A Book of Verse—An experienced Professor
২০৭। মাধুকরী—বিভূতি চৌধুরী
২০৮। The Merchant of Venice—K. Banerjee
২০৯। Julius Caesar—K. Banerjee and S. Chakraborty
২১০। High School English Grammar & Composition—
P. C. Wren & H. Martin
২১১। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা
২১২। বর্তমান ভারত—স্বামী বিবেকানন্দ
২১৩। দেশবন্ধুর বজ্রবাণী—উমেশচন্দ্র চক্রবর্তী
২১৪। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—বিজয়গোপাল
২১৫। নাউথিং খোং ফমাল কাবা—খেলচন্দ্র সিংহ
২১৬। উচ্চতর মাধ্যমিক গণিত—কেশবচন্দ্র নাগ
২১৭। কুরুপাণ্ডব—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২১৮। পাঠসংকলন (২য় খণ্ড)
২১৯। যেমন শুনিয়াছি (১ম ভাগ)—স্বামী অভেদানন্দ

তারাপদ সাঁতরা ; আনন্দ নিকেতন কীর্ত্তিশালা, পো ঃ বাগনান, হাওড়া
১। বাংলার দারু ভাস্কর্য, ১৩৮৬—তারাপদ সাঁতরা

তুষারাভ রায়চৌধুরী ; ৩৩এ মদন মিত্র লেন, কলি—৬,
১। এই জন্ম—তুষারাভ রায়চৌধুরী

দেবকুমার বসু ; ৯।৩, টেমার লেন, কলি—৯
১। সোনার ত্রিশূল—সামসুল হক
২। যুদ্ধে সন্ধিতে—দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

৩। বার্লিনের মধ্য রাত্রি কলকাতায় ভোর—কুশল মিত্র
৪। Regenfeld : জলের প্রান্তর—Santosh K. Brahma/কুশল মিত্র
৫। দেহদানের ভূমিকা—ক্ষিতীশদেব সিকদার
৬। অনুভব অন্বেষণ পরিক্রমা—পার্থ রাহা
৭। বেহুলা—চিত্ত সিংহ
৮। উৎসব—দেবকুমার বসু ও সলিল লাহীড়ি, সং
৯। মানুষের গান—নগেন্দ্রনাথ পাল
১০। জীবন সংগীত—জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১১। পরিকল্পনা প্রসংগ—রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
১২। হয়তো গোলাপ—জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়
১৩। বিরাশির কবিতা সংকলন—তমেশ পাল, সং
১৪। নিহত শব্দের অন্বেষা—বাসুদেব দত্ত
১৫। জগৎ শেঠের রক্ত মোহর—সলিল লাহিড়ী

দিলীপকুমার দাস, ৩৫ উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড, কলি-৫৪ (রাধারাণী দাস স্মৃতিসংগ্রহ)

১। আমার কথা—আলাউদ্দিন খাঁ
২। The Swadeshi movement of Bengal—Sumit Sarker
৩। উপল-ব্যথিত গতি—যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়
৪। The Peasantry—R C. Dutt
৫। The Bengal Magazine and its contributors—Alak Roy, ed.
৬। Mookerjee's Magazine and its contributers—Alake Roy, ed.
৭। সত্যজিৎ রায় ঃ ভিন্নচোখে—শীতলচন্দ্র ঘোষ ও অরুণকুমার রায়, সং
৮। বিষ্ণু দে-র রচনাপঞ্জী অরুণ সেন
৯। গান্ধীজীর দূত—সুধীর ঘোষ
১০। ঠাকুর বাড়ীর অন্দর মহল—চিত্রা দেব
১১। বঙ্গলক্ষ্মীর ঝাঁপি—অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১২। বাংলার দারু ভাস্কর্য—তারাপদ সাঁতরা
১৩। পরি প্রশ্ন—জ্যোতি ভট্টাচার্য
১৪। সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র (৪র্থ খণ্ড)—বিনয় ঘোষ,
১৫। আলেকজাণ্ডার ডাফ ও অনুগামী কয়েকজন—অলোক রায়
১৬। বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী ঃ ধরপাকড়ের যুগ—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ
১৭। সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র (১ম খণ্ড)—বিনয় ঘোষ
১৮। ঐ (২য় খণ্ড)—ঐ
১৯। ঐ (৩য় খণ্ড)—ঐ
২০। ঋত্বিক—সুরমা ঘটক
২১। Select documents of the British period of Indian history—O. C. Ganguly

২২। City of Job Charnock—N. R. Roy
২৩। মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক (২য় খণ্ড)—ধনঞ্জয় দাশ, স°
২৪। ঐ (৩য় খণ্ড)—ঐ
২৫। ঐ (১ম খণ্ড)—ঐ
২৬। এই মৈত্রী! এই মনান্তর!—অরুণ সেন
২৭। যামিনী রায়; তাঁর শিল্প চিন্তা ও শিল্প কর্ম বিষয়ে কয়েকটি দিক—বিষ্ণু দে
২৮। বাঙলার প্রথম—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
২৯। সদ্গোপ জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য—অতুল সুর
৩০। কথিত কাহিনী—শিবরাম চক্রবর্তী
৩১। স্মৃতির খেয়া—সাহানা দেবী
৩২। ভীষ্মদেবের জীবন ও সঙ্গীত—প্রশান্ত দাঁ, স°
৩৩। পাদরি লঙ - অমর দত্ত
৩৪। শিল্পী মানুষ যামিনী রায়—সংকলন, অনুবাদ এবং সম্পাদনা : রবীন্দ্রনাথ সামন্ত এবং সুমনা চট্টোপাধ্যায়
৩৫। মনে পড়ে—বিকাশ রায়
৩৬। আনন্দ ধারা—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
৩৭। West Bengal District Records—Murshidabad Nizamut, Vol. 1. 1793—1856 (Letters received)
৩৮। Do……… —Part II, 1834—1872 (Letters issued)
৩৯। Do……… —Part II, 1807—1855 (Letters issued)
৪০। মহানায়ক উত্তমকুমার—বিমল চক্রবর্তী, স°
৪১। The Indian middle classes.—Their growth in modern times—B. B. Misra
৪২। সাহিত্যিক কৌতুকী—শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ
৪৩। সরস্বতী—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
৪৪। দূরের বই—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৫। শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প—রাধারাণী দেবী
৪৬। রবীন্দ্রনাথকে যে কথা বলা হইল না—গোপালদাস চট্টোপাধ্যায়
৪৭। রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য—রূপদর্শী
৪৮। জিপসীর পায়ে পায়ে—শ্রীপান্থ
৪৯। নিজেকে নিয়ে—ঊর্মিলা হাকসার
৫০। The Statesman : An Anthology, 1875—1975—compiled by Niranjan Majumder
৫১। রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা—অমিতাভ চৌধুরী
৫২। A grammar of the Bengal Language (Unabridged Facsimile edition)—Nathaniel Brassey Halhed
৫৩। Glimpses of old Calcutta—Ranobir Raychoudhury

৫৪। আনন্দসংগী ঃ ১৯২২ থেকে ১৯৭১ এই অর্ধশতক জুড়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলীর নির্বাচিত সংকলন
৫৫। রবীন্দ্রসাহিত্যে ধর্মচেতনা -স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
৫৬। জীব-জন্তু—সুকুমার রায়
৫৭। জনতা এণ্ড কোং—জনার্দন ঠাকুর
৫৮। আমাকে বলতে দাও—গৌরকিশোর ঘোষ
৫৯। German Scholars on India—Contributions to Indian studies. ed. by Cultural Department of the Embassy of the Federal Republic of Germany. Vol. II
৬০। গৌড় কাহিনী ঃ আদিযুগ—শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ
৬১। মধ্যযুগে গৌড়—ঐ
৬২। ঈশ্বর কোটির রঙ্গ কৌতুক—কমলকুমার মজুমদার
৬৩। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ ঃ জীবনী ও উক্তি —সনৎকুমার গুপ্ত, সম্পাদক
৬৪। দরবারী কানাড়া —নারায়ণ দত্ত
৬৫। ছন্নছাড়া মহাপ্রয়াণ (আওয়ারা মসীহা—বিষ্ণুপ্রভাকর) ঃ অনুবাদিকা দেবলীলা ব্যানার্জী কেজরিওয়াল
৬৬। মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ – আজহারউদ্দিন খান এবং ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত
৬৭। বাঙালা ও বাঙালী—অতুল সুর
৬৮। পথের পাঁচালীতে বিভূতিবাবু—তারাপদ ভৌমিক,
৬৯। পাদরি লঙ ঃ বাঙালা সাহিত্য ও বাঙালী জীবন—শঙ্কর সেনগুপ্ত
৭০। আমার আমি—উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়
৭১। পথের কবি—কিশলয় ঠাকুর
৭২। গঙ্গার ঘাট—রাধারমণ মিত্র
৭৩। প্রেমিক সন্ন্যাসী—সুব্রত রুদ্র, সং
৭৪। ছাপা হরফের হাট—শ্যামল চক্রবর্তী
৭৫। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার—দিলীপকুমার দত্ত ও প্রবীরকুমার দেবনাথ
৭৬। বিচিত্র প্রতিভা —দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
৭৭। মনীষী জীবন ও বিচিত্র প্রসঙ্গ—শৈলেনকুমার দত্ত

দিলীপকুমার বিশ্বাস ; সম্পাদক ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, কলি-৬

১। নিবেদক—দেবপ্রসাদ মিত্র
২। পালি সাহিত্যের ইতিহাস—রবীন্দ্রবিজয় বড়ুয়া

নেপালচন্দ্র ঘোষ ; সাহিত্যলোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট —কলি-৬

১। মনোমোহন বসুর অপ্রকাশিত ডায়েরী– সুনীল দাস, সং

নিখিল সেন ; ২৫/৫এ অনাথ দেব লেন, কলি-৩৭

১। রমেশচন্দ্র দত্তের প্রবন্ধ সংকলন—নিখিল সেন, সং

নিরঞ্জন চক্রবর্তী ; c/o নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, কালিবাড়ী, দিল্লী

১। স্মরণিকা (নিখিলভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন দ্বি পঞ্চাশৎ অধিবেশন ১৯৭৯

নির্মলকুমার খাঁ ; শতরূপা, ১৪ মাকড়দহ রোড, কদমতলা, হাওড়া—১

১। রক্তে শুনেছি প্রপাত—প্রদোষ দত্ত

২। কলকাতার রাস্তা—তারক চট্টোপাধ্যায়

৩। পুরুষ মহান—জীবনকৃষ্ণ শেঠ

৪। অমৃতের উৎস সন্ধ্যান—ঐ

নির্মাল্য আচার্য ; ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

১। এক্ষণ—পুজো সংখ্যা, ১৩৮৭

পরেশনাথ সাউ ; গ্রাঃ+পোঃ—ধামুয়া, ২৪পরগণা

১। জয়গান গেয়ে যাই—পরেশনাথ সাউ

পরিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ; ১৮এ নিমাইচাঁদ মৈত্র স্ট্রীট, কলি-৩৫

১। বিপ্লবীর জীবন দর্শন—প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী

পল্লব সেনগুপ্ত ; C/o পুস্তক বিপণি ২৭, বেনিয়াটোলা লেন কলি-৯

১। ঝড়ের পাখি ঃ কবি ডিরোজিও—ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত

পূর্ণিমা সরকার ; ফ্লাট-কিউ ৩, বিদ্যাসাগর নিকেতন ; সল্ট লেক, কলি-৬৪

১। রমণ মহর্ষি ও আত্মজ্ঞানের পথ—আর্থার ওসবোর্ণ—শ্রীপূর্ণিমা সরকার, অনূ°

২। শ্রীরমণ বাণী (মহর্ষি'স গসপেল ১ ও ২ ভাগের বাংলা অনুবাদ)

প্রজ্ঞান রায়চৌধুরী ; ৪৬।৫-ডি, বালীগঞ্জ প্লেস, কলি-১৯

১। Soviet Commuulsm : A new civilisation : Vol. II—
By Sidney Beatrice Webb

২। The Selected Works of Tom Paine, ed. by Howard Fast

প্রজ্ঞাপারমিতা বড়ুয়া ; ১৬২/৬১, লেক গার্ডেনস, কলি-৪৫

১। কবি কাব্যে নেপথ্যচারিণী—প্রজ্ঞাপারমিতা বড়ুয়া

প্রতুল পাণ্ডিত ; বিশ্বভারতী

১। প্রভু যাও—স্বপন পাল

প্রশান্তকিশোর রায় ; কলিকাতা

১। রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রথম পর্যায়—জ্যোতির্ময় ঘোষ

বাণী নাগ ; এ/৯ রবীন্দ্র নগর, কলি-১৮

১। ইংলণ্ডে শিক্ষার ইতিহাস—অরুণ ঘোষ

২। Studies in Plato and Aristotle —D. R. Bhandari

বাসুদেব পোদ্দার ; C/o এম. সি ভাণ্ডারী ৪ সাইনোগগ, কলি-১

১। কালপুরুষ-বাসুদেব পোদ্দার (হিন্দী)

২। রামায়ণ মহাভারতকা কালপ্রবাহ—ঐ

বাসুদেব মোশেল ; *গ্রাম—কন্যার্মণি, ডাকঘর—সারেঙ্গা, জেলা—হাওড়া*

১। *সখারাম গণেশ দেউস্কর ও ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ—বাসুদেব মোশেল*

বাসন্তী মুখোপাধ্যায় ; *অধ্যাপিকা, আশুতোষ কলেজ, কলিকাতা*

১। রবীন্দ্র কথা সাহিত্যে চরিত্র ব্যাখ্যান—বাসন্তী মুখোপাধ্যায়

বিমলকুমার পাল ; ১০এ/৬০ ওআর্ডস ইনস্টিটিউশন স্ট্রীট, কলি-৬

১। কালিদাস তাঁর কালে—সুকুমার সেন
২। সত্য মিথ্যা কে করেছে ভাগ (গল্পের বই)—ঐ
৩। যিনি সকল কাজের কাজী— ঐ
৪। যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো— ঐ

বিশ্বভারতী রিসার্চ পাবলিকেশন ; কর্মসচিব, শান্তিনিকেতন, বীরভূম

১। পুথি পরিচয় : (৪র্থ খণ্ড) -পঞ্চানন মণ্ডল, সঙ্ক°
২। Contribution to a Bibliography of Indian art and aesthetics —Haridas Mitra
৩। Viswabharati Journal of Resarch : Humanities and Social Sciences, Vol. II Pt. I, 1978-79
৪। Do—Science, Vol. III; pt, II, 1978-79

বীরেন মুখোপাধ্যায় ; বাঙ্গুর এভিনিউ, কলি-৫৫

১। জমির উর্বরতা বৃদ্ধির উপায়—নীলরতন ধর
২। What is the theory of Relativity—L. Lanau; Yu. Rumer

বেথুন কলেজ ; ১৮১ বিধান সরণি, কলি-৬

১। বেথুন কলেজ শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ

ব্রততী চক্রবর্তী ; বি—৩/৩৩৫/এইচ-৫ শিবালয়, বারানসী-১

১। যোগীন্দ্রনাথ সরকার ; বাংলা শিশু সাহিত্য—ব্রততী চক্রবর্তী

মিত্র ও ঘোষ ; ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলি-৭৩

১। বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস—বিজিত দত্ত
২। ইচ্ছামন্ত্রের দীক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ—প্রবোধচন্দ্র সেন
৩। বাঁকা স্রোত—সুমথনাথ ঘোষ
৪। স্রোতের সঙ্গে—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
৫। এক নাটক অনেক দৃশ্য—সুমথনাথ ঘোষ
৬। হিমারণ্য—স্বামী রামানন্দ ভারতী
৭। তমসার তীরে তীরে—শঙ্কু মহারাজ
৮। সোনালী দিনের পাখিরা—সুজিতকুমার সেনগুপ্ত
৯। কক্ষপথ—তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১০। উলের কাঁটা—নারায়ণ সান্যাল

মেদিনীপুর স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস সমিতি ; ৩২/২৩ চণ্ডীঘোষ রোড, কলি-৪০

১। স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর (১ম খণ্ড)—বসন্তকুমার দাস

রবীন্দ্রনাথ সামন্ত ; স্কুলডাঙ্গা, বাঁকুড়া

১। তুষুব্রত ও গীতি সমীক্ষা—রবীন্দ্রনাথ সামন্ত

রাণী মুখার্জী ; ৪৭ বাচস্পতি পাড়া, দক্ষিণেশ্বর

১। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ধারা—ঘোষ ও মুখোপাধ্যায়

২। অগ্নিবীণা—নজরুল ইসলাম
৩। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস—আশুতোষ ভট্টাচার্য
৪। কাব্যমালঞ্চ—যতীন্দ্র মোহন বাগচী
৫। প্রফুল্ল গিরীশচন্দ্র ঘোষ, বিমল কান্তি সমাদ্দার, স°
৬। ছন্দ ও অলঙ্কার—ভোলানাথ ঘোষ
৭। সংকলন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাধা গোস্বামী ; ২৭২ বঙ্কিমপল্লী, সোদপুর,২৪পরগণা
১। গমের দানায় কোলাজ এবং অন্যান্য—রাধু গোস্বামী

লীলা বিদ্যান্ত ; এস. বি বালিকা বিদ্যালয় ডিগ্রী কলেজ। ৬১ গুরু গোবিন্দ সিং মার্গ, লক্ষ্মৌ, উত্তরপ্রদেশ
১। রবীন্দ্র জীবনের ভ্রষ্টলগ্ন—লীলা বিদ্যান্ত

শংকরপ্রসাদ দত্ত ; ৩৯ফিয়ার লেন। কলি-৭৩
১। ডন নদীর তীরে—মিখাইল সলোখভ

শতদল ভট্টাচার্য ; ৩/১ আশুতোষ শীল লেন। কলি-৬
১। অজানা দেশ লাদাক—শতদল ভট্টাচার্য

শশধর বন্দ্যোপাধ্যায় ; সিয়ারশোল হাসপাতাল পোঃ সিয়ারশোল রাজবাড়ী। বর্ধমান
১। খেয়ালী ফসল—শশধর বন্দ্যোপাধ্যায়
২। যবনিকার আড়ালে— ঐ

শান্তনু ঘোষ ; ১৫/৫ নদার্ন এভিনিউ। কলি—৩৭
১। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—কৃষ্ণদাস গোস্বামী
২। শ্রীচৈতন্য ভাগবত—বৃন্দাবন দাস
৩। বিদ্যাপতি পদাবলী—নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
৪। শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল—লোচনদাস ঠাকুর
৫। জগদানন্দ পদাবলী—ধীরানন্দ ঠাকুর, স°
৬। শ্রীশ্রীটোটা গোপীনাথকথামৃত
৭। বিরহী-মাধব—বিষ্ণু সরস্বতী
৮। প্রভু রুদ্ররাম ও তিন ঠাকুর—হরিহর চক্রবর্তী
৯। রস-তত্ত্বসার—বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত
১০। রস-সম্পুট—ঐ
১১। শ্রীকৃষ্ণ গীতিকা—হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী
১২। কীর্তন পদাবলী—নরহরি চক্রবর্তী
১৩। শ্রীশ্রীভক্তি রত্নাকর—নরহরি চক্রবর্তী
১৪। রাম রসায়ণ—রঘুনন্দন গোস্বামী
১৫। পাঁচালী, (১ম—৫মখণ্ড)—দাশরথি রায়
১৬। পরমতত্ত্বসীমা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—সুন্দরানন্দ দাস

১৭। শ্রীশ্রী নামচিন্তামণি কিরণ কণিকা - সুন্দরানন্দ দাস
১৮। কৃষ্ণকমল-গীতিকাব্য—নিত্যগোপাল গোস্বামী, সঙ্ক°
১৯। লীলাগান পদ্ধতি—রাখালদাস চক্রবর্তী
২০। দানকেলী কৌমুদী—রূপগোস্বামী
২১। পাঁচশত বৎসরের পদাবলী—বিমানবিহারী মজুমদার
২২। বলরামদাসের পদাবলী—ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য
২৩। শ্রীব্রজধাম ও আচার্যগণ (৪র্থ খণ্ড) - গোবর্ধন দাস
২৪। সংকীর্তন-পদামৃত—শ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু
২৫। সহস্র-পদাবলী—যতীন্দ্ররামানুজ দাস

শিবা এণ্ড কোং ; ১০/১ জি. টি. রোড(সাউথ) হাওড়া—৭১১১০১
১। চিকিৎসাবিদ রবীন্দ্রনাথ—ডাঃ প্রসাদ বন্দোপাধ্যায়

শিব মণ্ডল ; ৯এণ্টনী বাগান লেন। কলি-৯
১। বিন্যাস—বুদ্ধদেব গুহ
১। কৃষ্ণা বাড়ী ফেরেনি—সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

শুভময় দা ; ৬২এ জয়মিত্র স্ট্রীট। কলি-৫
১। স্বনির্বাচিত কবিতা—হাসিরাশি দেবী
২। বিশ্বপ্রদক্ষিণ—রাসবিহারী পাল

শ্রী ভূমি পাবলিশিং কোং ; ৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলি-৯
১। জীবের ক্রমবিকাশ—মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ
২। টাট সংস্কৃতির রূপরেখা (অসমীয়া)—লীলা গগৈ

সনৎকুমার মিত্র ; ৬০ সত্যেন রায় রোড। কলি-৩৪
১। বাঘ ও সংস্কৃতি - সনৎকুমার মিত্র, স°
২। বাউল গান—ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী সংগৃহীত। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, সঙ্ক°

সরোজমোহন মিত্র, ২৩৮ মানিকতলা মেইন রোড, কলি-৫৪
১। ছোটগল্পের বিচিত্র কথা—ডঃ সরোজমোহন মিত্র।

সন্দীপকুমার মুখোপাধ্যায় ; ডুনীট এণ্টারপ্রাইজ, পি ১৪০/১ ঝাউতলা রোড। কলি
১। চরিত-কথা—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
২। বলাকা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩। কাব্য-মঞ্জুষা—মোহিতলাল মজুমদার
৪। কাব্য জিজ্ঞাসা—অতুল চন্দ্র গুপ্ত

সলিল লাহিড়ী ; c/o 'বিশ্বজ্ঞান' ট্যামার লেন, কলি-৭৩
১। জগৎ শেঠের রক্ত মোহর—সলিল লাহিড়ী
২। রূপ কথার পারস্য—ঐ
৩। আগ্নাসায়রের হাসিকান্না—ঐ
৪। জলতরঙ্গ—ঐ

৫। কাশ্মীরের ঝঙ্কার—সলিল লাহিড়ী
৬। সাগর পারের রূপকথা – ঐ
৭। পৃথিবীর পৌরাণিক কাহিনী – সমীর রক্ষিত, অর্ধেন্দু চক্রবর্তী ও দেবব্রত মল্লিক, সং
৮। কিশোর জ্ঞান কোষ (১ম খণ্ড)
৯। ঐ (২য় খণ্ড)

সুকুমার চট্টরাজ ; ১১ শহীদ সূর্যসেন রোড ৩ কলি-৯
১। উত্তর গীতা – সুকুমার চট্টরাজ

সুকুমার মুখোপাধ্যায় ; ৩এ প্রভুরাম সরকার লেন। কলি-১৫
১। হিমালয় তীর্থে সাধুসঙ্গ – সুকুমার মুখোপাধ্যায়

সুকুমার মিত্র : এ/১২/৮ কালিন্দী হাউসিং এস্টেট। কলি-৫৫ (উমেশ সৌদামিনী সংগ্রহ)
১। শিকড় যদি চেনা যায় – অরুণ মিত্র
২। এষা, ৪র্থ বর্ষ, ১৩৭৬-৭৭
৩। আচার্য যদুনাথ সরকার—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংকলক
৪। মধু ও হুল – সজনীকান্ত দাস
৫। সাংবাদিক হতে গেলে—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়
৬। পরিচয় (পত্রিকা) ঃ ১৩৭৭, ১৩৮২-৮৩
৭। অশান্ত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত—সাংবাদিক
৮। পরিচয়, বর্ষ ৪৭, ১৩৮৪, ১ম খণ্ড
৯। পরিচয়, ১৩৬৪, বৈশাখ—আষাঢ়, মাঘ ১৩৬৩ চৈত্র
১০। বিচিত্রা, ১৩৮০, আশ্বিন—চৈত্র ১৩৮১, বৈশাখ — ভাদ্র
১১। মালঞ্চ, ১ম বর্ষ, ১২৯৫—৯৬
১২। ঋগ্বেদ সংহিতা, ১ম খণ্ড · বঙ্গানুবাদ ঃ রমেশ চন্দ্র দত্ত
১৩। মরাচাঁদ – বিজন ভট্টাচার্য
১৪। পরিচয় (পত্রিকা) ১৩৮৫
১৫। কৃষ্ণ আফ্রিকার জাগরণ – সুকুমার মিত্র

সুনীতিকুমার রায় ; স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, সন্ত সরণী, পোঃ দুইল্যা, আন্দুল—মৌড়ী, হাওড়া
১। শ্রী স্বামী সন্তদাসজী মহারাজের উপদেশাবলী ও তাঁহার সাধন ডায়েরীর বিশ্লেষণ – সুনীতি কুমার রায়

সুধেন্দু মল্লিক ; ২১১ বি, ব্লক, লেকটাউন। কলি-৫৫
১। সাহিত্যের সীমানা—জ্যোৎস্নানাথ মল্লিক
২। জীবন সোহাগ – ঐ
৩। সঙ্গে আমার বালককৃষ্ণ – সুধেন্দু মল্লিক

সুভাষ বক্সী ; জ্যোতিঃ শাস্ত্রী, ২৯৩ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট। কলি-১২
১। সনাতন ঈশ্বর পরিচয় – সুভাষ বক্সী

হরিপদ ভৌমিক ;

১। মৎস্য কন্যা ও ফেরারী নাবিক—চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত

হরিসাধন ভট্টাচার্য : ৭/২ পি. ডব্লিউ. ডি. রোড। কলি-৩৫

১। পথের আলো—১৪শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১৩৮৬

Dipak Kumar Mukherjee ; Asst. Director. Central Fuel Research Institute. Dhanbad. Bihar

১। খুঁজে বেড়াই—ছায়া ঘোষ

২। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ; মধ্য লীলা : অষ্টম পরিচ্ছেদ—নরেশচন্দ্র জানা, স°

৩। মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত—রমেশচন্দ্র দত্ত

৪। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত বীরাঙ্গনা কাব্য—এ. এল. ব্যানার্জী, স°

Dipak Ghosh ; Calcutta

১। Suravag—Vitapam—Prof. Dipak Ghosh

Estates and Trust officer ; Calcutta University, Senate House, Calcutta-12

১। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহোদয়ের গ্রন্থ ও রচনাপঞ্জী (২কপি)—হেমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সংকলক

Inanada Sahitya Samsad ; P. 349, Lake Town Calcutta-55

১ এই নারী এই তরবারী—সত্যকাম

National Library : M. N. Nagraj, D. L, Alipur, Cal-27

১। Cumulative Book Index, 5 issues, Vol. 82, 1979, issue Vol. 83, 1980

২। Current biography, Nos. 2—11, Vol. 38, 1977
Nos. 1—11, Vol. 39, 1978

৩। The New York Times Book Review, 26 issues of 1976

৪। Resources in Education. Vol. 13, Nos. 1—4

৫। Applied Science and Technology Index. Vol. 63, Nos. 4—6

৬। Education Index. Vol. 49, Nos. 10
Vol. 50, Nos. 1 & 4
Vol. 51, Nos. 5, 6, 8, 9

৭। *Public Affairs Information Service Bulletin*
Vol. 65, Nos. 7—11
Vol. 66, Nos. 7—11

৮। Readers' Guide to Periodical Literature
Vol. 77, No. 5,
Vol. 78. Nos. 1, 5, 10, 15, 21
Vol. 79, Nos. 5, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21

Vol. 80, Nos. 1, 2 to 4, 6, 8

৯। Public Library Catalogue, 1974 Supplement to the 6th ed. 1973

1975 do

1976 do

1977 do

১০। Journalism Quarterly, Autumn, 1979

১১। Essay and General Literature.—June, 1978

১২। Cumulative Book Index. Vol. 81, Nos. 3, 6, 8, 11

Vol. 82, Nos. 1, 2, 4, 5.

১৩। The New York Times Index. January 1—15, 1979

" 16—31, 1979

February 1—15, 1979

" 16—28, 1979

March 1—15, 1979

" 16—31, 1979

১৪। CIS Index—Vol. 9 Nos. 4, 5

Vol. 10 Nos. 1 (2 copy) &2

১৫। LMP with names and numbers, 1979

১৬। Social Sciences Citation Index—1978 Annual

(a) Citation Index 1 A to Mark

(b) " 2 Mark to Z

(c) Corporate Index

Source Index 3A to Hung

(d) Source Index 4 Hung to Z

(e) Permuterm Subject Index 5A to Z & numbers

(f) Guide and Journal Lists

১৭। Social Sciences Citation Reports 1978 Annual

১৮। Awards Honors and Prizes. Vol. 1 & 2

১৯। Fiction catalogue 1961 Supplement to the 7th edn. 1960

1962 do

1963 do

1964 do

২০। Fiction catalogue 7th edn. 1960

২১। American Library Directory 31st edn.

২২। Biography Index—Vol. 32—Nos. 1 to 4

Vol. 33—Nos. 1 to 4

২৩। Congressional staff Directory; 1978

২৪। Who is Who in American Art, 1976

২৫। Writer's Market; 1979

২৬। The Almanac of American Politics, 1976

২৭। The Americana, 1975, 1976, 1977 (Annual)

২৮। Who's Who in American Art, 1978

২৯। Paper Bound Books in Print, Spring Volume 1979

৩০। Biography Index, September 1976 to August 1977

Office of the Director of Census Operations ; W. B. 20 British Indian street, 10th floor, Cal.—69

১। Census Handbook—Part X—C, 1971. Malda District

Riddhi India ; 28 Beniatola lane, Cal.—9

১। Varieties of experience—Abu Sayeed Ayyub

S. N. Ghosh ; Director of Census Operations. W. B. 20 British Indian street, Cal.—69

১। Census of India, 1981—Provisinal Population totals 1981

Shri Hari Printers ; 122/3, Raja Dinendra street, Cal.—4

১। ছোট গল্প সংগ্রহ (২য় খণ্ড)—প্রমথনাথ বিশী

২। ঐ (৩য় খণ্ড)— ঐ

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস, সম্পাদক : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-কর্তৃক
প্রকাশিত ও বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স, ৫৭এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন
কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।
মূল্য : তিন টাকা